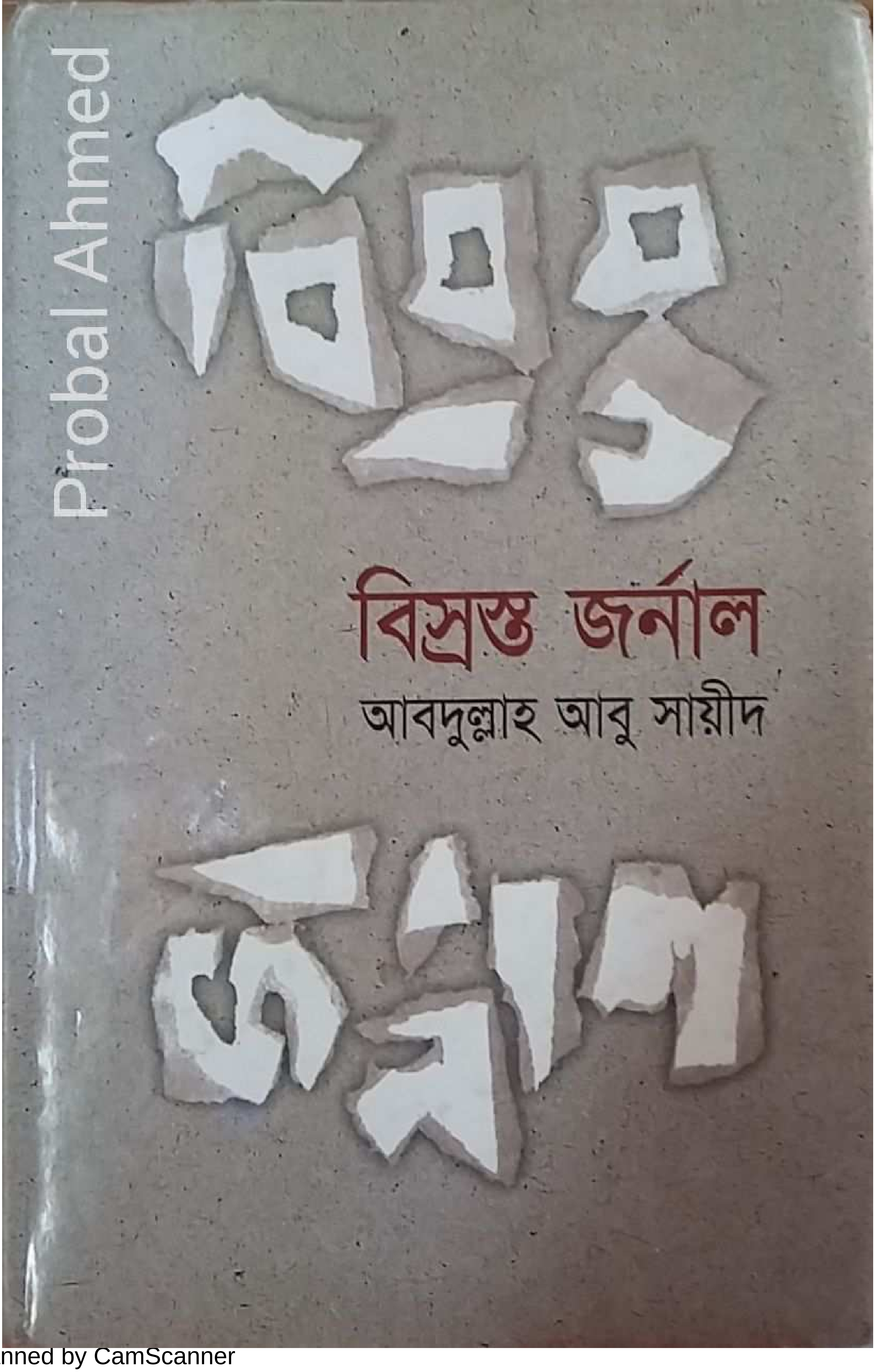

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

বিস্রস্ত জর্নাল

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

Probal Ahmed

সাহিত্য প্রকাশ

Scanned by CamScanner

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০১, ফাল্গুন ১৪০৭
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, ফাল্গুন ১৩৯৯
ISBN 984-465-017-8

মূল্য : একশ' টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৬০/এ-১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

Scanned by CamScanner

উৎসর্গ

সানজীদা আখতার
এই ছোট ছোট লেখাগুলো
যার উৎসাহের কাছে ঋণী

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কাজে অংশ নিতে গিয়ে দায়িত্বের কষ্ট, শ্রম আর উত্তেজনার নিচে আমার গত চৌদ্দ বছরের চৈতন্য-জগৎ পুরোপুরি প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

কাজের ভারী সীসা দিয়ে আকণ্ঠ-ঠাসা সেই জানালা-গরাদহীন দিনগুলোয় স্বপ্ন, অনুভূতি, অবসর বা লেখালেখির কোনো অবকাশ থাকার কথা নয় এবং তা ছিলও না। তবু মাঝেমধ্যে, অপ্রত্যাশিত অবসরের যে দুয়েক চিলতে মুহূর্ত জীবনের করিডোরে পলকের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেত, সেই সময়-টুকরোগুলোকে ছোট ছোট যেসব মৌহূর্তিক লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সে সময় সম্ভব ছিল, তা এগুলোই। লেখাগুলোর বিক্ষিপ্ত, অব্যবস্থ ও সংক্ষিপ্ত চেহারার এটাই কারণ।

সাহিত্য প্রকাশের পক্ষ থেকে অনুজপ্রতিম মফিদুল হক আমার এই নাম-সাকিনহীন লেখাগুলো প্রকাশে আগ্রহী না হলে এগুলো কোনোদিন প্রকাশিত হত বলে মনে হয় না। উদ্যোগী, মেধাবী, প্রগতি-প্রাণিত ও বেদনাবান মফিদুল হকের প্রতি আমি নানান কারণে সশ্রদ্ধ। এবার সকৃতজ্ঞ হতে হল।

ঢাকা
১২.১.৯৩

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই বইয়ের প্রথম মুদ্রণে পর্ব ছিল দুটো। এই সংস্করণে আরেকটি পর্ব সংযোজিত হল।

ঢাকা
১.৩.২০০০

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

Scanned by CamScanner

প্রথম পর্ব

Scanned by CamScanner

১

লেখা—সেই অলৌকিক অপার্থিব রমণী—কুহকী হাতছানিতে ডাকছে। আমাকে কি তবে যেতে হয়?

১৯.১.৮৪

২

একটা জাপানি হাইকু পড়েছিলাম কিছুদিন আগে :

দর্পণের বৃদ্ধ মোরে ডাকে,
কাছে গিয়ে দেখি আমি তাকে।
চমকে সহসা যাই থামি,
হায়, সে যে আমি, সে যে আমি!

কাল দর্পণের সেই বৃদ্ধকে আকস্মিকভাবে দেখলাম। অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। কী তামাটে আর তোবড়ানো একটা মুখ? কে বিশ্বাস করবে ওই কুঞ্চিত ত্বকে তোমাদের মতোই রক্তিম গোলাপ ছিল একদিন, শহরের সুন্দরী মেয়েরা তাকে ভালোবাসত।

১৬.৩.৮৪

৩

হে আমার বিচ্ছেদেরা, বুকের ভেতর মাতৃহীন শিশুর মতো ডুকরে ডুকরে কেন শুধু কাঁদ?

১২.৩.৮৪

৪

একটা গান—যন্ত্রসঙ্গীতের সামান্য একটুখানি মৃদু অভিঘাত—ব্যাস, আমার সারা শরীর আর চেতনা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মনে হয়, এক আকাশজোড়া বিপুল জোছনা-ঝোরার নিচে অচেতন হয়ে পড়ে আছি—কোনো নির্দয় ডাইনি

Scanned by CamScanner

আমার সব রক্ত নিংড়ে আমার নির্জীব সুস্মিত শরীরটাকে একটা অলীক ঝাউগাছের পাশে ফেলে রেখে গেছে। মাহমুদের বাসার বিরাট হলঘরটায় দামি যন্ত্রে গান শুনতে শুনতে কত রাতে এমনি নিঃসাড় হয়ে থেকেছি। বিদেশে থাকার দিনগুলোয় হাজার হাজার গানের রেকর্ড থেকে শুধু ক্যাসেটে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ধারণ করে গিয়েছি। কী নিশিতে পাওয়া সেসব মুহূর্ত!

আচ্ছা, কোনো সঙ্গীত-ধ্বনির মৃদুতম অভিঘাত আমাকে এমন বিবশ করে দেয় কেন? কেন অনায়াসে আমাকে তার অনিবার্য ক্রীতদাস করে ফেলে?

হ্যাঁ ক্রীতদাস—প্রভু নয়। তখনই বুঝি, সঙ্গীতের প্রতিভা আমার নেই। না হলে বেহালা, সেতার, গান—কোন্‌টা ছুয়ে দেখি নি? কেন কোনোটাই হল না? না, ঈশ্বর বা রাজার মতো সঙ্গীতকে আমি রচনা করতে পারি না। প্রভুত্ব নয়, আদেশচালিত ক্রীতদাসের হীন ভাগ্যই আমার নিয়তি। আমি তার জাদুকর হাতের অলৌকিকতায় শুধু সৃজিতই হতে জানি, তার অলীক আনন্দে সাড়া দিয়ে উৎকর্ণভাবে বেজে উঠতেই জানি—জোছনান্বিত ঝাউয়ের পাশে নিহত লাশের মতো শুধু পড়ে থাকতেই জানি।

অন্যের হৃদয়কে আচ্ছন্ন সম্মোহিত করে রাখতে পারা—নির্মম মধুর শিকলে জড়িয়ে তাদের নিষ্কৃতিহীন ক্রীতদাসে পরিণত করে রাখতে পারা—এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার 'রমণীয়' নামই কি তা হলে 'প্রতিভা'?

১২.৩.৮৪

৫

ছেলেরা মেয়েদের শরীরের ভেতর দিয়ে তাদের আত্মায় পৌঁছোয় আর মেয়েরা ছেলেদের হৃদয়ের ভেতর দিয়ে তাদের শরীরকে ছোঁয়।

১৭.৩.৮৪

৬

একটি জাতির প্রতিভাবান মানুষেরা কি জন্মান সেই জাতির সুপরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলোর বিরুদ্ধতা করে?

রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে কি বলা যাবে তাঁর অনবদ্য দেহকান্তি বাঙালির দেহকান্তি? তাঁর নিদ্রাহীন কর্মোদ্যম বাঙালির কর্মোদ্যম?

বিদ্যাসাগরের অস্থি কি বাঙালির অস্থি? তাঁর করুণা কি বাঙালির করুণা?

উদ্দাম বেহিসেবি মাইকেল কি বাঙালির প্রতিভূ? নজরুলের বন্য শক্তিমত্তা কি বাঙালির আবহমানের পরিচয়? হাজী মোহাম্মদ মহসীনের হৃদয়, সুভাষের যৌবন, শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর—এসব কি বাঙালির?

Scanned by CamScanner

আসলে এরা বাঙালিত্বের স্বপ্ন; এই জাতির প্রিয়তম বন্ধু ও প্রতিপক্ষ। আমাদের দুর্বলতা, লোভ, পাপ, নীচতার বেদনাবিস্রস্ত শক্তিমান ক্ষতিপূরণ।

এটা সত্য না হলে শান্ত নির্বিরোধ মোঙ্গলদের মধ্যে কী করে জন্ম নিলেন দুর্দান্ত চেঙ্গিজ?

বেদুঈনদের মধ্যে কী করে জন্ম নেন মরুচারী পরম কারুণিক?

রাজপ্রাসাদের বিলাস ঐশ্বর্যের ভেতর থেকে কীভাবে নগ্নপদে বের হয়ে আসেন বৈভব প্রত্যাখ্যানকারী পরম ভিক্ষু?

দুর্ধর্ষ পাঠানদের মধ্যে জন্ম নেন 'সীমান্তের গান্ধী'?

মানবজাতির প্রতিভারা কি মানবজাতিরই প্রতিবাদ?

১৪.৪.৮৪

৭

এদেশে কারো উপকার করতে যাওয়াই ভোগান্তি।

কারো জন্যে যে কিছু করে না, সে এদেশে জনপ্রিয়।

যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু করে না, সে প্রাতঃস্মরণীয়।

১৪.১০.৮৯

৮

বুদ্ধিমানেরা তর্ক করে, প্রতিভাবানেরা পৌঁছে যায়।

১০.৩.৮৪

৯

সকালবেলা তখনো বিছানা ছেড়ে উঠি নি। আমার ছোট মেয়ে জয়া স্কুলে যাবার আগে ঘরের ভেতর মাথা বাড়িয়ে চটপট বলে গেল : 'আব্বু আসি।' রোজই এরকম বলে। কিন্তু আজ এমন লাগল কেন? 'আব্বু আসি' এই মিষ্টি কথাটাও কেন এমন একটা ভয়ার্ত আর্তনাদের মতো শোনাল। কেন মনে হল শেষবারের মতো ওকে দেখছি!

প্রত্যেকটা বিদায় কেন শুধু চিরবিদায়ের মতো শোনায়!

২৬.৭.৮৪

১০

চোখের সামনে সারাদেশের প্রশাসন কী দুঃখজনক একটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেল। কোথাও একজন উজ্জ্বল সিদ্ধান্তকারী নেই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না।

Scanned by CamScanner

আতঙ্কিত সামরিক একনায়কতন্ত্র নিজের রক্তঘাতী অশুভ নখরগুলো ছাড়া কাকেই–বা বিশ্বাস করবে?

সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে দানবের মতো দুর্লঙ্ঘ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক অশুভ সর্বগ্রাসী অবিশ্বাস!

সমস্ত প্রশাসন জুড়ে শুধু ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা আর সন্দেহ।

উপসচিব তার সহকারী সচিবকে বিশ্বাস করছে না, যুগ্ম সচিব উপসচিবকে না, অতিরিক্ত সচিব বিশ্বাস করছে না যুগ্ম সচিবকে, সচিব অতিরিক্ত সচিবকে না, মন্ত্রী সচিবকে না, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীকে না—জনগণ রাষ্ট্রপতিকে না।

২৮.৮.৮৫

১১

আলসের মতোন ব্যস্ত কেউ নেই।

১৬.৪.৮৪

১২

সুবিধা একবার দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। বুঝতে পারছ না কী নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে রেখেছ?

১৭.৪.৮৪

১৩

যে উপদেশ দেয় আর যে শোনে, দুজনেই সমান অপরাধী।

যে উপদেশ চায় তার মধ্যে খুঁত নিশ্চয়ই আছে, নইলে সে উপদেশ খুঁজবে কেন?

উপদেশদাতার অপরাধ এখানে যে, উপদেশ সে শোনায় অন্যকে, কিন্তু দেয় নিজেকে।

১৫.৪.৮৪

১৪

মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণ চলে যাবার পর রাধার দুঃখ :

যে দিগে না গেলা চক্রপাণি।
সে দিগে কি বসন্ত না জানি॥

কী মদির বসন্ত–আক্রান্ত ছিল এ হৃদয় একদিন!

Scanned by CamScanner

'তুমি এলে ঘরের ভেতর এক ঝলক আলো আছড়ে পড়ে'—বলত এক বন্ধু একসময় প্রায় নিয়মিত। এখন সবই শীতের থাবায়। বৃদ্ধ বয়সের রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠির কয়েকটা কথা অস্পষ্ট মনে পড়ে : "আমি তো এখন রিডাকশন সেলে উঠেছি....তবু, পার যদি, একদিন মনে রেখো সে কবিকে, যে গেয়েছিল 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'—আজ সে কবির ভাঙা গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না ..."

১৮.৩.৮৪

১৫

যে মানুষ একের বেশি জীবনের যৌতুক পেয়েছে, একের বেশি মৃত্যুও তার বিধিলিপি।

১১.৩.৮৪

১৬

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জন্যে কী করে এতটা শ্রম দেওয়া সম্ভব হল এতগুলো বছর? ছোট্ট এই উদ্যোগের পেছনে কে তাড়িয়ে আনল এতদূর? কেবল একটা অন্ধ অনিশ্চয়তার আবেগ? ব্যাখ্যাতীত কোনো কল্পজগতের হাতছানি? আমরা কি কেবল অলীক সম্ভাব্যতার কুটিল ইশারা ধরেই এগিয়ে চলি—নিশ্চয়তার সুস্পষ্ট রেখা কিছু নয়?

৪.৩.৮৪

১৭

সংকলন এক ধরনের সংজ্ঞা। পার্থক্য : সংজ্ঞা সবকিছু নিয়ে ছোট হয়ে আসে, সংকলন অনেক কিছু বাদ দিয়ে ছোট হয়।

১৫.৪.৮৪

১৮

কাল হঠাৎ করেই যিশুর মহান উক্তিটা মনে এল : এক গালে চড় দিলে আরেক গাল পেতে দিও।

মনে হল : কেউ যদি সত্যি সত্যি ঘণ্টাখানেকের জন্যও কথাটাকে ব্যক্তিগত জীবনে আচরণ করত! অসহায়ের মতো দেখত 'গণ্ড' বলে তার প্রিয় সুন্দর প্রত্যঙ্গ দুটো পলকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন! মহাপুরুষদের মহত্তম বাণী তা হলে কোন্‌গুলো?—যেসব কথার বাস্তব আচরণ পৃথিবীতে সম্ভব নয় বলেই বইয়ের অমূল্য পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখতে হয়!

২৬.১০.৮৪

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

১৯

আজ দুপুরে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতেই, একটা নরম অনুভূতির ভেতর অদ্ভুতভাবে মনে হল কার একটা নিশ্চিত আশ্রয় আমার মাথার পেছনে নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমের অসার ভাবটাকে এক ঝটকায় সরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে স্পষ্টভাবে দেখতে চাইলাম : কে?

তাকাতেই তাকে দেখা গেল। আনত আশীর্বাদের মতো মাথার কাছে সে তখনো নীরবে দাঁড়িয়ে : তোমার ভালোবাসা।

২৮.৯.৮৫

২০

মানুষ দুই জাতের। এক, যারা ঈপ্সিতের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয় তাকে পেয়ে গেছে বলে। দুই, যারা ঈপ্সিতকে খুঁজে বেড়ায় তাকে পেতে চায় বলে। আমি কোন দলে তবে? আমার এই কুখ্যাত নাস্তিকতা কি তবে আস্তিক্য সন্ধানেরই অন্য নাম?

জীবন কি আস্তিকতা অন্বেষণেরই একটা উদ্ধারহীন মুদ্রাদোষ? আমিও তো খুঁজেই মরছি, কিন্তু 'নেই কেন সেই পাখি?' ...

২৯.৯.৮৫

২১

সত্যের অবস্থান কি শুধু মানুষের উচ্চারিত শব্দে? শুধু ভাষার দ্যুতিময় দীপ্র উদ্ভাসে? বাক্যের ত্বকসর্বস্ব উজ্জ্বল অশ্লীলতায়?

সত্যের আস্তানা একটাই—জীবন। প্রতিমুহূর্তের জীবনাচরণই কি সত্যের গতিময় সচল রূপ নয়! কোনো মানুষের রাজকীয় মহিমায় হেঁটে যাওয়া, কারো হাত নাড়ার ধীর নিমগ্ন ভঙ্গি—এসবের মধ্যে কি তাঁদের অন্তর্সত্যের সাক্ষাৎ অনেক বেশি নেই, তাঁদের উচ্চারিত অনেক আপাত মহার্ঘ উচ্চারণের চাইতে?

জীবনের প্রজ্বলন্ত রূপের ভেতরেই শুধু সত্যকে দেখিয়ে দেওয়া যায়। সত্যের লেলিহান আগুন শরীরে মনে উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠার মুহূর্তেই কেবল—সত্যব্রতীর সেই অনলিত যন্ত্রণার ঐশ্বরিক আলোর ভেতরেই কেবল সত্যের আসল রূপ। আর কোথায়?

৩০.৯.৮৫

২২

এত বেশি কেন দিয়ে দাও যে দেবার পরে নিজের জন্যে কিছুই থাকে না।...

১.১০.৮৫

Scanned by CamScanner

২৩

সকালবেলা রোশনা বলল : 'আজ রাতে তোমাকে নিয়ে একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটা এমন ভয়াবহ যে ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল।'

ওর স্বরে উৎকণ্ঠা। না থেমেই বলল : 'দুপুররাতের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়। ভাবলাম, ঘড়িতে সময় কত দেখি তো? ঘড়ি দেখতে যাব, হঠাৎ দেখি চারপাশের সবগুলো বাড়িতে আলো ঝলমল করছে। রোজার মাস, এখন সেহরির সময়।'

ওর কথা শুনে কেবলই মনে হল, কী দরকার ঘড়ি দেখার। কী-ই-বা এমন ঘটবে! সবচেয়ে ভয়াবহ যা আসন্ন তার জন্যেই তো আমি অপেক্ষমাণ।

৫.১০.৮৫

২৪

স্বাক্ষর সংগ্রহের ব্যাপারটা আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে মহামারীর চেহারা নিয়েছে। সামনে পড়লে রক্ষা নেই। স্কুল-কলেজে ঢুকলে প্রাণ নিয়ে বেরোনো দায়। আমাদের ছেলেবেলায় পরিচিত মানুষদের চাবকানোর এই মধুর কৌশলটা অজানা ছিল।

স্কুল-কলেজের এইসব ক্ষুদে স্বাক্ষর-শিকারিদের সামনে পড়ে গেলে সবার খাতায় আজকাল একটা কথাই আমি কেবল লিখি : 'মানুষ তার আশার সমান বড়।' রক্তের ভেতরে কেন যেন এ ধরনের একটা কথা আমি কুসংস্কারের মতোই বিশ্বাস করে ফেলেছি : মানুষ নিজেকে যা ভাবতে পারে, সে তা-ই হয়ে যায়!

১১.১০.৮৫

২৫

'কেন্দ্রে' একটা বুড়ো কাঠমালতীর গাছ আছে। ফুল ফোটানোর একটা বিরতিহীন উৎসব গাছটার সারা গায়ে। সারা বছর হাজার হাজার অপরূপ সাদা ফুল ভরে রাখে গাছটাকে। কয়েকজন ছেলেমেয়েকে সেদিন বললাম—বুড়ো গাছটাকে দেখেছ, কেমন অজস্র ফুল দেয়? ঠিক আমার মতোন, না?

শুনে ওরা বারবার তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

কী দেখছিল? একটা মুখ পরিতৃপ্তিতে কেমন দেখায়!

১২.৬.৮৫

২৬

চোরকে চুরির মুহূর্তে হাতেনাতে যে ধরে ফেলতে পারে, সে কবি; চোর পালাবার পর যার বুদ্ধি বাড়ে, সে সমালোচক।

১৪.৬.৮৫

Scanned by CamScanner

২৭

চৈতন্য–আলোর লক্ষ–কোটি গুণ বেগে অনিবার্য লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাওয়া একটা জাগ্রত দীপ্র তলোয়ার। সেই নির্মম লক্ষ্যভেদী অভিযাত্রা থেকে এর তীক্ষ্ণ মুখটাকে এক সেন্টিমিটার সরিয়ে দাও—সঙ্গে সঙ্গে সে এক ভেঙে–পড়া করুণ অসহায়তা। মূল গন্তব্য থেকে হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূর দিয়ে মহাশূন্যের বুকে করুণভাবে মিলিয়ে যাওয়া একটা ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

১৮.৬.৮৫

২৮

আমার মনে হয় একজন মানুষের 'বড়' হবার পেছনে তার 'বুদ্ধি'র অবদান যতখানি তার চেয়ে ঢের বেশি তার 'নির্বোধ হতে পারার শক্তি'র অবদান। বিদ্যাসাগরের সেই গল্পটা ধরা যাক। ছোট ভাইয়ের বিয়েতে মা ডেকে পাঠিয়েছেন। অফিসে ছুটি না পেয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ছুটলেন বাড়ির দিকে। পথের ওপর বর্ষার ঢল–নামা ভয়ঙ্কর পাহাড়ি নদী। ঝাঁপিয়ে পড়ে নদী সাঁতরে ঠিক সময়মতো বাড়িতে মা'র কাছে গিয়ে পৌঁছোলেন।

কিংবা বায়েজিদ বোস্তামির সেই গল্প। রাতে ঘুমের ঘোরে মা হঠাৎ পানি চেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বোস্তামি পানি নিয়ে এসে দেখেন মা ঘুমে। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রের পাশে নিঃসাড় দাঁড়িয়ে রইলেন সারারাত। সকালে মা ঘুম ভাঙতে দেখলেন বায়েজিদ তাঁর শিয়রের পাশে গ্লাস হাতে তেমনটিই দাঁড়িয়ে।

এমনি আরো অনেক গল্প : যেমন ক্যাসাবিয়াঙ্কার পিতৃভক্তি বা বিদ্যাসাগরের কুলিগিরি—কান্নামথিত হৃদয়ে অশোকের আজীবনের জন্য অস্ত্রত্যাগ, স্বেচ্ছায় হেমলকপানে সক্রেটিসের মৃত্যুবরণের অবিশ্বাস্য গল্প—যা ছেলেবেলার পাঠ্যবইতে মহত্ত্বের উন্নততম আদর্শ হিসেবে আমাদের পড়তে হত। ঘটনাগুলো যে–কোনো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চোখে উচ্চশ্রেণীর নির্বুদ্ধিতার উদাহরণ হতে বাধ্য। এত উচ্চশ্রেণীর যে সেগুলো আজো মানবজাতির মহত্তম কল্পকথা হিসেবেই পরিচিত হয়ে রয়েছে। এই ঘটনাগুলোতে মানুষগুলোর ওরকম নির্বোধ হতে পারার জন্মান্ধ শক্তিই বলে দেয় মহত্ত্বের উচ্চতম শিখরকে স্পর্শ করার থেকে এক ইঞ্চি নিচে পড়ে থাকার তাঁদের কোনো কারণ নেই। এই 'অন্যথায়' সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান মানুষগুলো নিজেদের বিশ্বাস বা ভালোবাসার জন্যে, আত্মধ্বংসী পর্যায়ে, সমস্ত স্বার্থবুদ্ধিকে মড়ার খুলির মতো দু হাতে ছুড়ে ফেলে, যেভাবে নির্বোধের মতো হো–হো করে হাসতে পারেন, তাই বলে দেয় শ্রেয়ের শীর্ষকে স্পর্শের ক্ষেত্রে কী রক্তাক্ত এবং পাশব সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে তাঁরা সক্ষম যা আমাদের মতো ভেদাভেদহীন সাধারণ মানুষদের হীন চালাকি, চতুর স্বার্থচেতনা কিংবা সতর্কবুদ্ধির সমস্ত নাগালের বাইরে।

২২.৬.৮৫

Scanned by CamScanner

২৯

কেন্দ্রের চৌহদ্দিতে পরনিন্দা ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা উচিত। কেন পরনিন্দা। হাজার হাজার মুখ থেকে ক্লান্তিহীন উচ্চারিত নির্মম অশ্লীল মহত্ত্ব-বিনাশী কোটি কোটি বরাহ-নিনাদের এই হীন মহোৎসব?

কেন নিন্দা? কিসের জন্য? আমাদের ব্যক্তিগত অক্ষমতা? ঈর্ষা? অসাফল্য? শক্তিহীনতা? অন্যের সফলতাকে সহ্য করতে পারার স্নায়বিক অক্ষমতা? ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বিকাশ-বিনাশী সহিংস প্রত্যাঘাত?

আমাদের প্রত্যেকের পঙ্গু সৃজনপ্রতিভা সাফল্যের আকাশে মুক্তি পেলে আমরা এর প্রসারের হাত থেকে মুক্তি পেতাম।

কেন্দ্রের ছেলেমেয়েদের কয়েকদিন ধরে ডেকে ডেকে আমি বলেছি : বন্ধ কর পরনিন্দার এই হীন আত্মঘাতী আবিলতা—মানব প্রতিভার এই বেদনাময় অপচয়—হাজার হাজার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত চরিত্রহননের এই ক্লেদাক্ত দেশব্যাপী আয়োজন।

সবাই যদি খারাপ, তবে 'ভালো' তোমাকে দিয়ে শুরু হোক না!

২৭.৬.৮৫

৩০

অজ্ঞানতার চেয়ে ধর্মহীনতা আর কিসে? অশিক্ষিত মানুষের আল্লাহও অশিক্ষিত।

২৮.৬.৮৫

৩১

'কেন্দ্রে'র দরজায় কার আশায় এভাবে এই শীতে একা একা প্রতীক্ষা করে চলেছ মৃত্যুময়?' আমি বসে আছি একজন 'রাজা'র জন্যে, কিন্তু তার পদপাত এখনো অনিশ্চিত। যাত্রা হয়তো উদ্যত, কিন্তু বিঘ্নিত এখনো প্রত্যয়ের বিভ্রান্তিতে।

একে একে কত মানুষ আসে। বিস্বাদ মুখে এগিয়ে আসে অজীর্ণ রোগগ্রস্ত করণিক। তার মুখে চোখে সংশয় আর হীন আক্রোশ। গাদা গাদা নথি হাতে আসে বিরক্ত সহসচিব ; তার ঘর ভাপসা, অন্ধকারে গুমট। আসে উপসচিব : উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাসের ঝকঝকে প্রতীক। অনভ্যস্ত ভারিক্কির ঈষৎ অস্বস্তি নিয়ে যুগ্ম সচিব আসে। আসে অতিরিক্ত সচিব—উচ্চতম সাফল্যের ঈষৎ অনটনে সামান্য অসুখী। দৃপ্ত প্রত্যয়োজ্জ্বল সচিব বা রাজকীয় চাদর গলায় উড়িয়ে মন্ত্রীও আসে।

কিন্তু কোথায় সেই রাজা!

আমার সেই রাজা কোথায়?

৩০.৬.৮৫

Scanned by CamScanner

৩২

ধর্মের জন্য যা সবচেয়ে বিপজ্জনক, তা, আমার মতে নাস্তিকতা নয়, অজ্ঞেয়বাদ। নাস্তিকতার সঙ্গে ধর্মের অন্তত একটা বীরোচিত শত্রুতা আছে—এক ধরনের গৌরবের যুদ্ধ।

নাস্তিকতা অন্তত একটা 'ধর্ম'—হয়তো সমষ্টিপ্রবণ নয়, ব্যক্তিগত ; সমন্বয়ধর্মী নয়, বিশ্লেষণ-ঋজু।

কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ নিঃশব্দ ঘাতক। প্রতিবাদ করে না, শুধু নীরবে পোড়ায়—গোপনে ধ্বংস করে।

২১.৭.৮৫

৩৩

সারা অস্তিত্বে হাসির কী কলরোল ছিল একদিন। সমস্ত শরীর সেই আদিমতার বন্য অত্যাচারে কুটি কুটি হয়ে ছিঁড়ে গেছে।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একদিন সন্ধ্যায় আমি আর আমার এক বন্ধু কার্জন হলের পুব দিকের বিরাট শিরীষ গাছটার নিচে (গাছটা এখনো তেমনি আছে) দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। হঠাৎ কী একটা ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে এমন উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়লাম যে নিজের হাসির দমকে নিজেকেই প্রায় চমকে যেতে হল। স্পষ্ট দেখলাম হাসিটার উচ্চকিত আঘাত শান্ত সন্ধ্যাটাকে টুকরো টুকরো করে, দেয়ালগুলোতে ধাক্কা খেয়ে গাছগুলোর গা ঘষটে বিদ্যুৎগতিতে কার্জন হলের পশ্চিম কোণের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল। শিরীষ গাছটার বেশ একটা বড় ডাল একরাশ সবুজ পাতা নিয়ে আমাদের সামনেই নুয়ে ছিল। তাকাতেই দেখলাম হাসির ধাক্কায় তার পাতাগুলো তখনো কাঁপছে।

একদিন এমনি হাসির বর্বরতা ছিল সারা অস্তিত্বে। আমার ঈপ্সিত জন্মদিনগুলো নানান রঙিন উপহারের আড়ালে তাদের ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

২৫.৭.৮৫

৩৪

আমার মেয়ে লুনার দু মাস ধরে একটানা জ্বর। কী কষ্ট করে যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল ! সব বড় ডাক্তারই দেখানো হয়েছে—কিচ্ছু হচ্ছে না। অদ্ভুত একটা ভয় করছে। সারাক্ষণ কীভাবে পাহারা দিয়ে আমাকে আগলে রাখে ! আমার প্রতিরক্ষায় যেন একটা জাগ্রত দুর্গ। আমার ছেলেবেলায় হারানো মাকে ওর মধ্যে ফিরে ফিরে দেখি ! আজকাল ওর দিকে তাকালেই খারাপ লাগে। কটা দিন আর।

Scanned by CamScanner

বড়জোর দুই তিন চার বছর—তারপরেই চলে যাবে। কখন যে বড় হয়ে গেছে বুঝতেই পারি নি। হায় অভিশপ্ত ব্যস্ততা! ওদের নিয়ে একসাথে বসে কটা দিন একটু সময় কাটাবার অবকাশ হল না। আজকাল সামান্য সময় পেলেই ওর সাথে বসে কিছুটা গল্প করি। কেবল ভাবি, ওকে ভালো করে আমার আজো দেখা হয় নি। সকালে যখন ও আর জয়া স্কুলে যায়, আমি তখন বারান্দায় বসে মাঝেমধ্যে ওদের সেই দুদণ্ডের যাওয়াটুকুকে বুক ভরে দেখি। ওরা কোনোদিন জানবে না, ওদের এই মমতাহীন নির্দয় বাপ দুটো স্নেহমেদুর চোখ হয়ে কীভাবে নিঃশব্দে ওদের দেখে যাচ্ছে।

আজ ওর বিদায়ের সময় এগিয়ে আসছে!

প্রত্যেকটা বাপকেই সন্তানের মৃত্যু বহন করতে হয়। যেমন প্রত্যেকটা সন্তানকে বাপের।

২৭.৭.৮৫

৩৫

গজলের কাব্যরূপ খুঁজে পেয়েছিলেন উর্দু কবিরা—কয়েক শ বছর আগে। কিন্তু গজলের সর্বশেষ সঙ্গীতরূপ উর্দু গান খুঁজে পেয়েছে এই মাত্র সেদিন—সম্ভবত মেহেদী হাসানের হাতেই।

লতা মুঙ্গেশকর বলেছিলেন : 'ঈশ্বরের কণ্ঠ আছে মেহেদী হাসানের গলায়।' আমি নিজেও মেহেদী হাসানের অশেষ অনুরক্ত। এই তো কিছুদিন আগেই ঢাকায় এসে গেলেন অনেকদিনের ব্যবধানে। ইতিমধ্যে যৌবনের রাজ্যে নিষ্পত্রতা দেখা দিয়েছে, টাকের বিস্তৃতি আর কেশের পলিত প্রাচুর্য অলজ্জ প্রতিযোগিতায় দ্বন্দ্বমান।

অনেকেরই ভয় ছিল : আগের সেই কণ্ঠ তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু গান শুরু করতেই সব সন্দেহের অবসান ঘটল। মেহেদী হাসান এখনো তেমনি পরাক্রান্ত, রঙিন।

প্রত্যেকেরই 'দিন' থাকে, কারো কারো 'চিরদিন' থাকে।

৩০.৮.৮৫

৩৬

টিভিতে অনুষ্ঠান ছেড়েও ঝামেলা। প্রায় পাঁচটা বছর হল টিভি ছেড়েছি। তবু এখনো রাস্তায়, অফিসে, দোকানে, বাজারে, নিমন্ত্রণে, আলোচনা সভায় যেখানেই যাওয়া যাবে—গ্রামোফোনের কাটা রেকর্ডের মতো ফিরে ফিরে, হাজার অভিমানী গলায় একই স্বর : কেন ছেড়ে দিলেন টিভি। আবার ফিরে আসুন। আবার আমাদের ভালো অনুষ্ঠান উপহার দিন। আপনার সেই সুন্দর অনুষ্ঠানগুলো আবার ফিরে চাই।

কী করে এই ভিড়ের হৃদয়কে বলি : অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিন আপনারা

Scanned by CamScanner

আমাকে। একদিন আমার অনুষ্ঠানের জন্য আপনারা আপনাদের হৃদয়ের সব অনিন্দ্য রক্তগোলাপ আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

সেদিন আপনাদের আনন্দ দেবার সেই অন্তরঙ্গ দায়িত্বে একাগ্রতায় সততায় আমি শ্রান্তিহীন ছিলাম। শরীরের প্রতিটা রক্তবিন্দুর মধ্যে একটামাত্র আকাঙ্ক্ষাই আমার সেদিন নিদ্রাহীন ছিল : অনুষ্ঠান করতে করতে টিভির স্টুডিওর মেঝেতে যদি মরে পড়ে থাকতে পারি—সেটাই হবে আমার সবচেয়ে প্রিয় গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যু।

কিন্তু আজ অক্ষম আমি আপনাদেরকে সেইসব রঙিন অনুষ্ঠান উপহার দিতে। আমার হৃদয় আর সেদিনের মতো তারুণ্যদীপ্ত নয়।

বয়সের আর দায়িত্বের ভারে বেদনায় মুহ্যমান আমি এখন। আজ আমার জাতির আগামী বংশধরদের সুখের প্রশ্ন আমাকে কোটি কোটি বিষাক্ত ডাঁশের মতো কামড়ে ধরেছে। আজ আমি জীবনের ন্যূনতম একটা অর্থ খুঁজে ফিরছি, টিভির রঙিন বিনোদনের জগতে তার উত্তর নেই। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার এই ছোট্ট তুচ্ছ অবজ্ঞেয় বিষয়টি আজ আমার কাছে সারাদেশের মানুষের সমস্ত সম্মান সংবর্ধনা আর শ্রদ্ধাঞ্জলির চেয়ে অনেক বড়—ব্যক্তিগত মহিমাকামিতার চেয়ে অনেক মূল্যবান। আপনাদের প্রীতি আর ভালোবাসার দানবীয় আলিঙ্গনকে সামান্য শিথিল করে আমার এই ছোট্ট অর্থহীন ঘরটাতে, জীবনের এই অপচয় আর পণ্ডশ্রমের জগতে, অনুগ্রহ করে নিশ্চিন্তে আমাকে আজ একটু নিশ্বাস নিতে দিন আপনারা।

২৫.৮.৮৫

৩৭

দুটো গুণের জন্য মেয়েরা ছেলেদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, অপ্রতিরোধ্য আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দেখা দেয়। সেগুলো হল : ন্যাকামি আর নিষ্ঠুরতা। কোনো মেয়ের ন্যাকামির 'প্রতিভা'কে চারপাশের অন্য মেয়েদের চোখে যত অসহ্যই মনে হোক (আমার ধারণা এর অনেকটাই ঈর্ষা বা অক্ষমতাপ্রসূত), খুব অল্প মেয়ের মধ্যেই ন্যাকামির এই নন্দিত সৌন্দর্যটা রয়েছে। এটা একজন পুরুষের তপ্ত কামনাদগ্ধ সতৃষ্ণ ঠোঁটের দিকে একটি রমণীয় নারীসত্তার সবচেয়ে অপরূপভাবে নুয়ে আসা, তার দুর্বোধ্য চতুর ছলনা-প্রতিভার সবচেয়ে বিস্ময়কর কমনীয় উপহার। এটা একটা মেয়ের সেই লাজরক্তিম কুহকী চপল মেয়েলিয়ানা যা ছেলেদের কাছে তাকে করে তোলে ভালোবাসার কাম্য গোলাপ, বিছানায় অনিন্দ্য, রহস্যময়।

নিষ্ঠুরতা হচ্ছে পুরুষ-হৃদয়ে মেয়েদের সেই আততায়ী নির্দয় রক্তাঘাত, যা ভেসে-যাওয়া একবুক বিপন্ন রক্তের সাথে একটা মেয়েকে একজন পুরুষের কামনায় চির-যন্ত্রণাময়, চির অপ্রাপনীয় ও মধুর করে রাখে।

১২.১২.৮৬

Scanned by CamScanner

৩৮

জীবনে প্রেমের বয়স একটাই—আঠার। মানুষ যে বয়সে বা জীবনের যে পর্বেই প্রেমে পড়ুক—তার বয়স তখন হয়ে পড়ে ওইটাই।

প্রেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের মতোই অকারণ বেদনায় হয়ে উঠবে বিষণ্ন, করুণ—

নিজেদের তোবড়ানো তামাটে চেহারাটা বেমালুম ভুলে গিয়ে রঙিন পাখা মেলে উড়ে বেড়াতে শুরু করবে প্রজাপতির মতো—

অকারণে গলাগলি-করা নিমগ্ন শিশুদের মতোই হয়ে যাবে ভাবনাহীন, বাচাল—মানুষের সমালোচনা বলাবলির ব্যাপারে পুরোপুরি ভ্রূক্ষেপহীন, নির্বিবেক—এক কথায়, প্রথম প্রেমের মতোই উজ্জ্বল আর বেদনার্ত—

প্রথম যৌবনের মতোই হাস্যকর আর করুণ!

১৫.১২.৮৬

৩৯

যার ভালোবাসার মানুষ অনেক, সে-ই বলতে পারে—তার কেউ নেই।

যার 'প্রেম' থাকে, তার থাকে কেবল একজন।

১৮.১২.৮৬

৪০

আমাদের সবচেয়ে গভীরতমভাবে পাওয়া জিনিসটাকেই কি আমরা 'অসম্ভব' নামে ডাকি?

২০.১২.৮৬

৪১

সেদিন সন্ধ্যার আগখানটায় কেন্দ্রে যাচ্ছিলাম। রিকশার গতি অনুভবহীনরকমে বাস্তব। শরৎকাল—আকাশ উজ্জ্বল। সকালের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যায় পুরো পশ্চিম আকাশটায় আশ্চর্য সোনালি আভা। হঠাৎ দেখি দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ সন্ধ্যার সেই স্বর্ণাভ আকাশের ওপর আশ্চর্য রেখায় ফুটে আছে। তাদের সূক্ষ্ম চিকন ডালপালাগুলো লাবণ্য-রেখার মতো জ্বলন্ত আকাশের গায়ে ছড়ানো।

বারবার মনে হল: বেঁচে আছি বলেই এমন অপার্থিব দৃশ্যটা দেখতে পেলাম।

কী অপরিমেয় এই জীবন! অবলীলায় পেয়ে যাই বলে ঠিকমতো মূল্য দেওয়া হয় না!

২১.১২.৮৬

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

৪২

সব মানুষের জীবনেই একটা চেহারা দেখানোর সময় থাকে। নিজের মুখটাকে, এই সময়, ঝলমলে ধানের আঁটির মতো উঁচু করে সবার সামনে তুলে ধরার অত্যাচারী ইচ্ছায় আত্মা আবিল হয়। আমারও হয়েছিল অমনি একসময়।

টিভির দর্শকদের ভালোবাসা একসময় স্নিগ্ধ স্নেহধারার মতোই সবকিছু মুছে নিয়ে গেছে। কেউ আজ আমার দিকে তাকাল কি না, সেটা আমার কাছে এখন আর কোনো প্রসঙ্গই নয়। যেন এই অনিবার্য মানবিক অনুভূতিটারই পুরো মৃত্যু ঘটে গেছে আমার মধ্যে। আমি যেন একটা অচেনা অপরিচিত মানুষের ভিড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি—মানুষের প্রিয়তা-অপ্রিয়তা সবকিছুর বাইরে, সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে। আজ আমার বিবেচ্য কেবল একটাই : 'দায়িত্ব!' —আমার সর্বশেষ ঈশ্বর। একটা উদ্যত, প্রভুভক্ত নৈশ কুকুরের মতো আমি কেবল তার প্রতিই জাগ্রত।

২৪.১২.৮৬

৪৩

কাল 'কেন্দ্রে' শহিদুল বলছিল, আপনার গদ্যে একটা আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। লিখলে ভালো হত।

কেন লিখি নি সারাজীবন? রক্তের মধ্যে শব্দের এমন জ্বলন্ত অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কী করে এত নীরক্ত শীতল থেকে যাওয়া সম্ভব হল? যাও-বা লেখা হল ছিটেফোঁটা, তা দিয়েও সত্তার সবচেয়ে সাবলীল জায়গা দুটোকে আদৌ ছোঁয়া হল না : নাটক আর আত্মজীবনী—যেখানে আমার অন্তর্প্রকৃতি সবচেয়ে রক্তিম আর স্বচ্ছন্দ পদচারণা করতে পারত। একটা কচি অপরিণত মাথার খাঁজে হাজার হাজার শব্দের উন্মত্ত দংশন নিয়ে বেঁচে থাকতে হল—আর্তচিৎকারের মতো। কোথায় সেই ফলভারনম্র দ্রাক্ষাকুঞ্জ! সারাজীবন মাথার কোটরে কোটি কোটি বোলতার নিদ্রাহীন উন্মত্ততা। শব্দের উদগ্র একটা সাম্রাজ্যকে মগজের ভেতর প্রজ্বলন্ত রেখে কী দুঃখময় বৈকল্য?

কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের চেনা এই লোকটি বিদায় নেবে। তবু মনে রেখো, যেদিন এই মানুষটির মৃত্যু হবে সেদিন তোমাদের পরিচিত এই অক্ষম নির্বীজ লোকটির মৃত্যু হবে না—মৃত্যু হবে হাজার হাজার অলিখিত শব্দাবলির একটা জাগ্রত জগতের।

অথচ যা কিছু নিয়ে এতগুলো দিন মাতাল হয়ে কাটিয়ে দিয়েছি—সেই সম্পাদনা, সংগঠন, টিভি, শিক্ষকতা—এসব কোনোকিছুই হয়তো আমার ব্যক্তিগত রক্তের আসল ব্যাপার ছিল না। হয়তো শুধু বিবেক, শুধু পরিত্রাণহীন বিবেকের নির্যাতন আর কালের ও ভূগোলের অবধারিত দাবির সাধ্যমতো

Scanned by CamScanner

প্রত্যুত্তর। সাফল্য একেবারে জোটে নি এমন নয়। কিন্তু জীবনের অবাঞ্ছিত ব্যাপারে সাফল্য পৃথিবীতে এই প্রথম নয়।

তবু লেখা ছিল আমার স্বর্গীয় তৃপ্তি—'আত্মার লবণ'। লেখার সময় শরীরের প্রতিটা প্রত্যঙ্গ যেভাবে ঝনঝন করে বেজে উঠত—প্রতিধ্বনিময় সেই উচ্চকিত পৃথিবীর তুলনা কিসে? লেখাগুলো হয়তো সবই নিষ্ফল ছিল, কিন্তু মানুষের শ্রেষ্ঠ আনন্দ কি সবসময় তার শ্রেষ্ঠ সাফল্যে?

২৬.১২.৮৬

৪৪

সবচেয়ে দুরপনেয় কষ্টকেও হয়তো সহ্য করা যায়, কষ্টের আতঙ্ককে নয়।

বারবার ভাবি, আমার মৃত্যু যেন আসে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার পথ ধরে—আমার সম্পূর্ণ অজান্তে—এতটুকু টের পেতে বা বুঝতে না দিয়ে।

একতাল ছিন্নভিন্ন মাংসপিণ্ড আকাশের দিকে বিস্ফারিত
যেন পড়ে থাকি কোথাও।

২৮.১২.৮৬

৪৫

আজকের জন্যে যা সবচেয়ে মর্মান্তিক, কালকের জন্যে তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা।

২৮.১২.৮৬

৪৬

প্রেম এমন একটা ব্যাপার যা নির্বিবেক পাশবতাকেও মধুর করে তোলে।

২৮.১২.৮৬

৪৭

কাপুরুষেরা কি মৃত্যুর আগে এক শ বার মরে? তবে আমি ওই কাপুরুষই হতে চাই—এক শ বার মরতে পারার লোভে।

যে সত্যিকার মৃত্যুর আগেই এক শ বার মরে (অর্থাৎ আসলে এক বারও মরে না), সে নিশ্চয়ই আসল মৃত্যুর আগে আবার এক শ বার বেঁচেও ওঠে।

কী তীব্র, অবিশ্বাস্য পুলক তা হলে এমনি এক শ'টা অভাবিত নতুন জন্মে!

সুতরাং জয় হে কাপুরুষতা, হে মৃত্যুর আগের এক শ বারের হীন মৃত্যু!

২৯.১২.৮৬

Scanned by CamScanner

৪৮

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসটা পড়েছিলাম অল্প বয়সে। মনে আছে, উপন্যাসের নায়ক নিতাইচরণ অস্তিত্বের একটা মৌলিক অসম্পূর্ণতার প্রসঙ্গ বারে বারে ফিরিয়ে এনে প্রশ্ন করেছিল : 'জীবন এত ছোট্ট কেনে!'

অন্যায় অসন্তোষজনক আমাদের জীবনের এই মৌলিক খেদ আমাকে বিমর্ষ করে রেখেছিল অনেকদিন।

তবু জীবন শেষ পর্যন্ত অপরিমেয়।

কেবলই মনে হয় আজ পর্যন্ত যত মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মেছে; যত মানুষ বেঁচে রয়েছে আজকের পৃথিবীতে কিংবা বিশ্বের বিলয় পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেবে, বেঁচে থাকবে—সেইসব মানুষের সমস্ত সম্মিলিত জীবনকে আমাদের এই একটা ছোট্ট জীবন-পরিসরে সজাগভাবে বা অগোচরে আমরা সবাই তো যাপন করেই যাই।

সেদিক থেকে একজন মানুষের জীবন তো আসলে পুরো মানবজাতিরই জীবন।

তা হলে আমরা কাঁদি কেন?

আর কেন কাঁদে তারাশঙ্করের নিতাইচরণ?

৩০.১২.৮৬

৪৯

যখনই কোনো লনের বা মাঠের ধারে বিজ্ঞাপন দেখা যাবে :

'মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটিবেন না',

অমনি বাঙালির তাবৎ বীরত্ব একসঙ্গে চাগিয়ে উঠবে :

'হাঁটতেই যদি হয় তবে এই মাঠের ভিতর দিয়েই হাঁটতে হবে।'

'ঠিক আছে, হেঁটে যাও হে বাঙালি, 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', তোমার পরাক্রমকে বাধা দেয় কে? কিন্তু প্রশ্ন একটাই : 'কষ্ট করে পুরো মাঠটা ঘুরে না গিয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে সরাসরি যে পা চালালে—উদ্দেশ্যটা কী?'

'উদ্দেশ্য সোজা। পথের দূরত্ব কমানো!'

'মানছি! কিন্তু তোমার মতো প্রাগৈতিহাসিক আলসের পক্ষে তো কেবল পথের দূরত্ব কমানোর কথা নয়—বরং দূরত্বকে একেবারে সংক্ষিপ্ততম করে ফেলারই কথা।'

'তা, অবিশ্যি, বলতেও পার।'

'আচ্ছা, জ্যামিতির বইয়ে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথকে কী যেন বলে?'

'কেন, সরলরেখা?' দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্বকে সরলরেখা কহে'—(এও জান না নাকি, এ্যাঁ?')।

Scanned by CamScanner

তা হলে হে বাঙালি, মাঠের মাঝ বরাবর তোমার এই পায়ে–হাঁটা পথটার তো সরলরেখা হবারই কথা? যেহেতু দূরত্বটাকে সংক্ষিপ্ততম করাই ছিল তোমার লক্ষ্য?'

কিন্তু এইসব মাঠ বা লনের ভেতর দিয়ে যেসব হাঁটা পথ চলে গেছে, ভালো করে তাকিয়ে দেখেছ সেগুলোকে? কিংবা রেললাইনের ধার ধরে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে–যাওয়া সরু সরু পথগুলোকে? ওগুলো কি সরলরেখা? নাকি খেয়ালখুশিতে এগিয়ে–যাওয়া আঁকাবাঁকা এলোমেলো এক ধরনের অব্যবস্থ রেখা কেবল। দেখলে মনে হয়, যেন জোছনা–রাতে চাঁদে–পাওয়া কোনো অবাস্তব মানুষ নিজের খেয়ালে একটা অলীক পৃথিবীর ওপর দিয়ে আনমনে হেঁটে চলে গেছে।

আমরা মানুষেরাও কি অমনি এই পথগুলোরই মতো? স্পষ্ট আর অবাস্তব, প্রত্যক্ষ আর সুদূর, রহস্যময় আর প্রতীকী? অনিশ্চয়তার অলীক জোছনা–তলা দিয়ে হেঁটে–যাওয়া আলোছায়ার অলৌকিক দীর্ঘ একটা চলমান আঁকাবাঁকা অসহায়তা?

২১.৮৭

৫০

ছোট্ট এক ফোঁটা অমৃতের জন্য কি অভদ্ররকম মূল্যই না দিতে হয় জীবনে!

২১.৮৭

৫১

১৯৬৩–র একটা স্মৃতি। অগাস্ট কি সেপ্টেম্বরের। আমি আর ম. আমেরিকান তথ্য কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে (তখন ছিল জাতীয় প্রেসক্লাবের উল্টোদিকে) পাশাপাশি উদ্দেশ্যহীন হেঁটে যাচ্ছি।

ফিরে ফিরে ওর আঁচলে হাতে আমার হাতের আলতো ছোঁয়া, আর আগুনের মতো উষ্ণ শারীরিক অনুভূতি। হাঁটতে হাঁটতে রমনা পার্কের কাঁটাতারের বেড়ার ফোকর দিয়ে পার্কের ভেতর ঢুকে পড়লাম নির্বিকার, অবৈধ। একটা বিরাট গাছের নিচে মুখোমুখি বসলাম—এখন যেখানে মসজিদটা উঠেছে তার খানিকটা উত্তর ঘেঁষে। গাছটা এখনো একই রকম রয়ে গেছে। আমাদের সেদিনের অঙ্গীকারের নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ সাক্ষী। কী অপার্থিব আনন্দের একটা মুহূর্ত। নিজেকে মনে হচ্ছিল একটা তরুণ দেবতার মতো। হঠাৎই মনে হল : একটু পরেই এই মুহূর্তটা মিলিয়ে যাবে। আমাদের সোনালি বয়সের একটা সজীব মুহূর্ত একটা সাপের খোলসের মতো পড়ে থাকবে এই গাছের নিচে। ম.–কেও বললাম কথাটা। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনিবার্য নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানের অনুকূলে মানুষের নিরুপায় ব্যথিত অনুমোদন।

Scanned by CamScanner

'ভাব তো'—বললাম—'এই যে ছোট্ট মুহূর্তটায় আমরা সামনাসামনি বসে আছি, এটুকুর জন্মের জন্যে বিশ্ব-সংগঠনের করিডোরে কত লক্ষ কোটি ঘটনাধারা অনুষ্ঠিত হওয়ার দরকার ছিল। বেশি দূরের কথা ছেড়ে দিই ; এই সেদিনের কথা, সূর্যের বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিগোলকটা থেকে পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকেই ভাবা যাক। বাষ্পপিণ্ড থেকে ক্রমে জলবেষ্টিত শক্ত গোল প্রাণময় জগৎ হিসেবে এই পৃথিবীর আত্মপ্রকাশ, প্রথম প্রাণীর উদ্ভব থেকে সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রযাত্রা, আদিম রক্তের ধারাবাহিকতায় এই অভিন্ন ভূখণ্ডে তোমার আমার পিতৃপুরুষের উদ্ভব, একটা আশ্চর্য সময়-ব্যবধানে তোমার আমার জন্ম, অভিন্ন শাহরিক পরিবেশে আমাদের বেড়ে-ওঠা, অপ্রত্যাশিত সব ঘটনাক্রমের ভেতর দিয়ে আমাদের নৈকট্য, প্রীতি, গাছের ছায়ায় মুখোমুখি বসতে চাওয়ার এই আকূতি—এমনি কত লক্ষ কোটি ঘটনার নির্ভুল ও পরম্পরাগতভাবে ঘটে যাবার দরকার ছিল সামান্য এই মুহূর্তটার জন্মের প্রয়োজনে। এই অনন্ত ধারাক্রমের মধ্যে কোথাও, কোনো একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ পর্যায়ে, পলকের ভিন্নতা ঘটে গেলেও এর সবকিছু স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যেত। কী ভাগ্যবান ঘটনাপারম্পর্যের ভেতর থেকে জেগে-ওঠা আমাদের আজকের এই দুর্লভ অভাবিত সময়ক্ষণ !

অথচ কী অবলীল সহজে একে হারিয়ে ফেলব আমরা। বিকেলটা কিছুক্ষণের মধ্যে আরেকটু গড়িয়ে গেলেই প্রয়োজনের টানে আমরা যে যার দিকে উঠে দাঁড়াব আর সাথে সাথেই দীর্ঘ দীর্ঘ সৃষ্টিযাত্রার ভেতর থেকে মুখ-জাগানো এই অসম্ভব মুহূর্তটার আগাপাশতলা সব মিথ্যা হয়ে যাবে।'

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে কেবল একটা মুহূর্তের জন্যে কথাটাকে সত্যি মনে হয়েছিল, আজ সারা জীবনের জন্যে।

৬.১.৮৭

৫২

সেই কবেকার ব্যাপার। সময়ের কুয়াশায় উঁচু মাস্তুলের মতো নিজের ঝাপসা একহারা চেহারাটা এখনো অস্ফুটভাবে চোখে ভাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্রদের সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা করছিলাম। ছাব্বিশ বছর আগের সেই যুবকের ভারাক্রান্ত মনে কী সব কথা সেদিন ব্যথিয়ে উঠেছিল ভুলে গেছি। কেবল মনে আছে বক্তব্য শেষ করেছিলাম একটা গল্প দিয়ে। গল্পটা এরকম :

পৃথিবীতে ছিল এক গাল্পিক মানুষ। রক্তের প্রতিটা কণায় অনুক্ষণ সে লালন করত গল্প বলার এক নিদ্রাহীন জ্বলন্ত উৎসাহ। রাস্তাঘাটে বাড়িতে পার্কে কোনো বন্ধু কিংবা পরিচিত কারো দেখা পেলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার শার্টের মাঝখানকার বোতামটা ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিরামহীন গল্প জুড়ে বসত।

Scanned by CamScanner

একদিন তার এক বন্ধুকে নিয়ে ঘটল এক মজার ঘটনা। বন্ধুটি এমনিতেই অফিসে যেতে দেরি করে ফেলেছিল। তাড়াহুড়ো করে কোনোমতে জামাকাপড় গায়ে চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে সে যখন পাগলের মতো অফিসমুখো ছুটে চলছে, ঠিক সেই সময়ে সে পড়ে গেল ওই গাল্পিক বন্ধুটার একেবারে সামনে। আর যায় কোথায়। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে দু হাত আগলে তাকে দাঁড় করিয়ে যথারীতি তার শার্টের মাঝখানকার বোতামটা ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একমনে তাকে গল্প শোনানো শুরু করল।

গল্প বলা পনের মিনিট ছেড়ে আধঘণ্টা, আধঘণ্টা ছেড়ে পুরো এক ঘণ্টার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। এদিকে অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তায় উত্তেজনায় লোকটা ঘেমে উঠল। কী করে ছাড়া পাওয়া যায়। চট করে একটা বুদ্ধি জুটে গেল লোকটার মাথায়। চাবির রিঙের সাথে ঝোলানো ছোট্ট ছুরিটা বের করে সেটা দিয়ে বোতামটাকে চটপট কেটে ফেলল সে। তারপর চুপ করে লোকটার অজান্তে তার সামনে থেকে মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

এদিকে সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। লোকটার অফিস ছুটি হল একসময়। হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছে সে। কিন্তু এ কী দৃশ্য দেখছে সে রাস্তার ওপর। ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গাল্পিক লোকটা তাকে সকালবেলায় আত্মবিস্মৃতের মতো গল্প বলে চলেছিল, ঠিক সেখানটাতে সেই অবস্থাতে দাঁড়িয়েই সে তখনো তার ফেলে-যাওয়া বোতামটাকে একইভাবে ধরে তেমনিভাবে গল্প বলে চলেছে।

গল্পটা শেষ করে বিদায়ী বক্তব্যটায় বলেছিলাম : এরপর এক এক করে আজকের মতো কেটে যাবে কত দিন, ... কত সকাল গড়িয়ে যাবে দুপুরে, দুপুরেরা নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের এই চারটা বছরকে ঘিরে আমাদের এই গল্প বলা কোনোদিন কি ফুরোবে?

আজ অন্যভাবে আর একবার কথাটাকে মনে হচ্ছে। জীবনের এই নিঃসঙ্গ বোতামটাকে আঁকড়ে ধরে মানুষের আত্মবিস্মৃত গল্প বলাও ওই গাল্পিক বন্ধুর মতোই কি অনিঃশেষ?

৬.১.৮৭

৫৩

সাধারণ মানুষ ঝগড়া করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, আলোকিত মানুষ মতবাদের স্তরে।

২.২.৮৭

৫৪

মৃত্যু চুপি চুপি এসে দরজার ওধারে ঘোরাফেরা করছে। আমি তাকে বলি : হে ঈপ্সিত আগন্তুক, তোমাকেও 'কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা' বলতে

Scanned by CamScanner

হয়। তুমি তো কোনোদিন এই দরজায় অবাঞ্ছিত ছিলে না! জন্মাবধি প্রতিটি রক্তকণিকায় আমি তো তোমারই স্তোত্রে উচ্চকিত। তবু অপরূপ স্নিগ্ধ বৈভবের আড়ালে ইস্পাতের নখরের মতো তোমার মধ্যযুগীয় রক্তাক্ত মুখ দস্যুর মতো ভয়ঙ্কর! তুমি কি আসতে পার না হল্লা না তুলে, নিঃশব্দে, অথবা ঝড়ের মতো উত্তাল কামিজ উড়িয়ে—আচমকা?

৩.২.৮৭

৫৫

সবাই 'স্থূলতা'র খোঁজে বেরিয়েই প্রথমে একসঙ্গে হয়, তারপর যে যার অনির্বচনীয়ের দিকে হেঁটে যায়।

১০.২.৮৭

৫৬

প্রত্যেকটা বিদায় কি আসলে একেকটা প্রত্যাবর্তন?

৬.৭.৮৭

৫৭

নিজের প্রবণতার সপক্ষে যেতে পারা উন্নতি; প্রতিকূলে এগোতে পারা ঋদ্ধি।

৭.৮.৮৭

৫৮

আমি সংগঠনে বিশ্বাস করি—বিশ্বাস করি দলে—শক্তিমান সমমনা মানুষদের যূথবদ্ধ সহযোগিতায়।

আমাদের দলের সভ্যরা হবে সমমনের কিন্তু কিছুতেই সমমতের নয়। এখানেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য। ওইসব প্রতিষ্ঠানের মূলে আছে একটা বিশেষ বিশ্বাসের ভিত্তি—সমস্ত মানুষ সেই বিশ্বাসের একক ধারাস্নানে নতজানু। কিন্তু আমাদের শক্তিমান মতপার্থক্যই আমাদের শক্তি। আমরা কিছুতেই একে অন্যের প্রতিকৃতি নই। এই উজ্জ্বলিত আত্মবিশ্বাসই হাজার হাজার প্রদীপের মতো আমাদের প্রত্যেককে শবেবরাতের রাতের বিপুল উৎসব সভায় আলোকিত করে রাখে।

চিন্তার জগতে দল গড়ে ওঠে, ভেঙেও যায়। হয়তো ভেঙে যাবার জন্যেই গড়ে ওঠে। এই ভাঙা-গড়া কেউ রোধ করতে পারবে না। আমরা কেউ কারো উঞ্ছবৃত্তিতে আগ্রহী নই। তাই আমাদের দল ভেঙে যাবে।

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

দশটা বছর এমনকি পাঁচটা বছর—নয়তো আরো অল্প সময়ের জন্যেই ভেসে থাকবে আমাদের এই ভালোবাসার সাম্পান। কিন্তু উদ্দীপনামদির এই কয়েকটা দিনের সময় পরিসরে সম্ভাবনার যে উচ্চতম শীর্ষকে আমরা পলকের জন্য ছুঁয়ে যাব, সেই অসম্ভবকে স্পর্শের পিপাসায় জীবনের পরবর্তী দিনগুলোকে আত্মবিস্মৃতের মতো পার করে, একসময় নিঃশব্দে বিদায় নেব আমরা।

৮.১১.৮৭

৫৯

ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে : 'ভালো মুসলমান সে, যে দিনে অন্তত পাঁচ বার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে' (অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়)। ভয় তাকে মহৎ করে তোলে।

পরীক্ষার ভয়ে যে ভীত তার নাম 'ভালো ছাত্র'।
শত্রুর ভয়ে যে ভীত, সে 'বীর'।
দারিদ্র্যের ভয় থেকে বাঁচতে গিয়েই মানুষ সম্পদশালী!
মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে বাঁচার চেষ্টাতেই আমরা জীবনপ্রেমিক।
তা হলে ভয়কে এত ভয় কিসের?
(আসবে কি তবে হে ভয়, নির্ভয়ে?)

১৭.১১.৮৭

৬০

গল্পটা ঠিক কার লেখা মনে নেই। ছকটুকু মনে আছে। ত্রিশ–চল্লিশ বছর বিদেশে কাটিয়ে এক ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন নিজের গ্রামে। ফিরেই সকলের কাছে ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধবদের খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন।

না, কেউ নেই এখন আর। প্রায় সকলেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে, কেউ কেউ চিরদিনের জন্যে পৃথিবী ছেড়ে।

ছেলেবেলার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিনহাযকেও আর পাওয়া যাবে না এখানে। ছেলেবেলায় গ্রামের উত্তর–ধারের বিলে বক ধরার ফাঁদ পাতায় যে ছিল তার নিত্যসঙ্গী—সেই কচি মুখের মিষ্টি ছেলে মিনহায বছর বিশ–পঁচিশ আগে সেই যে মধ্যপ্রাচ্যে চলে গেছে, আর ফিরে আসে নি। আসবেও না। বশিরও নেই আজ। ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকা চলে গিয়েছিল, আজ অব্দি সেখানেই আছে। ভুল করেও গ্রামের কথা মনে করে না। মতিউর মারা গেছে বছর পাঁচেক আগে। আমিনুল আমেরিকায় ডাক্তারি করে, বিস্তর পয়সার মালিক। না, কেউ নেই, কিছু নেই আর। ছেলেবেলার রাস্তাঘাট, স্মৃতি, বন্ধুবান্ধব, দুঃখশোক কোনো কিছুই নেই কোনোখানে।

Scanned by CamScanner

কিন্তু না—একেবারে শেষ হয়ে যায় নি সবকিছু। আছে এখনো একজন। একমাত্র সেই শুধু বেঁচে আছে একচ্ছত্র সম্রাটের মতো নিশ্চিন্তে। দে-পাড়ার মতলব আলি। ছেলেবেলার সেই 'মতলব'। স্বাস্থ্য আর পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে সবচেয়ে বহাল তবিয়তে একমাত্র 'মতলব'ই শুধু বেঁচে আছে আজ এই গ্রামে!

সারাদেশে সবখানে সবকিছুর ওপর মাথা উঁচিয়ে একমাত্র একচ্ছত্র 'মতলব'ই শুধু বেঁচে আছে আজ।

১৮.১১.৮৭

৬১

মতবাদ ছাড়া কোনো বাঙালি নেই।

জানুক না জানুক, বুঝুক না বুঝুক, সব বিষয়ে তার একটা বিজ্ঞ মতবাদ আছেই। শুধু আছে নয়, সবচেয়ে নির্ভুল, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠভাবেই আছে। পৃথিবীর তাবৎ বিষয় বিশদভাবে জানা না থাকলেও যে একজন মানুষের সম্মানজনকভাবে বাঁচা চলতে পারে এটা তার বিশ্বাসের বাইরে। বরং সবকিছুর যাবতীয় জ্ঞান যে সন্দেহাতীতভাবে তার করায়ত্ত—বিনা সংশয়ে এটাতেই তার একমাত্র আস্থা। অথচ এই বিশ্বাসে সে পৌঁছেছে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে প্রায় পরিপূর্ণ অজ্ঞতা নিয়েই। ফলে পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের সমস্ত কিছু সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞ নয়, এমন বাঙালি নেই।

ধরুন কোনো পাড়ায় একটা বিশেষ নম্বরের বাড়ি খুঁজতে গেছেন আপনি, কিছুতেই পাচ্ছেন না। হঠাৎ রাস্তার পাশে সুমার্জিত চেহারার একজন লোক দেখে আপনি আশান্বিত হয়ে উঠলেন : হয়তো হদিস পাওয়া যেতে পারে তাঁর কাছ থেকে। আপনার প্রশ্ন শুনে প্রথমটায় ভদ্রলোক বাড়িটার অবস্থান সংক্রান্ত চিন্তার ভেতর ক্ষণিকের জন্য ডুবে যাবেন, চিন্তার গভীর রেখা কপালে ফুটিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে দার্শনিকের মতো গম্ভীরভাবে ভাববেন কিছুক্ষণ, তারপর এক অনন্য মুহূর্তে, আবিষ্কারের ঐশ্বরিক দীপ্তিতে জ্বলে উঠে বলতে শুরু করবেন : ওই যে গবুটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে দেখছেন, ওটাকে পেরিয়েই বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরবেন—তারপর এগিয়ে যাবেন সোজা ডানদিকে। হাঁ, কমপক্ষে আধ মাইলটাক গিয়েই ধরবেন বাঁ দিকের তালগাছওয়ালা গলিটা ... ইত্যাদি ...। এমনিভাবে ডান বাম করে রাস্তার যে পথনির্দেশ তিনি দেবেন, সেটা ধরে এগিয়ে যেতে পারলে, আমি নিশ্চিত যে কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর আপনি দেখতে পাবেন, শহর থেকে মাইল কয়েক বাইরে, আপনার সেই বাড়িটার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন কোনো জায়গায়, হয়তো একটা ধু-ধু মাঠের মাঝখানে আপনি দিশেহারার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ভদ্রলোকটি কষ্ট করে আপনাকে সবই জানাবেন, শুধু ওই বাড়িটার আসল হদিস যে তার জানা নেই, বলবেন না কেবল ওইটুকুই।

২০.১১.৮৭

Scanned by CamScanner

৬২

মহাসড়কের বুকের ওপর দিয়ে বিরাট আকারের একটা আন্তঃনগর বাস যাচ্ছে। দুপাশের জনপদকে উপেক্ষা করে, মাঠ ঘাট প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে পরাক্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে সেই গাড়ি।

বাসের যাত্রীদের অনেকে যাত্রার এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমিতে বিরক্ত। কেউ কেউ গন্তব্যের উত্তেজনায় অস্বস্ত, স্বপ্নাতুর।

সামনের সিটে এক ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে খবরের কাগজ পড়ছেন। তার পাশেই আরেকজন শূন্য দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ওদিকে একজন ষণ্ডামতো লোক আজকালকার রাস্তার দুর্ঘটনার কথা বেমালুম ভুলে সিটে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন—নিশ্চিন্তে। বাসের মাঝামাঝি জায়গায় দুজন লোক মাঝেমধ্যে গল্প জমানোর চেষ্টা করছেন, গাড়ির ঝাঁকিতে খুব একটা জমছে না। একজন যুবক বসে আছে একা—তার দু চোখ জুড়ে স্বপ্নের নরম ঘোরাফেরা। তার পেছনেই একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বসে আছে। হয়তো নতুন বিবাহিত, নয়তো অন্যকিছু। মেয়েটা ফরসা, লাজুক। ছেলেটার উৎপাতে সলজ্জভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে কেউ দেখে ফেলল কি না। আশপাশের লোকগুলোর কেউ কেউ আড়চোখে এদের দেখছে।

এইভাবে গাড়ি চলছে। ...

গাড়ির লোকগুলোর অবকাশ আছে, স্বপ্ন আছে, উৎকণ্ঠা আছে, প্রতীক্ষা আছে। আছে খবরের কাগজ আর জানালার আশ্চর্য পৃথিবী।

অন্তত নিশ্চুপ বসে থাকার একঘেয়েমির অপ্রিয় অধিকার আছে। আর আছে গন্তব্যের আনন্দমুখর অভ্যর্থনার সুনীল প্রত্যাশা।

কেবলমাত্র বাসের সামনেটায় বসে থাকা একজন সজাগ মানুষের এসব কিছুই নেই। না বিশ্রাম, না খুনসুটি, না শান্তি, না স্বপ্ন।

লোকটা চালক।

ওই নিদ্রাখোয়ানো শ্রান্তিহীন নিঃসঙ্গ লোকটার জন্য খারাপ লাগে।

কী মর্মান্তিকভাবে নিজের কর্তব্যের ওপর উদগ্রীব হয়ে মরে আছে সে।

লোকটাকে দেখি আর নিজের কথা মনে হয়। নিজের বিশ্রামহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা।

২৮.৯.৮৮

৬৩

এমন একেকটা ক্ষেত্র আছে যেখানে সমস্ত যুগের মধ্যে আমিই হয়তো একমাত্র মানুষ।

৩০.৯.৮৮

Scanned by CamScanner

৬৪

বাঙালির স্বপ্ন গণতন্ত্র, কিন্তু সে স্বস্তি বোধ করে একনায়কতন্ত্রে।

৩০.৯.৮৮

৬৫

বিজয় মানে শত্রুর শক্তি আর নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে স্বচ্ছতম ধারণা।

৯.১০.৮৮

৬৬

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লক্ষ্যটা কিন্তু সামান্য : 'আরো একটু ভালো'। জীবন, সৌন্দর্য, বাস্তবতা, সংগ্রামের নিরন্তর কর্ষণের ভেতর দিয়ে উদ্যত মনুষ্যত্বে জেগে ওঠার ছোট্ট মূল কথাও কিন্তু ওইটুকুই : 'আরো একটু ভালো'।

যদি জীবনে একজন দারোগাও হতে হয় 'আরো একটু ভালো' দারোগা যেন হই। যারা বাস্তব পৃথিবীর লোক তাঁরাই শুধু জানেন একটা খারাপ দারোগা একটা ছোট্ট জীবনে কত মানুষের কত কষ্ট আর দুর্ভোগের কারণ। উল্টোদিকে একজন ভালো দারোগার কাছে কত মানুষের কত সুখ, আশ্রয়, নিরাপত্তা।

প্রগতি বা প্রতিক্রিয়া এই দুদলের কারো ব্যাপারেই কোনো দায় নেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের। আমাদের লক্ষ্য একটাই : মানুষের গুণগত সমৃদ্ধি।

দেশের বুদ্ধিমান মেধাবী সৃজনশীল তারুণ্যকে বিকাশের একটা অবারিত আকাশ দেয় এই কেন্দ্র, আর বলে : যদি প্রগতিশীল হও তবে 'আরো একটু ভালো' প্রগতিশীল হোয়ো, প্রতিক্রিয়াশীল হতে হলে 'আরো একটু ভালো' প্রতিক্রিয়াশীল।

এই পৃথিবী 'আরো একটু ভালো'র কাছেই চিরকাল নিরাপদ, কোনো মতবাদ বা বিশ্বাসের কাছে নয়।

২৯.১১.৮৯

৬৭

ছেলেদের সততা আর মেয়েদের সতীত্ব একই জিনিস—একবার গেলে আর ফেরে না।

১.৭.৮৯

৬৮

মহৎ লেখকদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে হলে তাঁদের 'রচনাসমগ্র' পড়তে হয় ; সাধারণ লেখকদের শক্তি বুঝতে হলে তাঁদের 'শ্রেষ্ঠ রচনা'।

Scanned by CamScanner

৬৯

দুটো পরিস্থিতিতে আমরা অসাধারণ : প্রভুসুলভ পরিস্থিতেতে আর দাসসুলভ অবস্থায়। বিদেশে চাকরি–বাকরির দাসসুলভ পরিস্থিতিতে আমাদের সাফল্য প্রবাদের মতো। দেশে অফিসের বড় সাহেব হিসেবেও তাই।

স্বাধীন মানুষের সহজ মর্যাদাবান ভূমিকাতেই আমাদের কেবল ব্যর্থতা।

৩.৮.৮৯

৭০

একজন কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর ভেতরকার 'কবি'কে, ব্যর্থ কবিতাগুলোর মধ্যে তাঁর ভেতরকার 'মানুষ'কে।

৮.১০.৮৯

৭১

ওহে যৌবনবতী মেয়েরা, তোমরা কেন শুধু ওই সমর্থ যুবকগুলোর দিকে ফিরে ফিরে চাও? তোমাদের যৌবনের গন্ধে মাতাল ওই মূঢ় যুবকগুলো তোমাদের কি জানে! তোমাদের উদ্ধত সুঠাম বিস্ময়ের সামনে বিভ্রান্ত ওরা তোমাদের কোমর জড়িয়ে শুধু কাঁদে। পশুর মতো, গ্রাম্য অকর্ষিত যুবকদের মতো তোমাদের তপ্ত মধুকে লোভীর মতো চেটেপুটে নিতে চায়। আর্দ্র ঠোঁটে শুধু টের পেতে চায় তোমাদের সুডৌল যৌবন।

তোমাদের দুর্লভ নারীত্বের মর্যাদা তারা কী করে দেবে? নির্দয় বর্শার মতো রক্তমাখা তোমাদের যৌবন ওরা মাতালের মতো, পশুর মতো শুধু ছিঁড়ে ছিঁড়ে পিষ্ট করে।

তোমরা আমাদের কাছে এসো! যৌবন পার হয়ে আমরা জেনেছি কোথায় বাস করে তোমাদের লুব্ধ নারীত্বের সেই তপ্ত তীব্র ভাণ্ডার। কোথায় তোমাদের শরীরের সেই আদিম কামনা যাকে মানুষ বলে 'যৌবন'। তোমাদের প্রতিটি রক্তগোলাপের উদগ্র সম্মান আমরা জানি। জানি কোন্ অলীক কৌশলে তোমাদের দেহ–বল্লরীতে আগুন ধরে, কোথায় কীভাবে তোমাদের প্রতিটি বাসনার পরম তৃপ্তি।

ওদের পশুত্বের থাবা থেকে আমাদের বৈদগ্ধময় অভিজ্ঞতার কাছে তোমরা এসো!

আমাদের অভিজ্ঞ সুখদ হাতের তপ্ত পরিচর্যার কাছে এসো;
তোমাদের মদির সম্ভারের সম্পন্ন গভীর পূর্ণতার কাছে এসো।

১০.১০.৮৯

Scanned by CamScanner

৭২

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আসল লক্ষ্য কী, এ নিয়ে নানান লোকের কাছে নানান কথা বলি আমরা। কিন্তু আমি তো জানি এই কেন্দ্রের সামনে আজ যদি সত্যিকার করণীয় কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে দুটো : এক, আজকের তরুণদের অর্থাৎ আগামীদিনের মানুষদের বড় করে তোলা ; দুই, তাদের সংঘবদ্ধ জাতীয় শক্তিতে পরিণত করা।

ভালো সময় বলতে কী বুঝি আমরা? ভালো সময় মানে সেই সময় যখন ভালো মানুষেরা সংঘবদ্ধ আর খারাপেরা বিভক্ত এবং পরাজিত। এর উল্টোটা ঘটলে তাকে আমরা দুঃসময় বলি।

আমাদের দেশের সব জায়গায় আজ অশুভের সংঘবদ্ধতা। কোথাও একটা দুর্বৃত্ত হেঁকে উঠলে সব দুর্বৃত্ত মুহূর্তে সংঘবদ্ধ হয়ে যায়।

আমাদের দেশের ভালো মানুষেরা আজ বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগহীন—যে যার আলাদা ঘরে বসে কাঁদছে। পরস্পরকে খুঁজে পাচ্ছে না।

তারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত আগন্তুক এবং প্রত্যেকের চারপাশে একরাশ অন্ধকার। তাদের মাঝখানকার এই বিচ্ছিন্নতার দেয়াল ভেঙে দিতে হবে।

তাদের সকলকে একত্রিত করতে হবে—'একত্রিত, সমবেত, আয়োজিত'।

এতগুলো বছর তাদের একত্রিত করার উপায় বার করতেই শেষ হয়েছে। আমরা এখন পথ জেনে গেছি। এখন সংগ্রাম গন্তব্যের জন্যে।

কাজ এখন একটাই : প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা। ভাই হে, তোমাদের মশালগুলো যেন পলকের জন্যেও না নেভে।

১৬.১০.৮৯

৭৩

নিরপেক্ষ মানে সবার বিপক্ষ।

১৬.১০.৮৯

৭৪

কোনো পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশাসককে নিয়ে তাঁর দেশের জনসাধারণ যখন অশ্রদ্ধাপূর্ণ মুখরোচক গল্প আর কৌতুক তৈরি করতে শুরু করে তখন বুঝতে হবে তিনি সেই দেশে তাঁর দানবীয় কর্তৃত্বের শীর্ষে অবস্থান করছেন। ওইসব হাস্যপরিহাস আসলে তাঁর অবৈধ দুর্লঙ্ঘ্যতার বিরুদ্ধে সেই পদদলিত জাতির এক ধরনের অক্ষম অঘোষিত যুদ্ধ—তাদের সর্বাত্মক পরাজয়ের এক ধরনের করুণ সান্ত্বনামূলক ক্ষতিপূরণ।

১৬.১০.৮৯

Scanned by CamScanner

৭৫

এবারো কেন্দ্রের আমগাছটায় ঝেঁপে মুকুল এসেছে। সোনা-রঙের অপর্যাপ্ত সে সম্ভার—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রতি বছর একটা মাত্র সপ্তাহের জন্যেই এমন হয়। কেন্দ্রটাকে গন্ধে সৌন্দর্যে মদির করে রাখে।

আশ্চর্য, কেন্দ্রের একটা ছেলে বা মেয়েকেও আজ পর্যন্ত একটা কথা বলতে শুনলাম না এ নিয়ে। ভাবতে অবাক লাগে এই বিপুল অবিশ্বাস্য সম্ভার, রূপ গন্ধের এত অপর্যাপ্ততা—একটা দিনের জন্যেও কারো চোখে পড়ল না! একটা হৃদয়ও পাগল হয়ে উঠল না! যদি হল তবে তার মত্ত চিৎকার কোথায়? পাগল তো চিৎকার করে!

৪.৪.৮৯

৭৬

কী উত্তেজনামধুর লেখার এই মুহূর্তগুলো! সারাটা জীবন ছোট্ট একটা মুহূর্তের মধ্যে এসে কী আনন্দময় অস্থির পদচারণা করতে থাকে।

২০.১০.৮৯

৭৭

সারা দেশের ছেলেমেয়েরা কত দূর-দূরান্ত থেকে এসে কত কিছু নিয়ে গেছে—ঘরের ভেতর এত কাছে থেকেও নিজের সন্তানেরা প্রায় কিছুই চায় নি।

মানুষের আত্মার সন্তানেরা নিজের ঘরে খুব কমই জন্মায়। আমাদের ঘরে যারা জন্মে, আমাদের রক্তের সন্তানেরা, তারা আসে জীবজাগতিক ধারায়, তারা থাকে আমাদের কাছে। কিন্তু আমাদের আত্মার সন্তানেরা কোথায় আছে কে জানে! হয়তো ইতোমধ্যেই তারা জন্মেছে। অজ্ঞাত অপরিচিত কোনো সুদূর গ্রামের অন্ধকার কুঁড়েঘর থেকে পায় পায় এগিয়ে আসছে তাদের সত্যিকার পিতার দিকে। কিংবা হয়তো আজ নয়, এক শ দু শ পাঁচ শ বছর পরে আমাদের অনুভব করার জন্যে এই পৃথিবীতে জন্ম নেবে একদিন।

মানুষের প্রকৃত সন্তান খুব কমই তাদের নিজের ঘরে জন্মায়।

২২.১০.৮৯

৭৮

ছেলেবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম—অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে নিয়ে সেই গল্প। গল্পটা সত্য মিথ্যা দুই-ই হতে পারে। গল্পটার উদ্দেশ্য ছিল অভিনেতা হিসেবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতিষ্ঠা।

Scanned by CamScanner

নীলদর্পণ নাটকে লম্পট রোগ-এর ভূমিকায় মঞ্চাভিনয় করছিলেন তিনি একবার। তাঁর অভিনয়প্রতিভা রোগ-এর চরিত্রকে এমন জীবন্ত করে তুলেছিল যে মনে হচ্ছিল সামনে দাঁড়িয়ে গেছে আমুণ্ডপদনখ এক শয়তান। ক্ষেত্রমণির ওপর বলাৎকারের দৃশ্যে সেই শয়তান হয়ে উঠল প্রায় মূর্তিমান জাতীয় অসম্মানের প্রতীক। ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা চটি ছুটে এসে আচমকা আঘাত করল শয়তানের মুখে। স্তব্ধ হয়ে গেল মঞ্চের ওপরকার ক্লেদাক্ত বেলেল্লাপনা।

সবাই দেখল দর্শকদের সামনের সারিতে বালকের মতো অপ্রতিভ বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। নিজের কৃতকর্মের লজ্জায় নিজেই লজ্জিত এবং বিব্রত। প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় বাস্তব ভেবে একটা স্বপ্নের মাথায় প্রস্তর নিক্ষেপ করে বসে আছেন তিনি। অর্দ্ধেন্দুশেখর মাটি থেকে চটি তুলে নিয়ে তা স্থাপন করলেন নিজের ললাটে। নতমস্তকে বললেন, আজ আমার অভিনয় সার্থক, কেননা এই অভিনয়ের প্রশংসায় স্বয়ং বিদ্যাসাগরের চটি আজ আমার দিকে ধাবমান হয়েছে।

অর্দ্ধেন্দুশেখরকে নিয়ে এই গল্প ; আর সবার দৃষ্টি অর্দ্ধেন্দুশেখরের ওপরেই। বাঙালির স্মরণে তাঁর স্মৃতিকে চিরজাগরূক করাই হয়তো এই কিংবদন্তির উদ্দেশ্য।

কিন্তু আর একজন মানুষ আছেন এই গল্পের মধ্যে যাঁর চেহারা ঠিক ভালো করে চোখে পড়ে না। গল্পের মূল উদ্দেশ্যও তিনি নন। তিনি আছেন এই গল্পের খানিকটা নেপথ্যে। তার মুখের ওপর সময়ের আবছা অন্ধকার, কারণ তিনি বসে আছেন দর্শকদের সারিতে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে। তিনি বিদ্যাসাগর।

অন্তত একজন মানুষ হেঁটে বেড়াতেন এদেশের রাস্তায় একদিন যাঁর চটির ক্ষমাহীন হাত থেকে কোনো অন্যায়ের নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁর এই একগুঁয়েমিকে সাহায্য করার জন্য প্রকৃতি তাঁর পায়ে ওই চটি পরিয়ে দিয়েছিল।

দেশ জানত তাঁর সম্মুখ থেকে কোনো অন্যায়ের পক্ষেই প্রতিবাদহীন বেঁচে যাওয়া অসম্ভব। ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে পড়বেন তিনি, তাঁর বিখ্যাত চটি চোখের পলকে বাতাস কেটে ছুটে যাবে সেই উৎপীড়কের দিকে। তা সে অত্যাচারী বাস্তবেরই হোক কিংবা মঞ্চের। হোক শয়তান কিংবা শক্তিমান।

চোখে অশ্রু নিয়ে তাঁকে আমি আজো খুঁজি বাংলাদেশের রাস্তা থেকে রাস্তায়। তাঁর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকি।

হঠাৎ কারো কারো মুখ দেখে আচমকা ভুল করে মনে হয়, ওই তো তিনি দাঁড়িয়ে!

মনে হয় এত অসংখ্য মানুষের ভিড়ের ভেতর তাঁকেই কেন শুধু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আজ। তিনি নিশ্চয়ই আছেন কোথাও এদেশে—এত মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র একজন মানুষ কিছুতেই অপ্রাপনীয় হয়ে যেতে পারে না।

২৪.১০.৮৯

Scanned by CamScanner

৭৯

'শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমাদের 'প্রতিভাবানদের' (?) তাচ্ছিল্য প্রায় কুসংস্কারের মতো। অনেকেরই ধারণা নিয়ম-কানুন পরিমিতি-পরিশীলনের মতো ছক-কাটা গৎ-বাঁধা ব্যাপারগুলো সব সাধারণ মানুষের জন্যে। প্রতিভাবানেরা এসবের বাইরে। কিন্তু সত্যিকার প্রতিভাবানেরাই জানেন ব্যাপারটা আসলে কতখানি বিপরীত। সাধারণ মানুষেরা শৃঙ্খলাকে অবলীলাতেই পেয়ে যায় স্বভাবের কাছ থেকে। প্রতিভাবানদের মতো আবেগের হিংস্রতা তাদের মধ্যে ধ্বংসকারী পর্যায়ে ক্রিয়াশীল নয় বলে ব্যাপারটা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে শক্তির প্রচণ্ডতার হাতে প্রতিনিয়ত ছিন্নভিন্ন প্রতিভাবানেরাই শুধু জানেন তাঁদের ওই হিংস্র বিশৃঙ্খল অস্তিত্বকে নিটোল অর্থময়তায় ফুটিয়ে তুলতে হলে শৃঙ্খলার প্রয়োজন কী মর্মান্তিক। আবেগের বন্য আক্রমণের চোয়াল থেকে তাঁদেরকে, জীবনের বিনিময়ে, তিলে তিলে রোজগার করে নিতে হয় শৃঙ্খলা—তিলোত্তমাকে রচনা করার জন্যেই করতে হয়।

২৫.১০.৮৯

৮০

আমি একটা নতুন জাতির নির্মাণ পর্বের মানুষ ছিলাম। আমার কালের সবার মতো আমিও ছিলাম এই জাতির অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা এবং জনক।

এই জাতির জন্মমুহূর্তের আনন্দাশ্রুতে আমার দুই কপোল সিক্ত। আমার প্রিয় মানুষদের ভাঙা করোটির ভেতর থেকে অনেক দীর্ঘ চিকন ঘাস অনেকবার গজিয়ে উঠে আবার মাটির সাথে মিশে গেছে।

এই জাতির নিশ্চিত স্থায়িত্বের সামনেই এখন আমি আপাদমস্তক নতজানু।

আমার প্রতিটি প্রাণকোষ এখন নির্মাণের বলীয়ান সক্রিয়তায় উদগ্রীব।

আমার সামনে এখন কাজ আর সংগঠনের বলিষ্ঠ পৃথিবী।

অস্তিত্বের সূক্ষ্ম জটিল বিশ্লেষণ, আত্মবাদী দর্শনের সুউচ্চ শিখর আমার জন্যে এখন অবক্ষয়ী বিলাসিতা।

আমার উদ্ধার এখন সম্মিলিত যূথবদ্ধতায়, ব্যক্তিসত্তার সাধ্যমতো বিনাশে।

জাতির সুদৃঢ় অস্তিত্বই এখন আমার নিশ্চয়তা ;

আমার আবেগ অপরিণত এবং বিশ্বাস কৈশোরিক ; আমার অস্তিত্ব মননের জটিল গোলক ধাঁধার সম্পত্তি নয় ;

আমার উচ্চারিত শব্দ গরিলার মতো আদিম ও জান্তব ; আমার জীবন নিষ্ঠুর ও নতুন, উদাত্ত ও আবেগময়—একটা ফলভারনম্র সোনালি দ্রাক্ষাকুঞ্জের আকাঙ্ক্ষায় তা আনত।

২৭.১০.৮৯

Scanned by CamScanner

৮১

গল্পটা অনেকের মতো আমিও পড়েছিলাম ছেলেবেলার কোনো বইয়ে।

গল্পটা এরকম :

এক বাজিকরের ছিল একটা বানর আর একটা ছাগল। তাদের দিয়ে সে লোকজনদের খেলা দেখাত। একদিন খেলা দেখাতে দেখাতে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ায় বাজিকর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে এক ভাঁড় দই কিনে আনল। তারপর একটা পুকুর পাড়ে বানর আর ছাগলটার সামনে দইয়ের ভাঁড়টাকে রেখে স্নান করতে নেমে পড়ল পুকুরে।

বাজিকরের বানরটা ছিল লোভী। সে সামনে দইয়ের ভাঁড়টা দেখে লোভ সামলাতে পারল না। বাজিকর পুকুরে নামতেই সে তাড়াতাড়ি ভাঁড়ের সবখানি দই খেয়ে ফেলল আর বাজিকর যাতে এই অপকর্মের কথা বুঝতে না পারে সেজন্যে বেশ খানিকটা দই ছাগলের দাড়িতে মাখিয়ে ভালোমানুষ সেজে বসে রইল।

স্নান সেরে বাজিকর দই খেতে এসে দইয়ের ভাঁড় খালি দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। ছাগলের দাড়িতে দই দেখে তার আর বুঝতে বাকি রইল না কাজটা কার। ক্ষিপ্ত হয়ে সে ছাগলটাকে বেদম মারতে শুরু করল।

ছেলেবেলায় পড়া গল্পটা প্রায় হুবহু মনে পড়ে। গল্পটার এই জায়গায় এসে এরকম কিছু বাক্য লেখা ছিল :

"কিন্তু একটি লোক দূরে বসিয়া সকল কিছুই দেখিয়াছিল। বাজিকর ছাগলকে মারিতে শুরু করিলে সে সামনে আগাইয়া আসিয়া তাহার কাছে 'প্রকৃত ঘটনা' খুলিয়া বলিল এবং ছাগলকে না মারিতে অনুরোধ করিল। বাজিকর তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কৃত অন্যায়ের জন্য লজ্জিত হইল।"

গল্পটার কথা মনে পড়লেই মনে হয়, ওই যে লোকটি দূরে বসে সবকিছুই লক্ষ্য করছিল, লোকটা আসলে কে? হঠাৎ কোথা থেকে বেরিয়ে এসে সে 'আসল সত্য' এভাবে তুলে ধরল? কোথা থেকে কীভাবে সে সবকিছুই নির্ভুলভাবে দেখে যায়। গোপনে বা প্রকাশ্যে, যে যেখানে যাই করুক, তার হাত থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই।

বড় হয়ে টের পেয়েছি, এই লোকটাই ইতিহাস। প্রকৃতির অমোঘ বিধানে সবার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সে সবকিছু শুধু দেখে।

১৯৮৯

৮২

কেউ যখন ভালোবেসে কারো শরীরকে স্পর্শ করে তখন সে আসলে তার নিজের ভালোবাসাকেই স্পর্শ করে।

১৯৮৯

Scanned by CamScanner

৮৩

১৯৬০ সালের একটি কথোপকথনের স্মৃতি :

প্রশ্ন : তোমরা যে 'আদর্শ আদর্শ' কর—আদর্শের কোনো 'দাম' আছে আজকাল?

উত্তর : কী করে আপনি জানলেন আমরা দামের জন্য আদর্শ করি? তা হলে তো যতক্ষণ দাম থাকবে ততক্ষণই আদর্শ, দাম ফুরোলেই 'ফুস'।

প্রশ্ন : তা হলে কেন আদর্শ?

উত্তর : আদর্শকে ভালোবাসি বলে! রক্তের মধ্যে এর চিৎকার নিদ্রাহীন অনুভব করি বলে! এ ছাড়া বাঁচি না বলে!!

১৯৮৯

৮৪

আমাদের ভালোবাসার মুহূর্তগুলো কী সুন্দর! আমাদের হাস্যকর বোকামির সেইসব রঙিন মুহূর্তগুলো!

১৯৮৯

৮৫

আবেদ খান সকালে ফোন করে জানালেন এক দিনের একটা প্রমোদ ভ্রমণের পরিকল্পনা দলীয়ভাবে পাস হয়েছে। দরকারি সবকিছুর ব্যবস্থাও শেষ। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) আমরা সবাই কুমিল্লার বার্ডে যাচ্ছি। সারাটা শুক্রবার ময়নামতিতে হইচই করে সন্ধ্যায় ফিরে আসা হবে। প্রস্তাব লোভনীয়, তার ওপর মিলিত সিদ্ধান্তের চোখ রাঙানি। কিন্তু কী করে যাব? এতগুলো পাঠচক্র বসবে কেন্দ্রে! এতগুলো ছেলেমেয়ে আমার কারণে এসে ফিরে যাবে!

কিছুদিন আগেও এমনি একটা নিমন্ত্রণ রাখতে পারি নি। উনি এবার কিন্তু আমার কোনো ওজর আপত্তিই শুনতে নারাজ। আমার অসহায় অবস্থাটা তাঁকে বোঝানোও মুশকিল। আমি জানি, না-যাবার ব্যাপারে আমার অনমনীয়তা তাঁর কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চললে সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি অনিবার্য। দশটা বছর ধরে সম্পূর্ণ ছুটিহীন মানুষহীন একটা নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা! ব্যক্তিগত জীবন—মানবিক সুখ-দুঃখের সেই একান্ত নিজস্ব ছোট্ট উঠোনটুকু—কোথায় হারিয়ে গেছে!

১৯৮৯

Scanned by CamScanner

৮৬

১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সে সংগ্রাম ছিল বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে। আমরা তাতে জয়ী।

যুদ্ধের পর অনেকে ভেবেছিলেন আমাদের যুদ্ধ চিরকালের মতো শেষ।

অল্পদিনের মধ্যেই ভুল ধরা পড়েছিল আমাদের। আমরা জেনেছিলাম আগের যুদ্ধটা আসলে ছিল একটা ছোট্ট সংগ্রাম, একটা সম্পূর্ণ যুদ্ধের প্রথম গোলাবর্ষণের দূরাগত ধ্বনি-মূর্ছনা মাত্র। আমাদের প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এর পরে—তার হিংস্রতা এখন বিস্তীর্যমান।

এই যুদ্ধ রক্তাক্ত এবং নিষ্ঠুর, সর্বাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী—একটা জাতির অস্তিত্বগত যোগ্যতার প্রকৃত পরীক্ষা এটা।

এই যুদ্ধ আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে। আমাদেরই পাপ ও পচনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ—আমাদের অযোগ্যতা আর ক্লেদের বিরুদ্ধে। আমাদের ক্ষুদ্রতা, লোভ, দৈন্য এবং দুঃখ এবার আমাদের প্রতিপক্ষ।

১৯৮৯

৮৭

হায় ব্যস্ততা! নিজের মৃত্যুর জন্য দুঃখ করার সময়টুকু পর্যন্ত নেই।

১৯৮৯

৮৮

নিজের জাতিটাকে নিয়ে একেক সময় হতাশায় ভুগি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই যার সব শক্তি শেষ হয়ে যায়, এগিয়ে গিয়ে সে আক্রমণ করবে কী করে?

১৯৮৯

৮৯

প্রকৃতি আমাদের ভেতরকার 'মানুষটাকে' বাইরে নিয়ে আসে, সভ্যতা 'জানোয়ারটাকে'।

১৯৮৯

৯০

বার্ধক্য ঠ্যাঙে কামড় দিয়ে ধরেছে; এখন আর কোনো সুসংবাদ নেই।

৩০.৮.৮৯

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

৯১

কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁরা একটা বা দুটো অবিশ্বাস্য বইয়ের সামান্য কয়েকটা পৃষ্ঠার ভেতরে ধারণ করতে পারেন শিল্পের সামগ্রিকতাকে—একটা নিটোল মুষ্টির ভেতর মানব-অস্তিত্বের যাবতীয় রোদন ও রক্তক্ষরণ। শিল্পের আলোকিত রঙ্গমঞ্চের ওপর সৌকর্যপটীয়সী নৃত্যশিল্পী এঁরা। বদলেয়ার বা বেকন, র‍্যাঁবো বা গ্রে, প্যাসকাল, খৈয়াম, রাশফুকো বা গীতার কবি এই দলের।

কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁদের জীবনোপলব্ধির জন্যে দরকার সময় যাত্রার সুবিপুল পরিধি। হাজার হাজার পৃষ্ঠার লক্ষ লক্ষ শব্দের ভেতর দিয়ে তাঁদের অস্তিত্ব ঘোষণার সামগ্রিক আয়োজন। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, বালজাক, হুগো, দস্তয়েভস্কি, গ্যেটে, ডিকেন্স থেকে শুরু করে পৃথিবীর মহাকবিরা সবাই এই ধারার সন্তান।

যত সামান্য মাপেরই হোক, আমি এই দ্বিতীয় গোত্রের মানুষ। হাজার হাজার আলোকোজ্জ্বল বাক্যের মহাকাব্যিক বিশালতার ভেতর দিয়ে আমার মুক্তি।

জীবনের কাছ থেকে সে সুযোগ মিলল কই? দেশ এবং জাতির জন্যে নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা, চারপাশে একটা সুখী জনগোষ্ঠীর জন্যে সুগভীর আকূতি আর ডাকাতের মতো নিষ্কৃতিহীন একটা বিবেক—হাজার হাজার তুচ্ছ অর্থহীন প্রয়োজনে আমার সব অপার্থিব মুহূর্তগুলোকে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

১৯৮৯

৯২

অতিরিক্ত চাওয়াই আজ আমাদের জাতিটাকে ভিক্ষুক করে ফেলল।

১৯৮৯

৯৩

আমাদের এই দুর্নীতিপরায়ণ দেশে আজ যে কজন মুষ্টিমেয় মানুষ এখনো ব্যক্তিগত সততা টিকিয়ে বেঁচে থাকার সাহস দেখাচ্ছেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হওয়া উচিত।

৯৪

প্রায় কোনো মানুষই এই পৃথিবীতে তার নিজের জীবন যাপন করে না। কেউ যাপন করে তার বাবার জীবন, কেউ মায়ের, কেউ পরিবারের, কেউ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ বা সংসারের, কেউ সময় পরিপার্শ্ব কাল ও ভূগোলের। অন্যেরা তাকে যে জীবনের নীতিমালা তৈরি করে দেয়, যে জীবনকে তার জন্যে ভালো বলে বেছে দেয়—সেই জীবন, তার নিজের নয়। যে জীবনে

Scanned by CamScanner

তার আত্মার আনন্দ, প্রজ্ঞার প্রজ্বলন—সে জীবন নয়। যে জীবনের জন্যে তার রক্তের ক্রন্দন, মজ্জার আকূতি, সে জীবনও নয়—বরং অন্যদের নির্বোধ সিদ্ধান্তের অগ্রহণযোগ্য দুঃখবিধুর একটা জীবন—নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রামে আর রক্তক্ষরণে অশ্রুপাতবিধুর একটা আমৃত্যু জীবন।

জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে গেছে এর মধ্যে, অনেক গহন ক্ষতি একে দীর্ণ করেছে। সবকিছু এর নিরর্থক ছিল এমনও বলব না। কিন্তু একটা কথা অন্তত সত্যি : যে জীবনে এই পৃথিবীতে আমি বেঁচে ছিলাম, সেটা ছিল একান্তই আমার জীবন, আর কারো নয়, কোনো কিছুর নয়। যে জীবনে আমি বাঁচতে চেয়েছি সেই জীবন ছিল এটা। অন্যের বেছে দেওয়া, অন্যের সিদ্ধান্তের বা কৃপার অসম্মানিত অপচিত জীবন নয় তা—প্রতি মুহূর্তের স্বাধীন আনন্দে আলোতে উজ্জ্বলিত, দুঃখে দ্বৈরথে উচ্চারণে রক্তাঘাতে রোদিত, জ্বলিত, স্বরিত একটা জীবন।

১০.৯.৮৯

৯৫

টেলিভিশনের কৃপায় বাংলাদেশে এখন আর কোনো শিশু নেই—সবাই হয় যুবক নয় যুবতী।

১৯৮৯

৯৬

কী উষর আর দুঃখপূর্ণ এই জীবন। তবু কত জনের চেয়ে কত ভালো!

১৯৮৯

৯৭

আমি অন্ধ; দৃষ্টিমান শুধু আমার অন্ধত্বের অবস্থানে।

১৯৮৯

৯৮

কেউ কিছু না করতে পারলে বোলো না, সে করে নি; বোলো : সে পারে নি।

১৫.১১.৮৯

৯৯

এমন একটা অসুস্থ কালে ও পরিপার্শ্বে আমাদের দায়িত্ব একটাই—সুস্থ থাকা। শুধু লক্ষ রাখা, আমরা যেন হতাশায় ভেঙে না পড়ি—যেন পাগল না হয়ে যাই—

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

আত্মহত্যা করে না বসি। চারপাশে সবাই ক্রমাগতভাবে কেবলই সুস্থতা হারাচ্ছে। সুস্থতা হারালে আমাদের বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। আমাদের আক্রমণের ধার দুর্বল হয়ে পড়বে, আমরা হেরে যাব। এই নিশ্ছিদ্র কালবেলায় পরাজয়কে ঈশ্বর বানাবার বিলাসিতা কিছুতেই চলতে পারে না।

১৯৮৯

১০০

মন দিয়ে কি সবসময় সবকিছু শুরু করা যায়। শুরু করেও তো আমরা অনেক সময় মন দিই।

১২.১.৮৯

১০১

শ্রেষ্ঠ হতে হলে গানকে 'জনপ্রিয়' হতেই হবে, যেমন নিকৃষ্ট হতে হলে সাহিত্যকে।

১২.১.৮৯

১০২

১৯৫৭ সাল। উচ্চমাধ্যমিকের পর বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে হল সবাইকে। আত্মীয়স্বজনেরা যারপরনাই আহত, ক্ষুব্ধ এবং হতাশ হলেন। হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাকে নিয়ে অনেকের অনেক আশা ছিল। পারিবারিক সুনাম পরিচিতির কথা ভেবেই হয়তো ছিল। সবাই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। আমার বড় মামার (যিনি আমাকে সবচেয়ে স্নেহ করতেন) অভিমানাহত নিঃশব্দ প্রতিবাদ হল সবচেয়ে মর্মান্তিক। চারপাশের সমবেত প্রতিরোধের সামনে মানসিকভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লাম। ঢাকায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে আব্বার কাছে যাবার দরকার হল—সাতক্ষীরায়।

উনি তখন ওখানকার কলেজের অধ্যক্ষ। সারা পৃথিবীতে আব্বার কাছেই সেসময় আশ্রয় পেয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাকে বাসে তুলে দেবার জন্যে আব্বা আমার সঙ্গে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এলেন। বাস ছাড়তে তখনো মিনিট পনের বাকি। আব্বা আর আমি বাসের ধার ঘেঁষে হাঁটছি—নিঃশব্দে, বিষণ্ণভাবে। হঠাৎ আমার পাশের প্রবুদ্ধ অধ্যাপকটি গাঢ়স্বরে আমার উদ্দেশে কথা শুরু করলেন—আমার ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে আমার আজীবন পথপ্রদর্শকের গভীরতম উক্তি : 'বুঝলি, আমাদের সবার বুকের খুব গভীরে একটা মানুষ বাস করে। সে কথা বলে'। আব্বা বলে চললেন, 'ভালো করে

Scanned by CamScanner

কান পাতলে তার গলার স্বর শুনতে পাওয়া যায়। জীবনে যখন কোনো সঙ্কট আসবে তখন তার কাছে পথের নির্দেশ চাইবি। যেদিকে সে যেতে বলবে অনুগতের মতো বিনা দ্বিধায় সেদিকে চলে যাবি। মনে রাখবি ওটাই তোর পথ। ওখানে তুই রাজা। রাজার মতোন একা। ওখানে তোর বাবা নেই, মা নেই, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-পরিজন পৃথিবী সংসার কিছু নেই। সেখানে তুই আর তোর জীবন।" আমি আব্বার কথা রেখেছি; সারা জীবন বুকের ভেতরকার মানুষটা ছাড়া কারো অনুরোধ বা নির্দেশে আমার জীবন পরিচালিত হতে দিই নি।

১৯৮৯

১০৩

ঢাকা শহরের কবির সংখ্যা আজ পাঁচ হাজার। এত কবি, কিন্তু সেই অঘটনঘটনপটীয়সী 'প্রতিভা' কোথায়?

আমাদের কাব্যজগৎ প্রায় বাংলাদেশেরই মতো। জনসংখ্যা আছে, মানুষ নেই।

কোনো শিল্পে উজ্জ্বল সাফল্যের জন্য সেই শিল্পের বিস্তৃত অনুধাবন আর চর্চা অনিবার্য।

আমাদের তরুণ লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পঠন-পাঠন তবে কেন শূন্যের কোঠায়? "জন্মগত প্রতিভা" এখন সুনীল আকাশে পতাকা উঁচিয়ে গাড়ল আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসছে। সাহিত্যের প্রতিটা বর্ধিষ্ণু কালে জ্ঞান আর প্রতিভা তো সমার্থক বলেই বিবেচিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর সময়কার সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষ। সেই কালের সবচেয়ে পণ্ডিত এবং ঋদ্ধ ব্যক্তিও ছিলেন তিনি।

মাইকেল তাঁর সময়কার সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষ। একই সঙ্গে তাঁর কালের শ্রেষ্ঠতম সুশিক্ষিত মানুষও তিনি।

বঙ্কিমের লোকশ্রুত প্রতিভা ও বৈদগ্ধ ছিল সমার্থক ; রবীন্দ্রনাথেরও তাই। তিরিশের শ্রেষ্ঠ কবি-লেখকদের কেউই প্রায় এর ব্যতিক্রম নন।

সব কালে এই একই আবহমান ব্যাপার।

আজ কী যুগে আমরা এসে পড়লাম যখন 'অশিক্ষিত' না হলে 'প্রতিভাবান' হবার সব পথ বন্ধ!

২৮.৪.৯০

১০৪

আজ অনেক "চোর বাবা" চাই আমাদের ছেলেমেয়েদের—রসিকতা করে 'কেন্দ্র'র ছেলেমেয়েদের দুয়েক সময় কথাটা বলে ফেলি। বলি :

"বাবা কি ঘুষটুশ খায়, চুরিটুরি করে? খুন করেছে দু-চারটা? ডাকাতি

Scanned by CamScanner

লুটতরাজ বা রাষ্ট্রীয় দস্যুতা করে টাকা করেছে কাঁড়ি কাঁড়ি? যদি এমন করে গিয়ে থাকেন, তবে তোমাকে বড় করে তোলার ব্যাপারে শ্রম দিতে আমি রাজি।"

"কেন?" জানতে চায় ছেলেমেয়েরা। আমি বলি :

"তিনি যদি এভাবে সম্পদের অবৈধ পাহাড় গড়ে গিয়ে থাকেন, তবে একটা বড় উপকার করে গিয়েছেন তিনি তোমার জন্যে। দ্বিতীয়বার ওসব অন্যায় করার দরকার থেকে তোমাকে অব্যাহতি দিয়ে গেছেন। তুমি যদি ভালো কিছুর জন্য জাগ্রত হয়ে থাক তবে ওই বিত্তের ওপর দাঁড়িয়ে তা করার সুযোগ রেখে গেছেন তোমার জন্যে।

"কিন্তু ওসব বিত্তটিত্ত যদি তিনি না করে গিয়ে থাকেন তা হলে তুমিই তো সেই কুখ্যাত লোকটা—তোমার বাবার মতো ধন-সম্পত্তির জগতে পা রাখা প্রথম প্রজন্মের মানুষটি—সেই ঘুষখোর, সেই খুনি, সেই রাষ্ট্রীয় দস্যু, সেই ডাকাত। তোমার শক্তিকে বাড়িয়ে তুলে এই জাতির জন্যে আর একটা সুদক্ষ ঘাতকের জন্ম দেওয়াকে কেন আমার শিক্ষকসত্তার দায়িত্ব করতে যাব?

"যদি তিনি ওসব না করে গিয়ে থাকেন তবে তুমি তো অনেকের মতো একালের নির্মমতম জীবনসংগ্রামের আরেকজন দুঃখজনক শহীদ। ভবিষ্যতে সন্দিহান, সততায় দ্বিধাগ্রস্ত, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিস্রস্ত বিপর্যস্ত একটা মানুষ। বড় কী দিতে পারবে তুমি জাতিকে?"

সত্যি আজ অনেক "চোর বাবা" চাই আমাদের ছেলেমেয়েদের।

২২.৫.৯০

১০৫

ধরা যাক বেশকিছু লোকের একটা বড়সড় জনতা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। জনতা আমাদের মুখোমুখি, শ খানেক গজ দূরে। জনতার যারা সদস্য তাদের গড়পড়তা উচ্চতা সাধারণ বাঙালির মতোই—পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মধ্যে। এ অবস্থায় দলের মধ্যে এমন একজন মানুষকে দেখা গেল যার উচ্চতা পুরো ছ ফুট। এবার পুরো দলটার দিকে তাকালে কাকে চোখে পড়বে আমাদের? কাকে মনে হবে দলের প্রধান ব্যক্তি—দলনেতা? দলটির সমস্ত শক্তি, উদ্দীপনা আর আলো যার মধ্যে প্রতীকায়িত। নিশ্চয়ই ওই উঁচু মানুষটিকেই—নয় কি?

অথচ দলের অন্যান্যের সাথে তার উচ্চতার পার্থক্য কতটুকু? মাত্র চার ইঞ্চি। কথাটার মানে দাঁড়াল এই : পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি পর্যন্ত তিনি আর দশটা সাধারণ মানুষের সমান। আলাদা কেবল চার ইঞ্চির তুচ্ছ একটু পার্থক্যে।

কিন্তু কী মারাত্মক ওই তুচ্ছ চারটি ইঞ্চির বেদনাময় ব্যবধান! কী সামান্য অথচ অভাবিত, কী সীমিত অথচ সুদূর যা একজন মানুষকে সাধারণ স্তর থেকে ছোঁ মেরে একেবারে শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষতম বেদিতে তুলে নিয়ে গেল!

Scanned by CamScanner

প্রতিভাবান মানুষেরাও কি ঠিক এমনি? সমস্ত জায়গাতেই আমাদের আর দশটা মানুষের মতো সাধারণ, কেবল এমনি বিশেষ একটা জায়গায় সামান্য একটু ওপরে—ঠিক ওই চার ইঞ্চির মতো। অথচ কী অলঙ্ঘনীয় এই তুচ্ছ চারটি ইঞ্চি, কী ক্ষুদ্র আর অপরিমেয়, কী হাস্যকর আর অশ্রুময়—সারাজীবন দাঁড় বেয়েও যাকে কোনোদিন অতিক্রম করা যাবে না।

২৯.৫.৯০

১০৬

সেবার টেলিভিশনে ঈদের 'আনন্দমেলা' অনুষ্ঠানে উপস্থাপক একটা প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নটা এমন :

"আপনি একসময় টেলিভিশনের জনপ্রিয় উপস্থাপক ছিলেন। একটা কথার উত্তর দিন আমাদের। পৃথিবীর সবার কাছে একসঙ্গে পরিপূর্ণভাবে জনপ্রিয় হবার উপায় কী?"

উপস্থাপকের প্রশ্নের আমি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলাম : 'মারা যাওয়া।'

আর কোনো দেশের জন্য কথাটা কতদূর প্রযোজ্য জানি না, কিন্তু বাংলাদেশের জন্য কথাটাকে অনিবার্য বলে মনে হয়।

আমরা যে বেঁচে আছি এ জন্যেই অনেকে আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ। তার ওপর আবার খাচ্ছি দাচ্ছি, কাজকর্ম করছি, এমনকি ভালোই কিছু করছি—এত কী করে সহ্য করা সম্ভব!

"এ্যাঁ, আবার কাজ করাও হয় দেখছি। একেবারে পরোপকারের মুহম্মদ মহসীন! ... আবার হাসেও দেখি! ... খুব ফূর্তি, না? ... জানি, জানি এত ফূর্তি কোথা থেকে আসে। যেদিন ধরিয়ে দেব! ..."

অর্থাৎ ফূর্তি বন্ধ করে দিন, হাসি বন্ধ করে দিন—কাজ, উপকার, উদ্যম, আগ্রহ সবকিছুর ঘরে তালা দিয়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে তক্তপোশের ওপর সটান শুয়ে কোনোভাবে শান্তিমতো একটু মারা যান—দেখবেন আপনার জনপ্রিয়তা। জান্নাত থেকে অঝোরে পুষ্পবৃষ্টি। কর্মবীর, দানবীর, চিন্তাবীর, জাতীয় বীর, বীরশ্রেষ্ঠ—সব একসঙ্গে।

"আহা, মানুষ তো নয়, সাক্ষাৎ ফেরেশতা ছিলেন ভদ্রলোক, কী বলেন আপনারা।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ..." বলতে থাকবেন তাঁরাই যাঁরা আপনার জীবদ্দশায় ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আপনার হৃৎপিণ্ডটাকে টুকরো টুকরো করেছে প্রতিদিন।

"বলুন, এ জন্যেই কি তাঁকে ওপারে, অর্থাৎ তাঁর নিজ বাসভূমিতে—বেহেশতে পাঠাবার জন্যে আমরা আজীবন সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাই নি!"

Scanned by CamScanner

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এতে সন্দেহ কি? হিপ হিপ হুররে। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।"

তাঁদের উদ্দীপ্ত শ্রদ্ধাবর্ষণ দেখে অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার কাছে বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে, বেঁচে থেকে এতকাল কী বিরাট লোকসানের মধ্যে আপনি ছিলেন।

৩০.৫.৯০

১০৭

এমন একজন মানুষের কথা ভাবা যেতে পারে যার উচ্চতা একজন গড়পড়তা সাধারণ বাঙালির উচ্চতার মোটামুটি সমান : ধরা যাক পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির সামান্য ওপরে বা নিচে। তার নাক কান চোখ চিবুক ঘাড় কিংবা গলার গড়নও একজন গড়পড়তা বাঙালিরই অনুরূপ। তার দুই পা এবং বাঁ হাতও তার সমান উচ্চতার আর দশটা বাঙালির মতো। শুধু শরীরের একটা প্রত্যঙ্গ তাঁর একটু ব্যতিক্রমী—সেটা তার ডান হাত। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে তার ডান হাতটা অবিশ্বাস্যরকম লম্বা। ধরা যাক—একজন সাধারণ মানুষের তিন হাতের সমান। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো দুর্গম সুদূর প্রান্তে বা ধরুন সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের মধ্যেও যদি এমন একজন মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় তবে কী ঘটবে পরবর্তী ঘটনা? প্রথমত তার ডান হাতের দৈর্ঘ্যের উৎকট ব্যাপারটা তার এলাকার মানুষদের মধ্যে কৌতূহল জাগাতে শুরু করবে। সবার মুখে মুখে আলোচিত অতিরঞ্জিত হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তাকে তার এলাকায় করে তুলবে রীতিমতো পরিচিত আর খ্যাতিমান। মুহূর্তে সারা দেশের সব জায়গায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়বে খবরটা। দু মাস যেতে না যেতে নিউইয়র্ক, লন্ডন, টোকিও, প্যারিস থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের বড় বড় পত্রপত্রিকা এবং সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকেরা ক্যামেরা নিয়ে জড়ো হবে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ওই সুদূর অপরিচিত জায়গাটাতে। পৃথিবীর প্রতিটা পত্রপত্রিকায় তার আর তার সেই অদ্ভুত হাতের অস্বাভাবিকতা আর উৎকট দীর্ঘতার ছবি ফলাও করে প্রকাশিত হবে। রাতারাতি পৃথিবীর ঘরে ঘরে খ্যাতিমান হয়ে যাবে লোকটা।

মানুষের প্রতিভাও কি এমনি এক দীর্ঘ উৎকট অস্বাভাবিকতার নাম? অস্তিত্বের কোনো একটা অংশের একপেশে অপ্রতিরোধ্য অসুস্থ বিকাশ? যক্ষ্মা রোগীর মতো সমস্ত শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত পুঞ্জীভূত করার মতোই, অস্তিত্বের সমগ্রতাকে অনটনগ্রস্ত করে সত্তার কোনো একটা বিশেষ অংশে জৈব প্রেরণার পরিপূর্ণ কেন্দ্রীভূতকরণ? তা না হলে প্রতিভাবান মানুষদের প্রতিভার অংশে শক্তির যে হিংস্র নিষ্ঠুর প্রাণধারা বহমান দেখা যায়, তার পাশাপাশি, প্রতিভার এলাকার বাইরে তাঁদের অস্তিত্বের বেদনাদায়ক শূন্যতার ব্যাখ্যা কোথায়।

১.৬.৯০

১০৮

কখনো দেখো না কী কাজ হচ্ছে। দেখো, কে করছে।

৩০.৫.৯০

১০৯

আমার ছোটভাই বেলাল–আল মনসুর—হঠাৎ করেই সপরিবারে আমেরিকায় পাড়ি জমাল। সত্তর থেকে আশির দশকে বেলাল টেলিভিশনে উঁচুদরের অভিনয় সাফল্য দেখিয়েছিল। স্বাধীনতা–উত্তরকালের বাংলাদেশের তরুণ সমাজের নৈরাশ্য ও উদ্দেশ্যহীনতার ও ছিল প্রায় মূর্ত প্রতীক। প্রায় একটা নতুন ধারারই জন্ম দিয়েছিল ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে। এক দশক ধরে, সেই ধারা এখানকার অভিনয় জগৎকে আক্রান্ত রেখেছে।

এমন বেলাল হঠাৎ সেদিন ধূমকেতুর মতো বাসায় এসে বলল, "আমেরিকায় চলে যাচ্ছি।" জিজ্ঞেস করলাম, "একেবারে যাচ্ছিস, না ফিরেটিরে আসবি?"

"না, আসব না।" বেলালের কণ্ঠ নির্বিকার।

কয়েকদিন আগে ওর চিঠি পেয়েছি। ও লিখেছে : আপনাদের মতো জীবনের দুই শিং ধরে লড়াই করার শক্তি আমার ছিল না, তাই পালিয়ে এসেছি।

আমি জানি বেলালকে এভাবে পরাজিত করে দেশছাড়া করেছে কে? দারিদ্র্য। অবর্ণনীয় অসহনীয় দারিদ্র্য। বহুকাল ধরে আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা সততার ঐতিহ্য চলে আসছে, সেই ঐতিহ্য একসময় ওর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটা দারিদ্র্যের অহঙ্কার, নৈতিক জীবনের মর্যাদাবোধ আমাদের ভাইবোনদের মতো ওর মধ্যেও ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু দেশের ভেতরকার নির্মম লুণ্ঠনের জগতে ওই অহঙ্কারের মূল্য ও পায় নি।

দারিদ্র্যের আক্রমণে ধুঁকতে ধুঁকতে ও একসময় ভেঙে পড়েছে। শুনেছি নিজে কেবল দেশ ছাড়ে নি, পরিবারের অনেককে একে একে বিদেশে নিয়ে যাবার ফন্দিতেও আছে।

কিন্তু যে দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে ওর এই সিদ্ধান্ত সেই দারিদ্র্য তো ওর অচেনা নয়! আশৈশব এর চেয়ে বেশি না হলেও এর চেয়ে কম দারিদ্র্যের মধ্যে তো আমরা জীবন কাটাই নি। তা হলে কেন গেল ও? একি কেবল দারিদ্র্যের নিঃস্বতা? কেবল অনটনের সঙ্কট? নাকি অন্য কোনোরকম শূন্যতা? আমার কিন্তু অন্য কিছুর দিকেই মন যেতে চায়।

যারা দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে, তারা আর যাই হোক, প্রতিভাবান হতে পারে না (বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির মতো এমনি দুয়েকটি ক্ষেত্রের মানুষ ছাড়া)। প্রতিভাবানেরা তো এক ধরনের 'রাজা'। তারা 'বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা' হয়ে না

Scanned by CamScanner

খেয়ে শুকিয়ে মরেও যাবে, কিন্তু বিদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না।

আমার মনে হয় বেলাল যে চলে যেতে পারল তার আসল কারণ, ও টের পেয়েছিল ওর প্রতিভা ফুরিয়ে এসেছে। ওর রাজত্বের দিন শেষ।

যে সুন্দর অলীক ঘুড়িটা ওর অজানিত তারুণ্যের দিনগুলোয়, আচমকা, স্বর্গ থেকে এসে ওর অনামিকায় জড়িয়ে গিয়েছিল, একসময় হতাশা আর বিস্ময়ের সঙ্গে ও টের পেয়েছিল হঠাৎ তা একদিন সুতো কেটে প্রত্যাবর্তনহীন যাত্রায় আবার হারিয়ে যাচ্ছে—তাকে আর কিছুতেই ফেরানো যাচ্ছে না। আসলে আর্থিক কষ্ট নয়, বরং মর্যাদাহীন নীরক্ত জীবনটাতেই ও বাঁচতে চায় নি।

সত্যিকার আত্মমর্যাদা ছিল বলেই চায় নি।

১.৬.৯০

১১০

আমি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে লাইব্রেরি বাড়ানোর পক্ষে নই। কী হবে নতুন লাইব্রেরি বানিয়ে? কে পড়বে? কোথায় পাঠক? যেসব জাগ্রত হৃদয় আর্ত পিপাসা নিয়ে আজ লাইব্রেরির দরজায় এসে দাঁড়াবে—সেইসব জ্বলন্ত উদ্দীপ্ত মানুষ কোথায় আজ এদেশে?

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা বড় লাইব্রেরি গড়ে তোলার। সে লাইব্রেরি হবে এখানকার জ্ঞানপিপাসু ঋদ্ধ মানুষদের আলোকিত মিলনক্ষেত্র। না, কেবল লাইব্রেরি নয়; চিত্রশালা, চলচ্চিত্রশালা, সঙ্গীত লাইব্রেরি, অভিনয় মঞ্চ, মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া—আরো যা কিছু ভাবা যেতে পারে—সব। ঢাকার এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজে হাতে দেওয়া হয়েছিল কিছুটা। পাঁচ বছরের সমস্ত শ্রম আর যত্ন ব্যয় হয়েছিল এর পেছনে। গড়ে উঠেছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি, সঙ্গীতশালা, শ্রবণ-দর্শন বিভাগ, মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া—গাছপালা—দালান আর লনের একটা নিটোল পরিচ্ছন্ন পরিবেশ—জাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একটা ছোট্ট সুস্মিত পূর্বপুরুষ।

কিন্তু অল্পদিনেই বোঝা গেল মানুষ জন্মাবার আগেই যদি তার ঘর তৈরি হয়ে যায় তবে সেখানে সাপ ব্যাং আর সরীসৃপ বসবাস করে। সুসমৃদ্ধ বিশাল একটা লাইব্রেরি না হয় গড়ে উঠল, কিন্তু ওটা তো দেশের বর্তমান প্রয়োজন নয়। কে পড়তে আসবে সেখানে? কষ্টে পরিশ্রমে একটা সমৃদ্ধ আর্ট গ্যালারি না হয় গড়ে তোলা হল, কিন্তু চিত্রকলার প্রবুদ্ধ রসাস্বাদনকারী কোথায়? কজন আসবে শ্রবণ-দর্শন বিভাগে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কিংবা সঙ্গীত উপভোগের জন্যে? সেইসব প্রগাঢ় নাট্যগোষ্ঠী কিংবা নাট্য শিল্পবোদ্ধারা কোথায় যারা সমৃদ্ধ হৃদয় নিয়ে ভিড় করবে নাট্যমঞ্চের চারপাশে? আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ কিছুদিনের

Scanned by CamScanner

মধ্যেই দুরপনেয় বিপর্যয়ের মুখে অবসিত হল। অবসরলিপ্সুদের উদ্দেশ্যহীন ভিড়, দলাদলি আর রুচিহীন খেউড়ে একটা ক্লেদাক্ত পরিবেশের ভেতর নোংরো হয়ে উঠল এলাকাটা।

আজো আমি এদেশে নতুন লাইব্রেরি খোলার পক্ষপাতী নই। কার প্রয়োজনে লাগবে এই লাইব্রেরি? কে মূল্য দেবে? আজ আকস্মিক খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বিক্রমপুরের অজ-পাড়াগাঁর দশ হাত মাটির নিচ থেকে যদি পালযুগের কোনো বিখ্যাত ভাস্কর্য বের হয় তাতে চারপাশের নিরক্ষর গ্রামবাসীর কী এসে যায়? একটা বিরাট ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরি রয়েছে শহরের মাঝখানে—চারপাশে মূর্খের রাজত্ব—কী তার অর্থ?

আমার আশঙ্কা, আমাদের সমাজে হয় কোনোদিন জ্ঞান প্রবেশ করে নি, নয়তো প্রবেশ করে থাকলেও আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।

লাইব্রেরি তৈরির আগে ওই লাইব্রেরিতে কারা আসবে আজ প্রথমে তাদের জন্ম দেবার কথা ভাবতে হবে। ইশকুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আজ আর তাদের জন্ম দিচ্ছে না। কিছু পরিমাণে তাদের গড়ে তোলার পরই কেবল হাত দেওয়া যেতে পারে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কাজে, আগে নয়।

এই জন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা লাইব্রেরিকে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে এনেছি—প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে 'জাতীয়ভিত্তিক মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রম।'

ইংরেজ বেনিয়ারা একদিন যেভাবে এদেশের মানুষকে 'চা' ধরিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে আজ বই ধরাতে হবে আমাদের। বই ধরানোর প্রক্রিয়া হবে 'চা' ধরানোরই অনুরূপ—হুবহু এক। শুধু উদ্দেশ্য হবে আলাদা। হাজার হাজার বই পড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আজ সারাদেশের ছেলেমেয়েদের পড়ার আনন্দে মাতিয়ে তুলতে হবে। আর সেইসঙ্গে যুক্ত করতে হবে মানসিক বিকাশের উপযোগী সুন্দর সাংস্কৃতিক সব কর্মসূচি। ভালো ভালো পুরস্কারের প্রলোভনের সামনে ফেলে তাদের জয়ের পিপাসাকে লুব্ধ করে তুলতে হবে ; কিন্তু তা কেবল বই পড়ার মতো একটা উচ্চায়ত দরকারেই। এভাবেই নিজের অজান্তে তারা গৃহীত হয়ে যাবে বইয়ের অমেয় অনির্বচনীয় জগতে। বইয়ের ভেতর দিয়ে বিকাশের দিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা শ্রেয় ও মহানের জন্য আর্ত হয়ে উঠবে। তখনই আসতে পারে কেবল নতুন লাইব্রেরি তৈরির প্রসঙ্গ।

আজ দেশের লাইব্রেরিগুলোর দুরবস্থা অনেকেরই জানা। সেখানে বইয়ের পাঠক প্রায় শূন্যের কোঠায়। যে দু'চার জন এখনো আছে তাদেরও অধিকাংশই শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর উপন্যাসের পাঠক। এই বেদনাদায়ক ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষকে করতে হয় এক হৃদয়বিদারক পন্থায় : পাঠকক্ষের টেবিলে

Scanned by CamScanner

বিনোদনসর্বস্ব নোংরো পত্রপত্রিকা সাজিয়ে রেখে, আর সেগুলো ঘিরে জড়ো হওয়া রুচিহীন লোকজনদের লাইব্রেরি ব্যবহারকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে।

মনে রাখতে হবে লাইব্রেরি কেবল কতকগুলো সুন্দর সুশোভন বইয়ের সমষ্টি নয়। এমনকি বিপুলসংখ্যক বইয়ের সমষ্টিকেও লাইব্রেরি বলে না। লাইব্রেরির প্রধান সম্বল একজন উজ্জীবিত হৃদয়সম্পন্ন মানুষ—যিনি ডাক দেন।

আমরা সবাই জানি দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়—কখন কোন্ নামাজ পড়তে হয় তাও আমাদের জানা। তবু মসজিদের মিনার থেকে প্রতিটি নামাজের সময় আর্ত উচ্চকণ্ঠে একটি উদ্বুদ্ধ মানুষকে ডাক দিতে হয়। বলতে হয়—'এস নিদ্রার চেয়ে প্রার্থনা উত্তম।' লাইব্রেরি থেকেও তেমনি একজন মানুষকে আহ্বান জানাতে হয়। সবাইকে তার ডেকে বলতে হয়, এস, এখানে এস, এখানে তোমাদের বৃদ্ধি, বিকাশ, আলোকসম্মত মুক্তি। হ্যাঁ, এইখানেই—আর কোথাও নয়। ওই মানুষটি গ্রন্থাগারিক হতে পারেন—হতে পারেন অন্য কোনো প্রাণিত মানুষ। এই মানুষ একজনের জায়গায় অনেকজনও হতে পারেন। কিন্তু যে লাইব্রেরিতে ওই উদ্বুদ্ধ আহ্বানকারী নেই—মুয়াজ্জিন নেই—সেটা লাইব্রেরি নয়।

আমাদের সমাজে আজ এই বেদনাজাগ্রত মানুষটি কোথায়—সেই মানুষটি, যে ডাক দেবে?

৩.৬.৯০

১১১

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে কবিয়াল নিতাইচরণ সখেদ আক্ষেপ জানিয়ে কেবলই বলেছে, 'জীবন এত ছোট্ট কেনে?' (জীবন বলতে সে কি কেবল জীবনের সুখের মুহূর্তগুলোকে বুঝিয়েছিল?)

আসলেই কি জীবন ছোট? কেবলই মনে হয় আসলে যা ছোট তা জীবন নয়, আমাদের স্মৃতির ক্ষমতা। আমাদের চোখের মতো আমাদের মনও দূরের জিনিসকে ছোট দেখে। আবার দেখতে দেখতেই হারিয়ে ফেলে। আমরা যখন আমাদের বিশাল ধূসর অতীতটার দিকে ফিরে তাকাই তখন হাতে-গোনা দুয়েকটা আলো-জ্বলা মুহূর্ত ছাড়া কী-ই-বা আমাদের চোখে পড়ে? যেন ওই ক'টা স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তের সমাহারই আমাদের এই জীবন। যদি মানুষের স্মৃতিশক্তি এমন অসহায় না হত, যদি প্রতিটা ঘটনা ঘটিত-মুহূর্তের মতোই উজ্জ্বল আর বর্ণিলভাবে সারাজীবন চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত তবে বলতেই হত, এই ছোট জীবনটার চেয়ে দীর্ঘতর মহাকাব্য কেউ লেখে নি কোনোদিন।

২৮.৬.৯০

Scanned by CamScanner

১১২

গতানুগতিক মানুষ যৌনতা করে শরীরের সঙ্গে, সহৃদয় মানুষ শ্রেয়ের সঙ্গে।

১৯.৬.৯০

১১৩

যে কোনো দাম্পত্য সম্পর্কেই—দুজনের মধ্যে যে অধিকতর অমানুষ—শেষ পর্যন্ত সে-ই জয়ী।

১১.৭.৯০

১১৪

বার্ধক্যের বউকে নিয়ে দীর্ঘদিন কাটানো যেতে পারে, কিন্তু যৌবনের বউকে নিয়ে... ?

১৭.৭.৯০

১১৫

একজন প্রতিভাবান মানুষের কাছ থেকে আমরা কেন জীবনের প্রতিটা চত্বরে আলোকোজ্জ্বলতা প্রত্যাশা করি? কেন ভাবি জীবনের প্রতিটা প্রকোষ্ঠে তিনি হবেন আলোময়, দীপাবলীময়?

একজন প্রতিভাবান মানুষ তো পৃথিবীর আর দশটা গড়পড়তা সাধারণ মানুষের মতোই। জন্মবন্ধন, মৃত্যুবন্ধন থেকে আরম্ভ করে জীবনের প্রতিটি বাস্তব সুখ-দুঃখের দৈনন্দিন দুর্ভোগে একই রকম বিপর্যস্ত এবং নিরাশ্রয়।

তা হলে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে প্রতিভাবানদের পার্থক্য কোন্ বিন্দুতে?

একজন প্রতিভাবানের মধ্যে তাঁর গহন জৈবসত্তার উচ্চতম শিখরে থাকে চৈতন্যের উজ্জ্বল ধারালো তীক্ষ্ণ একটুকু রশ্মি। সাধারণ মানুষ থেকে ওইটুকুতেই তিনি আলাদা।

হিমশৈলের মতো ন' ভাগের আট ভাগকে পানির নিচে ডুবিয়ে রেখে মাত্র এক ভাগকে উপরে উঁচিয়ে রাখার মতোই একজন প্রতিভাবানের ওই তীব্র তীক্ষ্ণ শীর্ষবিন্দুটি। তাঁর অস্তিত্বের বাকি আর সবকিছু জীবজাগতিক ধারার মতোন আদিম আর অচেতন।

১৮.৭.৯০

১১৬

উনিশ শ ছেষট্টি থেকে উনিশ শ একাত্তরের মার্চের মাঝামাঝি সময়ে, দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবহাওয়ায়, এদেশের শহরে-বন্দরে-গ্রামে একদল

Scanned by CamScanner

তরুণ নেতার জন্ম ঘটতে শুরু করে। মিছিলে, বিক্ষোভে, জনসভায় তাদের হাজার হাজার জ্বালাময়ী ভাষণ কোটি কোটি হৃদয়কে আগ্নেয় দীপ্তিতে প্রজ্বলিত করেছিল।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চের সামরিক অভিঘাত সেদিনের সেই ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ওপর আচমকা ছিটিয়ে দেয় স্বস্ত্যয়নের জলধারা।

তাদের সব উদ্দীপনা স্তব্ধ হয়ে যায় চোখের পলকে, সারাটা জাতির জীবন থেকে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায় রাতারাতি ; তাদের ন্যূনতম অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সবখান থেকে, যেন তারা ছিল না কেউ কোনোদিন এই দেশে কোথাও।

দেশের এই বিপর্যয়ের মুহূর্তে যারা হতে পারত জাতির ন্যূনতম ধারক, অন্য একটি দেশের রাস্তায় তাদের সব আস্ফালন তখন বেদনাময় আত্মবিক্রয়ে অবসিত।

যুদ্ধের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ততদিনে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে প্রতিটি দেশপ্রেমিকের হৃদয়। জাতির এই দুঃসময়ে একটা অভাবিত ব্যাপার দেখতে পেল বিপন্ন দেশবাসী :

দেশের অসংখ্য সুদূর পল্লীর অজ্ঞাত বুকের ভেতর থেকে তারা জেগে উঠতে দেখল হাজার হাজার নিষ্পাপ নিরপরাধ এক ধরনের অপরিচিত যুবককে, দেশের বিদগ্ধ নাগরিকেরা তাদের কোনোদিন আগে দেখে নি।

গ্রামবাংলার মতোই তাদের হৃদয় নির্বোধ এবং লাঞ্ছনাব্যথিত।

সেই সঙ্কটাপন্ন সময়ে জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা দিল তারা সেদিন। তাদের মূল্যহীন জীবন ও রক্তে জাতিকে উপহার দিল বেদনার্জিত স্বাধীনতা।

যুদ্ধ শেষ না হতেই এই নির্বোধ যুবকেরা টের পেল এ বিজয় তাদের জন্যে নয়। দেখতে না দেখতেই আগের সেই বাকসর্বস্ব পলাতক নেতারা মুক্তিযোদ্ধার বেশে প্রবেশ করল জাতির রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে।

ওই নিষ্পাপ সরল যোদ্ধাদের দীর্ঘশ্বাসের ওপর দিয়ে তাদেরই সামনে জয় করে নিল এই নগরী আর জাতির সমস্ত সম্ভাবনা।

নিঃশব্দে ম্লানমুখে ওইসব নিরপরাধ যুবক মুছে গেল বাংলার বুকের ওপর থেকে—ঠিক যেভাবে তারা একদিন জেগে উঠেছিল, সেইভাবে—

ভুল দেশপ্রেমিকদের অলজ্জ স্বার্থলিপ্সার মুখে জাতীয় সংগ্রামের সমস্ত গৌরব আর অশ্রু লজ্জিত হয়ে এল। সেই লজ্জা বাড়তে বাড়তে হয়ে উঠল জাতীয় অসম্মানের প্রতীক। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত আত্মোৎসর্গ এইসব রাষ্ট্রীয় দস্যুদের পায়ের নিচে আজো অশ্রুপাতরত।

একজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বশেষ মহিমা ততদিনে অবসিতপ্রায়। যিনি সেই মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি একজন প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ মানুষ।

Scanned by CamScanner

উদ্দীপ্ত ভাষায় তিনি সেই মুক্তিযোদ্ধার একটা দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে বোঝাতে লাগলেন কত বড় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তিনি, যুদ্ধে কোন্ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের কোন্ দায়িত্বে ছিলেন, কীভাবে কোথায় কতটা সাহসের সঙ্গে লড়েছেন—এইসব।

মুক্তিযোদ্ধা সেই পরিচয়কারীর উচ্চকিত বক্তব্য নীরবে শুনে গেলেন, তারপর মৃদু হেসে ব্যথিত কণ্ঠে শুধু বললেন : থাক সে লজ্জার কথা।

বুঝলাম ইস্পাতের ধারালো আক্রমণের সামনে যিনি অপরাজিত ছিলেন, সেদিনের বাংলাদেশ তাঁকে পরাজিত করে ফেলেছে।

আহা, আমার জাতির নিয়তি আর কতবার ফিরে ফিরে লজ্জিত হবে এভাবে!

২০.৭.৯০

১১৭

যে জীবন নিয়ে এতকাল এত খেদ আর অনুযোগ করেছি, অনুযোগ করার মতো সেই জীবনটাকেও তো একদিন পাওয়া যাবে না।

১.৮.৯০

১১৮

আজ আমাদের দেশে মানুষের কত বিত্ত আর সম্পদ! অবৈধ ঐশ্বর্যের কী অপর্যাপ্ত ছড়াছড়ি! কিন্তু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তৈরির সময় এত কম পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া গেল কেন তাদের কাছ থেকে?

জ্যাকলন্ডনের লেখা একটা গল্পের মধ্যে এর একটা প্রচ্ছন্ন উত্তর পেয়েছিলাম একবার। গল্পটা এরকম :

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকায় স্বর্ণান্বেষণে গিয়ে একটা মানুষকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে জীবনের জন্যে নির্মম সংগ্রাম করতে হয়েছিল দিনের পর দিন। কঠোর অনাহার আর দীর্ঘ সংগ্রামে নিঃশেষিত হয়ে হয়ে নির্জীব মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে সে কোনোমতে উদ্ধার পায়। চলনশক্তিহীন অবস্থায় তারই মতো মৃত্যুপথযাত্রী একটা ঘেয়ো নেকড়ের সঙ্গে কয়েকদিন একটানা মরণপণ সংগ্রাম করতে করতে জঙ্গলের প্রান্তে সমুদ্রের ধারে পৌঁছোলে একটা জাহাজের লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে।

জাহাজের পর্যাপ্ত খাদ্য, পরিচর্যা আর সমুদ্রের নোনা সজীব হাওয়ায় লোকটা দিন কয়েকের মধ্যেই স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য আর আনন্দময় জীবনে ফিরে এল। কোনোকিছুরই অভাব রইল না তার। কিন্তু সবাই একটা অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করল তার স্বভাবে। খাবারের এত প্রাচুর্য থাকার পরেও লোকটা তার বিছানার নিচে সবসময় ছোট্ট এক টুকরো রুটি লুকিয়ে রাখত। কেন করত সে এমনটা?

Scanned by CamScanner

হয়তো তা এমনি একটা স্নায়বিক আতঙ্কের কারণেই যে সেই খাদ্য-পানীয়হীন নির্মম উপবাসের কঠিন দিনগুলো যদি আবার ফিরে আসে, যদি আবার মৃত্যুর কালো গহ্বরের ভেতর তাকে তেমনি ঠেলে দেয়?

আমাদের বিত্তবানেরা এখনো অন্যকে কিছু দেবার শক্তি আয়ত্ত করতে পারে নি। এদের প্রায় সবারই অবস্থা ওই করুণ লোকটার মতোই। কিছুদিন আগেও এরা ছিল গরিব। গ্রাম থেকে আসা এই কর্মঠ অদমিত লোকগুলো সস্তা মেসে আধ-পেটা খেয়ে এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভাগ্যান্বেষণ করেছে। ওই কষ্ট আর উপবাসের প্রেতাত্মা এখনো ভূতের মতো এদের মাথার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে কিছু দেবার ব্যাপার এলেই এরা আঁতকে ওঠে। হয়তো মনে ভাবে : দিতে গেলে যদি সব শেষ হয়ে যায়। যদি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হয়। এরা দিতে পারে—কিন্তু সে কেবল নিজেকে। নিজের আর নিজের পরিজনদের জন্যে অপর্যাপ্ত সম্পদ উড়িয়ে এরা ঠাঠা করে হাসতে পারে, অন্যকে দিতে পারে না। এদের এখনো ভালো করে পাওয়া হয় নি। ক্ষমাহীন উপবাসের স্মৃতি এখনো এদের চোখে-মুখে। আগে এরা ভালো করে খেয়ে নিক—ভালো সোফায়, ভালো বিছানায় শুয়ে বসে মনের আশ মেটাক, ভালো গাড়ি চালিয়ে সপরিবারে বিদেশ পর্যটন করে সব সাধ মিটিয়ে নিক। তারপর ওরা দেবে।

বাংলার জমিদারেরাও জমিদারি পাবার পর প্রায় এক শ বছর পর্যন্ত কাউকে কিছু দেয় নি। প্রথমে কেবল উপভোগ করেছে, তারপর দিতে শুরু করেছিল।

এক ভিখিরি কি অন্য ভিখিরিকে ভিক্ষা দিতে পারে?

২.৩.৯০

১১৯

একটা আশ্চর্য ব্যাপার প্রায়ই চোখে পড়ে আজকাল। আমাদের দেশে আজ যার যত টাকা সে তত হতাশাগ্রস্ত। যারা জাতির অসহায়তার ওপর সবচেয়ে বেশি দস্যুতা চালিয়ে ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়েছে তাদের গলায় আজ সবচেয়ে নৈরাশ্যের সুর। এমনটা কেন হচ্ছে? অনটনক্লিষ্ট একটা নিকট অতীতকে পার হয়ে এরা যেভাবে সম্পদের শীর্ষে এসেছে, তাতে তো তাদের গরিলার আত্মবিশ্বাস নিয়ে চারদিক কাঁপিয়ে তোলার কথা। গত পঞ্চাশ বছরে দেশে বিত্তের যে অভাবিত বিকাশ ঘটেছে—কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট গড়ে উঠে সারা দেশটাকে যেভাবে অচিন্তনীয় অগ্রগতির দিকে ঠেলে দিয়েছে তাতে হতাশার কী আছে? এই অবিশ্বাস্য অগ্রযাত্রা কি তারা দেখছে না? তীব্র আর্থিক সঙ্কটে পর্যুদস্ত দেশের কোটি কোটি মানুষের মনে তবু হতাশার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু এরা কেন ম্রিয়মাণ? আজ এই দেশের সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী, ঐশ্বর্যশালীদের কণ্ঠস্বরে সাধারণ মানুষের মতো কেন এই নিঃস্বতা?

Scanned by CamScanner

আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা তখন সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে কয়েকটা সরু পিচঢালা রাস্তা, চোখেই পড়ে না। বিকেলবেলা আমরা ওই মাঠে ফুটবল খেলতাম। মাঠের মাঝখানটায় প্রথম উঠল ওমর সন্স কোম্পানির তিনতলা দালান। এত উঁচু দালান দেখে শরীরে শিহরন জেগেছিল আমাদের : ঢাকা 'নগর' হয়ে যাচ্ছে। সেই ওমর সন্সের দালান আজ তেজগাঁও, মিরপুর, উত্তরা, সাভার ছাড়িয়ে সারা বাংলাদেশ হয়ে গেছে, তবুও আমাদের নৈরাশ্য ?

এই নৈরাশ্য আমাদের সমৃদ্ধির ফলশ্রুতি হতে পারে না। বিকাশ কি নৈরাশ্যের জন্ম দিতে পারে ? এই হতাশা আসলে অবৈধতার হতাশা ! এইসব নব্য কুবেরেরা সম্পদের যত বড় স্তূপই গড়ে তুলুক, আত্মার গভীরতম প্রাণধারার ভেতর তারা জানে তাদের এই বিত্ত অবৈধ। বস্তুগত সম্পদ ছাড়া একটা জাতির যে চৈতন্য বা অন্য কোনো উচ্চতর সম্পদ থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে এই অকর্ষিত মানুষগুলো অনবহিত। কাজেই সারাটা জাতি তাদের কাছে, তাদের বিত্তের মতোই, অবৈধ হয়ে আছে। আর সাধারণ মানুষের কাছে অবৈধ হয়ে আছে তারা নিজেরা।

অবৈধতার মধ্যে আশাবাদকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। সুতরাং হয় হজব্রত, নয়তো আটরশি, নয়তো আমেরিকায় টাকা পাচার কিংবা সেখানে এক বা একাধিক সুরম্য অট্টালিকা ক্রয়।

১০.৫.৯০

১২০

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ে কত মানুষের কাছ থেকে কত যে সাহায্য নেবার চেষ্টা চালাতে হয়েছে ! প্রথম পাঁচ বছরে চাঁদাই তুলেছিলাম প্রায় বিশ–পঁচিশ লাখ টাকা। সেই কষ্টের স্মৃতিগুলো মাংসের ভেতর এখনো বিঁধে আছে। দিনে তিরিশ–চল্লিশ মাইল কেবল রিকশাতেই ছুটে বেড়াতে হয়েছে দুয়ার থেকে দুয়ারে। শারীরিক কষ্টের ওপর শাকের আঁটির মতো মানসিক কষ্টের চাপ। সামান্য কটা টাকার জন্য তুচ্ছ কত মানুষের অবহেলা আর অসম্মান ! কিন্তু অভিমান নিয়ে থেমে পড়ার কোনো উপায় নেই। দিনরাত কেবল একটা চিন্তা আগুনের শিখার মতো মাথার মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলত—কোথা থেকে কীভাবে পাওয়া যাবে টাকা, কী করে গড়ে তোলা যাবে কেন্দ্র। সামান্যতম আশা আছে এমন একটা মানুষও ছিল না যার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছি। আমরা নানান সৌন্দর্য, দীপ্তি বা বৈভবের প্রত্যাশা নিয়ে একেকজন মানুষের দিকে তাকাই। কেন্দ্রের জন্য অর্থচিন্তা আমাকে এই সময় এমন উন্মাদ করে রেখেছিল যে মানুষের একটা মহিমাই তখন আমার চোখে ছিল একমাত্র বিবেচ্য : 'লোকটার দোহনযোগ্যতা কতটুকু !' দেশের উঠতি বড়লোকেরাই ছিল

Scanned by CamScanner

আমার পৃষ্ঠপোষক। অপরিশীলিত স্থূল এক ধরনের অদমিত মানুষ এঁরা। ভালো মানুষ এদের মধ্যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তাঁদের অনেকেই সরলভাবে বিশ্বাস করে অনেক জায়গায় মুখ পুড়িয়েছেন। ফলে এদেশের তথাকথিত সমাজসেবীদের ওপর এঁদের অবিশ্বাস মারাত্মক। একেকদিন একেকজনের সামান্য কথায় আচরণে নিজেকে এমন অসম্মানিত মনে হত যে প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতাম। বিবমিষায় কয়েকদিন মাথা ঘোলাত। অনেকে আবার এমন ভাব করতেন যেন কেন্দ্রকে নয়, আমাকেই দিচ্ছেন টাকাটা। কেউ অফিসে টাকা নিতে আসতে বলে দিনের পর দিন ঘোরাতে থাকতেন।

আমরা যারা সৎ শিক্ষকের জীবন যাপন করেছি, হাজার হাজার ছাত্রের সামনে শ্রদ্ধার বেদিতে আজীবন অধিষ্ঠিত থেকেছি, তাদের পক্ষে, এ ধরনের অসম্মান সহ্য করা শক্ত। মনে রাখতে হবে আমরা পেশাগতভাবে সেই সম্প্রদায়ের মানুষ যারা সবার কাছ থেকে আজীবন কেবল 'স্যার' কথাটা শুনতেই অভ্যস্ত, অন্যকে 'স্যার' বলতে নয়। সবাইকে আমরা সবসময় ওয়ালাইকুমাসসালামই বলি, আসসালামুয়ালাইকুম নয়।

ভালো হোক মন্দ হোক, এই আমাদের জীবন। আমরা আমাদের সামনে দেশের সবচেয়ে কীর্তিমান মানুষদের প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধায় অবনত হতে দেখি। এভাবে আমাদের ত্বক ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে একটা ভুল আত্মমর্যাদাবোধ নিঃশব্দে বাসা বেঁধে বসে। সাধারণ মানুষের মতো দুঃখ অপমান সহ্য করার শক্তিতে আমরা অযোগ্য হয়ে পড়ি। আমার ধারণা টেলিভিশনের লোকপ্রিয়তা আমার এই স্পর্শকাতরতাকে আরো পাকাপোক্ত করে দিয়েছিল।

তবু বিবেক, নিষ্কৃতিহীন বিবেক আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। আমার জাতির ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠায় সব কষ্ট শ্রম অপমান আমি সহ্য করেছি। আমার বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব অনেকবার আমাকে বলেছে, কাদের টাকা দিয়ে এই কেন্দ্র তৈরি করছ তোমরা? ভেবে দেখেছ এরা কারা? সংঘবদ্ধ একদল রাষ্ট্রীয় দস্যু! নির্বিবেক, দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ একদল—দুঃখী মানুষের রক্তে যাদের হাত কলঙ্কিত। তোমাদের স্বপ্নের তাজমহল কী করে এদের টাকায় তৈরি হবে? কথাগুলো শুনে প্রথম প্রথম নিজেরও আমার খানিকটা খটকা লাগত। যুক্তি আছে কথাগুলোয়। এমন একটা কাজে কতগুলো দুর্বৃত্তের অবৈধ অর্থের সহযোগ কি ঠিক হচ্ছে? পরে অনেক চিন্তাপারম্পর্য উতরিয়ে একসময় ওই দ্বিধাগ্রস্ত সঙ্কট থেকে মুক্তি পেয়েছি।

আমি সবিনয়ে ওইসব সমালোচকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি : আমার পৃষ্ঠপোষক ওই অকর্ষিত লোকগুলো দুর্বৃত্ত, খুনি, ডাকাত বা চোর সবকিছুই হতে পারে—কিন্তু যে টাকা এই কেন্দ্রে তারা দিচ্ছে সে টাকা তো 'চোর' নয়। ওই টাকা দিয়ে যে বই কেনা হচ্ছে সে বই তো 'চোর' নয়। ওই বই পড়ে আমাদের হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীর মধ্যে প্রতিনিয়ত যে অপরিমেয় চেতনার বিকাশ ঘটছে সে চেতনা তো 'চোর' নয়। ওই অনির্বচনীয় মানসিক বিকাশ থেকে জাতির যে ঋদ্ধি ঘটবে সেই ঋদ্ধি তো চোর হতে

Scanned by CamScanner

পারে না। তা ছাড়া এই লোকগুলো অন্য কোথাও টাকা না দিয়ে যে এই শুভত্বমুখী কাজটাতে দিয়েছে সে জন্য প্রাপ্য সম্মানটুকু তাঁদের দিতে হবে নাকি? অন্তত জীবনের ওইটুকু জায়গায় তাঁরা এদেশের যে কোনো ভালো মানুষের সমান পরিমাণেই তো ভালো।

যত ছোট আকারেই হোক বাংলাদেশে যে বুর্জোয়া বিকাশ শুরু হয়েছিল কোনোকালে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তার অন্যতম প্রথম প্রমাণ।

৭.৬.৯০

১২১

আমার বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই বলে, 'কী বানালে তোমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রটাকে এভাবে বাংলামোটরের এই ছোট্ট গলির ভেতর? এমন একটা জিনিস এরকম জায়গায় মানায় নাকি? দূরে কোথাও বানাও না—সাভার কিংবা আরো দূরে—প্রকৃতির নির্জন পরিবেশের ভেতর—জ্ঞানচর্চার উপযোগী শান্ত নিভৃত কোনো জায়গায়—অনেক বড়সড় কোনো এলাকা নিয়ে—দেখবে, স্বপ্নের মতো একটা জিনিস হবে।'

আমি জবাবে বলি, 'সাভারে যাওয়া তো দূরের কথা, রাজধানীর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে না হয়ে এতদূরে এই বাংলামোটরে যে বানাতে হয়েছে প্রতিষ্ঠানকে এ জন্যেই আমি দুঃখিত।' অনেকদিন পর্যন্ত আমি সত্যি সত্যি চেষ্টা করেছি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার কোথাও এটার অফিস নিতে—জাতির কর্মমুখর বাস্তবতা এবং হিংস্র উদ্যমের মূল প্রাণকেন্দ্রে। সচিবালয়ের ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই হয়তো ওই জায়গাটার কথা ভাবি নি। এই কেন্দ্র থেকে পাঠ নিয়ে একদিন যাদের এই জাতিকে পরিচালনা করতে হবে, আমি বিশ্বাস করি, তাদের উত্থিত হতে হবে এই জাতির সর্বময় রাষ্ট্র প্রক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তিমূল থেকে। না, হাসির কথা নয়, আমার ওইসব বন্ধুবান্ধবকে অনেকবার সকাতরে আমি বলেছি, 'সচিবালয়ের ভেতর এককোণে কোথাও আমাকে সামান্য এক টুকরো জায়গা দিতে পার তোমরা?' জীবন-সংগ্রামের দাঁতাল আক্রমণ থেকে দূরে, প্রকৃতির শান্ত নির্জন পরিবেশের ভেতর, জীবনবিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা আমার পছন্দসই নয়। শান্তিনিকেতনের মতো তপোবন আদর্শে গড়ে তোলা শিক্ষা প্রণালী একালের নিষ্ঠুর রক্ত-সংঘাতের যুগে অনেকখানি অচল বলেই আমার ধারণা।

[আজকের পাশ্চাত্যের কথা আলাদা। ওখানকার দেশগুলো আজ এককেটা বড় আকারের শহর ছাড়া কী? আপাতদৃষ্টে সেখানে যাকে প্রকৃতির কোলের স্নিগ্ধ শান্ত কুঞ্জবন বলে মনে হচ্ছে সেখানেও আধুনিক সভ্যতার সর্বশেষ ব্যসনগুলো ক্রূর ছোবল উঁচিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে।]

Scanned by CamScanner

কিছুদিন আগে আমি শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সহজ অনাড়ম্বর জীবনে নিবেদিত অধ্যাপকবৃন্দ, সুস্থিত মূল্যবোধ, সাধনা, নিষ্ঠা—সব মিলে রাবীন্দ্রিক পৃথিবীর একটা শেষ রশ্মি যেন এখনো বেঁচে আছে সেখানে। তবু প্রশ্ন আসে, বাঙালি জীবনের সংগ্রাম আর অগ্রযাত্রার ইতিহাসে শান্তিনিকেতনের অবদান সত্যি কতটুকু? এই জায়গাটায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত একক ভূমিকা কি ওই বিশাল প্রতিষ্ঠানটির সমস্ত আয়োজন আর প্রচেষ্টার চেয়েও অনেক বড় নয়?

ধারণা করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার শ্রমস্রস্ত দিনগুলোয় রবীন্দ্রনাথ হয়তো এমনি এক স্বপ্নের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে প্রকৃতিলালিত এই নির্জনতার কোলে, উপনিষদীয় জীবনচর্যার এই নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির ভেতর তাঁরই মতো প্রবুদ্ধ মানুষদের জন্ম একদিন সংঘটিত হবে এই শান্তিনিকেতনের অঙ্গনে। সময় তা ভুল প্রমাণ করেছে। আমার মনে হতে চায় তাঁর এই চিন্তার চাইতে তাঁর কাল অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তিনি নিজেও কি দ্বন্দ্ব-বিস্রস্ত নাগরিক হিংস্রতারই সন্তান ছিলেন না? মৌন সমাহিত উপনিষদীয় পৃথিবী তো তাঁর জীবনের বিকাশপর্বের পরিবেশ ছিল না। তাঁর বাস্তবতা ছিল বরং এর উল্টো। ইউরোপের সমাজব্যবস্থার তীব্র উচ্ছ্রিত গতিধারা যেখানে ফিরে ফিরে তাঁর জীবনাগ্রহকে প্রাণনা দিয়েছে সেখানে কী করে ভাবা যেতে পারে শান্তিনিকেতনের শান্ত নির্বিরোধ জীবন-পরিবেশ তাঁর মতো শক্তিমান, সংগ্রামদীপ্র, পরাক্রান্ত মানুষদের উত্থান ঘটাবে?

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগ থেকেই এর ছাত্রছাত্রীরা জাতির চলমান বাস্তবতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে কমবেশি ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের সঙ্গে দুঃখজনক বিচ্ছিন্নতাই শেষ পর্যন্ত হয়েছে এদের অধিকাংশের বিধিলিপি। সামাজিক সংঘাত এবং দ্বান্দ্বিক রক্তযাত্রার ভেতর থেকে যারা জন্মাচ্ছে না, পরিপার্শ্বকে আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে নেবার যুদ্ধে নিজেদের শস্ত্রভাণ্ডারকে তাদের অপর্যাপ্ত মনে হবারই কথা। তা ছাড়া সমাজকে তাদের অনুকূলে মুখ ফেরাতে বাধ্য করার হিংস্র শক্তিমত্তাতেও এরা দুর্বল থেকে যায়। এদের ব্যাপারেও ঘটেছে প্রায় তা-ই। একটা উচ্চায়ত জীবনের লালিত স্বপ্নকে আজীবন বুকের ভেতর বয়ে বেড়িয়ে, পৃথিবী-জোড়া নিঃসঙ্গতার ভেতর, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেদের আদর্শকে সর্বোচ্চ ভেবে, শক্তিপ্রভাবহীনভাবে এরা নীরবে এক সময় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

শান্তিনিকেতনের একজন মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন কৌতূহলী প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা হয়েছিল একদিন। এ ব্যাপারে তিনি আরো বিশদ শুনতে আগ্রহী হলে কাছাকাছি তুলনা হিসেবে বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজগুলোর প্রসঙ্গ তুলে ধরে তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। সবাই জানেন, আমাদের দেশে ক্যাডেট কলেজ নামে সামরিক প্রবণতাসম্পন্ন এক ধরনের চৌকস

Scanned by CamScanner

বেসামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হচ্ছে এবং বিরাট অর্থব্যয়ে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশের সামরিক মহিমার প্রতিভূ এই বিদ্যালয়গুলোকে সম্প্রতি জনচক্ষে তুলে ধরা হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের এক ধরনের উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

ভবিষ্যৎ সামরিকবাহিনীর জন্য ভালো অফিসার গড়ে তোলাই এগুলোর প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য। স্কুলগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকাল সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী। ধরে নেওয়া হয়েছে, শৈশবের এই অনুভূতিময় দিনগুলোয় যদি ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে গড়ে তোলা যায় তবে তাদের চরিত্রে এমন কিছু গুণাবলির সহযোগ ঘটবে যা ভবিষ্যতের সামরিক জীবনে তাদেরকে সুযোগ্য অফিসার হতে সাহায্য করবে। যারা সামরিকবাহিনীতে যেতে পারবে না কিংবা যেতে অনিচ্ছুক হবে তারাও এই শিক্ষাব্যবস্থার উপকার পেয়ে উন্নত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। আমি নিজেও এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছু অভিনন্দনযোগ্য দিক দেখতে পাই। এখানে ছাত্রছাত্রীদেরকে যে শৃঙ্খলা, সুশিক্ষা এবং সুস্মিত মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে গড়ে তোলা হয়, তা প্রশংসনীয়। কিন্তু এখানেও সেই আগের সমস্যা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন সুদূর জায়গায়—দেশের রক্তাক্ত, নগ্ন বাস্তবতা থেকে দূরে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জাতির শক্তি ও নিঃস্বতা, ভূয়িষ্ঠতা ও পচন, বৈচিত্র্য ও অগ্রযাত্রা সবকিছু সম্বন্ধেই অনবহিত থেকে যাচ্ছে। চারপাশের প্রকৃতির নিরীহ নির্বিরোধ জগতের মধ্যে তারা বড় হয়। এখানে সুস্মিত মূল্যবোধ আছে, কিন্তু তা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে। এখানে নিয়মানুবর্তিতা আছে, কিন্তু তাকে এক ধরনের পাশবিকতা বলাই ভালো। শিক্ষার্থীদের তরুণ মনের বৈচিত্র্য, কৌতূহল, প্রতিভা, স্বাতন্ত্র্য—সবকিছুকে দলে পিষে সবাইকে একটা ভেদাভেদহীন একাকার মানুষ করে ফেলাতেই এই শিক্ষার আসল আগ্রহ। হৃদয়ের ওপর এই অমানবিক অত্যাচার কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্য এগুলোকে এক একটা উদ্ধারহীন নির্যাতনশালা করে রেখেছে।

প্রায় প্রতি বছরই শোনা যায় পঞ্চাশ–ষাট–সত্তর–আশি জনের একেক দল ছাত্র একসঙ্গে জোট বেঁধে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে কলেজ থেকে। তারপর পঞ্চাশ–এক শ মাইল হেঁটে বা বাস–লঞ্চ–নৌকায় চেপে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফিরে গেছে যে যার বাড়িতে। এই বেদনাদায়ক ইতিবৃত্তের এখানেই শেষ নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ নিষ্কৃতিহীন। ওই ছাত্রদের পেছনে কলেজ যে বিস্তর অর্থব্যয় ইতিমধ্যে করে ফেলেছে অভিভাবকেরা তা ফেরত দিতে না পারলে ওখান থেকেও মুক্তি নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই হতভাগ্য ছাত্রদের বাড়ি ঘেরাও করে আইনের আশ্রয়ে আবার তাদের ওই নির্মম বন্দীশালায় ধরে নিয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

এসব ঘটনা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে প্রভুর বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাসদের ধরা পড়ার পর গলায় বেল্ট লাগিয়ে আবার প্রভুর বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার রোমহর্ষক স্মৃতিকেই কেবল মনে পড়িয়ে দেয়। কী ধরনের নির্মম আর অত্যাচারী শিক্ষা পদ্ধতি এই ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী তা সহজেই অনুমেয়। শিশুমনের ওপর এই পাশবতা কি কোনো উন্নত বা আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে? অথচ আমাদের দেশের সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতি আজ নৈরাজ্য আর অবক্ষয়ের মধ্যে এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে অভিভাবকেরা উপায়হীন হয়ে এই অমানবিক শিক্ষার কাছে সন্তানদের পাঠানোকে আজকাল বিরাট সৌভাগ্য বলে মনে করছেন।

আমি সেই অধ্যাপক মহোদয়কে বিনীতভাবে বললাম, আজকের দিনে ভালো শিক্ষার জন্য দুটো উপাদানের সহযোগ খুবই জরুরি। এক, দেশের কঠিন বাস্তবতার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিকশিত করে তোলা ; দুই, উদার পরিবেশের মধ্য দিয়ে তাদের বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া। শান্তিনিকেতন বা আমাদের ক্যাডেট কলেজগুলোর বিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম শর্তটিকে প্রায় পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছে। তা ছাড়া আমার ধারণা এই দুটো শিক্ষা পদ্ধতির অবয়ব জুড়েই একটা নির্মম অত্যাচার নীরবে সক্রিয় রয়েছে। ক্যাডেট কলেজগুলোর যে অত্যাচার তা প্রত্যক্ষ : সেটা বর্বরতার অত্যাচার। শান্তিনিকেতনে তা অনেক মার্জিত এবং সূক্ষ্ম : মাধুর্যের অত্যাচার।

আমার কথা শুনে অধ্যাপক মহোদয় অবাক হবার ভঙ্গিতে, কথাটার তাৎপর্য হঠাৎ করে এইমাত্র যেন বুঝতে পেরেছেন, এভাবে, হেসে বললেন, "সত্যি, ব্যাপারটা কখনো এভাবে ভেবে দেখি নি তো!"

তাঁর বিনয়ের বিগলিত প্রাচুর্য দেখেই বুঝতে পারলাম আমার বক্তৃতাটা তাঁর কাছে পুরোপুরি মাঠে মারা গেছে।

৮.৯.৯০

১২২

সেই সবুজ বিশাল গাছপালার জগতে তোমাকে লাগছিল একটা বড় শেফালি ফুলের মতো—বড় বড় সাদা পাপড়ির নিচে তার ম্লান-কমলা রঙের ছোট্ট একটা বৃন্ত।

কী বিস্ময়কর এভাবে তোমাকে দেখার সেই অভিজ্ঞতা। একটা বড় ফুটে-থাকা শেফালি হয়ে আমার দেখার জগৎটাকে ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলে।

পরে বুঝেছিলাম, সেদিন নিজেই তুমি ছিলে সেই শেফালি। তোমার ফরসা শরীর জড়ানো ছিল সাদা ফুটফুটে শাড়িতে, প্রান্তে তার ম্লান কমলার পাড়।

তখন নিজে তুমি বড় একটা শেফালি ছাড়া আর কী?

১০.৯.৯০

Scanned by CamScanner

১২৩

বাংলাদেশের যে কোনো মহাসড়ক ধরে যদি তুমি এগিয়ে যাও দেখবে যেখানেই কোনো নদী পেরিয়ে দীর্ঘ সেতু চলে গেছে—সেখানেই, ওই সেতুর ঠিক শুরুর জায়গাটায় একটা ছোট্ট ফলকের ওপর লেখা আছে ওই নদীটার নাম। দিনকয়েক আগে উত্তরবঙ্গ ঘুরতে গিয়ে একখানে একটা নদীর আশ্চর্য নাম চোখে পড়ল : 'চিকলি'। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে একটা উজ্জ্বল ক্ষিপ্র সাপের চকিতে পালিয়ে যাবার ছবি মনে আসে। কী সুন্দর নাম এ দেশের নদীগুলোর! ধলেশ্বরী, তিতাস, কপোতাক্ষ, আত্রাই, রূপসা, মধুমতি—এমন হাজার হাজার ঝাঁক ঝাঁক অপরূপ নাম।

যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষেরা এসব নদীর ধারে বাসা বেঁধে আছে—আর নারীর মতো ছলনাময়ী এই নদীগুলোকে নিজেদের ঘরের যৌবনবতী কুটিল বধূদের মতো ভালোবেসেছে। নইলে চারপাশের জগতের মধুরতম শব্দমালা দিয়ে এভাবে নদীর নামকরণ কী করে করল তারা?

১৫.৯.৯০

১২৪

সবাই যার যার জীবনের সত্য মানুষটাকে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু ফিরে ফিরে কেবলই ভুল মানুষটার মুখোমুখি হয়।

১৬.৯.৯০

১২৫

সেদিন এক বাসায় একজন ভদ্রলোকের সাথে দেখা। ভদ্রলোক বিদেশ থেকে ছুটি কাটাতে দেশে এসেছেন। যতক্ষণ তিনি কথা বললেন ততক্ষণ এদেশের ভালো-খারাপ সবকিছুকে এমন অশালীন ভাষায় একতরফা গাল পেড়ে যেতে লাগলেন যে আমরা আমাদের এই হতভাগ্য দেশটাকে নিয়ে কোথায় লুকোব ভেবে পেলাম না।

মনে হচ্ছিল গাল দিয়ে ছুটিটা কাটাতেই যেন তিনি এদেশে এসেছেন। এমন ক্ষিপ্তভাবে গাল দিচ্ছিলেন যে ভয় হচ্ছিল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন কি না।

ব্যাপারটার জন্যে ভদ্রলোককে খুব একটা দোষই-বা দেব কী করে? যে দেশে তিনি আছেন সেখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম আমাদের তুলনায় এত বেশিরকম উন্নত আর উঁচুমানের যে তাতে একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে এদেশের এই ভাপসা গরম আর নোংরা মনমানসিকতার মধ্যে পড়ে যে কারো মেজাজ আর হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যাবার

Scanned by CamScanner

কথা। তবু মনে হল এভাবে গাল দেবার জন্যে দেশে আসার তাঁর এতই কি দরকার ছিল? অন্য অনেক দেশেও তো তিনি একই খরচে অনায়াসেই চলে গিয়ে সময়টা উপভোগ করতে পারতেন। দেশের দরিদ্র মানুষের টাকায় উচ্চশিক্ষা পেয়ে তিনি আজ একটা উন্নত দেশে বড় চাকরি জুটিয়েছেন, সেটা কি তাঁর মাতৃভূমির অপরাধ? যে দেশের জ্যাম জেলি মাখন পনিরের চমৎকার স্বাদের অপরাধে আজ তাঁর প্রিয় দেশ (এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!) রাতারাতি এত অখাদ্য হয়ে গেল—সে দেশটাও তো চিরকাল এমন দুধ আর মধুপ্রবাহিত ছিল না। তিনি প্লেন থেকে সোজা নেমে সেদেশের ঘন পুরু সরটুকু প্রায় বিনা নোটিশেই পেয়ে গিয়েছিলেন? একবার ভেবে দেখেন নি, সেদেশের প্রতি টুকরো পনিরের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই জাতির বেদনাবান মানুষদের কত সংগ্রম, ত্যাগ, অশ্রু, মৃত্যু, জীবনপাত—যে বেদনার তিনি কেউ নন।

'আপনার জাতির দুঃখের প্রত্যুত্তরে—ভালোবাসা দূরে থাক—এইসব নিন্দা ছাড়া আর কী দিতে পেরেছেন আপনি, হে বীর সংগ্রামী পুঙ্গব!'

১৭.৯.৯০

১২৬

গত বছর একটা আলোচনামালার সূত্র ধরে বারোটা রাজনৈতিক দল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এসে পরপর তাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে গেল।

আমি প্রতিটা দলের নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছি। আমাদের জাতীয় জীবনে কেন্দ্রের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তাঁদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছি : কেবল রাজনীতি দিয়ে আপনারা আজ দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। আজ সারা জাতির মতো রাজনৈতিক মুক্তিরও একটাই পথ : মানুষের গুণগত সমৃদ্ধি।

বলেছি : রাজনীতি তো মানুষই করে! যে মানুষেরা রাজনৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখবে তাদের উন্নতমান যদি নিশ্চিত করতে না পারেন তবে রাজনীতির উন্নতমানকে নিশ্চিত করবেন কীভাবে? বলেছি : ক্ষুদ্র মানুষ আর বড় জাতি কি একসঙ্গে থাকতে পারে?

বলেছি : আসুন, আপনারা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের হাতকে শক্ত করুন। আমরা জাতির হাত শক্ত করে দেব। সম্পন্ন মানুষেরাই কেবল একটা সম্পন্ন জাতির নিশ্চয়তা।

২০.৯.৯০

Scanned by CamScanner

স্কুলে আমাদের অঙ্কের স্যারের নাম ছিল বনমালীবাবু। খুবই আন্তরিক আর উদ্বুদ্ধ ভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। আমাদের পড়াশোনায় উৎসাহ দেবার জন্যে প্রায়ই বিশুদ্ধ বিদ্যাসাগরী ভাষায় বলতেন : 'স্ফূর্তি কর, স্ফূর্তি কর।'

বনমালী স্যার এই সময় কিছুটা বার্ধক্য-আক্রান্ত হয়েছিলেন। স্যারের উপরের পাটির সামনের দিকের একটা দাঁত ছিল না। স্ফূর্তির 'ফ' সেই ফোকর দিয়ে অনায়াসে লাপাত্তা হয়ে যেত। আমরা শুধু শুনতে পেতাম 'শূর্তি কর, শূর্তি কর।'

আজ স্যারকে শুধু ফিরে ফিরে আমার যুগের বেদনাব্যথিত প্রতীক বলে মনে হতে চায়। আমাদের কালের সব 'স্ফূর্তি' যেন কারো ঝরে-যাওয়া দাঁতের বিমূঢ় ফোকর গলে কেবলই 'শূর্তি' হয়ে যাচ্ছে।

২২.৯.৯০

১২৮

আমরা যারা পৃথিবীর ট্যারা চোখ আর খোঁড়া ঠ্যাংগুলোকে ভালোভাবে দেখতে পাই না, সেইসব নির্বোধদেরই লোকে বোধহয় 'আশাবাদী' বলে।

২৩.৯.৯০

১২৯

আজ দেশের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানই এন.জি.ও* ; রাষ্ট্র বৃহত্তম এন.জি.ও.।

২৭.৯.৯০

১৩০

আমরা এই দেশের এমন একটা যুগে বেঁচে আছি যখন গভীরতম হতাশা এবং অন্তহীন আশাবাদ একই সঙ্গে আমাদেরকে উজ্জীবিত ও স্নায়ুহীন করে রেখেছে।

হতাশার দিকটা নিয়েই আমি প্রথমে কিছু বলব।

আজ আমাদের সমাজের যোল থেকে আরম্ভ করে ছিয়াত্তর বছরের প্রতিটা মানুষের কথাবার্তায় বেদনার একই বেহালা : "হবে না, হবে না। যতই চেষ্টা করুন কিছুই হবে না।" মূল্যবোধের অবক্ষয়, সার্বিক বিশৃঙ্খলতা এবং অরাজকতা সবচেয়ে শক্তিশালী হৃদয়কেও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

এবার দেখা যাক, এই অবক্ষয়ের চেহারাটা ঠিক কী রকম। খুব বেশি দিনের কথা নয়, আমাদের ছেলেবেলাতেই একজন শিক্ষককে মাইলখানেক দূর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলেও আমরা প্রায় অভ্রান্তভাবেই বলে দিতে পারতাম : একজন শিক্ষক যাচ্ছেন।

---

*বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠান

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

ওই শিক্ষকের হেঁটে যাবার বিশিষ্ট ভঙ্গি, পোশাকের স্বাতন্ত্র্য, হাতের মুঠোয় বই ধরার বিনীত বিশিষ্টতা—সবকিছু মিলে তাঁর আপাদমস্তক অবয়বে এমন একটা শিক্ষকোচিত চরিত্র ফুটিয়ে তুলত যার ফলে তাঁকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হত না। এখন ব্যাপারটা হুবহু সেরকম নেই।

এমন বেশকিছু শিক্ষককে আমি ব্যক্তিগতভাবেই চিনি যাঁদের দেখে বোঝাই মুশকিল আসলে তাঁদের পেশা ঠিক কী। তারা কি ডাক্তার, কন্ট্রাক্টর, দারোগা, না আমলা, নাকি অন্যকিছু—কিছুই ঠিকমতো বোঝা যায় না।

সবকিছু একাকার হয়ে আজ আদ্যোপান্ত 'এক পাতলুনের ভেতর' চলে গেছে।

কেউ আর তার নিজস্ব মর্যাদার অবস্থানে দাঁড়িয়ে নেই।

দেশ বা জাতির উত্থানকে কেউ আর তার নিজের কল্যাণ বা উত্থান বলে ভাবছে না। প্রায় কেউ ভাবছেই না, জাতি এবং রাষ্ট্রের দৃঢ়প্রথিত ভিত্তিই শুধুমাত্র হতে পারে সকলের মর্যাদাবান অস্তিত্বের একমাত্র নিশ্চয়তা।

এখন পাড়ায় আগুন লাগলে যে যার ব্যক্তিগত কপাট শক্ত করে এঁটে দিয়ে একা একা বাঁচতে চাচ্ছে।

বুঝতেই পারছে না চারধার থেকে মৃত্যু-সাম্রাজ্য পরিবেষ্টিত হয়ে সে একা বাঁচতে পারবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চারপাশের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম চালানো আজ তার প্রয়োজন ; সকলের অস্তিত্বের স্বার্থে এবং সেইসঙ্গে নিজেরও।

এখন চিকিৎসক রোগীর হিতকে দেখছে না, শিক্ষক ছাত্রের হিতকে না, আমলা লোকহিতকে না, রাজনীতিবিদ জাতির হিতকে না।

সব হিতের ওপর দিয়ে সারাদেশে সমস্ত জায়গায় শুধুমাত্র একটি হিতের মাথাই আজ দাঁতালের মতো অস্তিত্ব উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে : আত্মহিত। 'আমার হবে তো', 'আমি পাব তো', আমি খাব তো'—এই কদর্য অশ্লীল চিৎকারের নিচে আজ সারাদেশের সমস্ত কণ্ঠস্বর নিষ্পিষ্ট।

সমষ্টির হিতকে পায়ে মাড়িয়ে সারাদেশ আজ আত্মস্বার্থের ক্লেদাক্ত অধঃপতনের মধ্যে ক্রন্দনরত ও অসহায়।

কোনোরকম ন্যায়নীতি নেই, সামাজিক কল্যাণ নেই, ন্যূনতম বিবেক বা চক্ষুলজ্জার প্রশ্রয় নেই, আদর্শ বা মূল্যবোধ নেই—আছে কেবল 'ব্যক্তি' আর তার বর্বর অলজ্জ স্বার্থ—অদ্ভুত আঁধারের নিচে সারাদেশ আজ বিমূঢ় ও উদ্ধাররহিত।

কেন ঘটল এই অবক্ষয়? চার বা পাঁচ দশক আগে, এমনকি আমাদের ছেলেবেলার অবস্থা তো এমন বেদনাবহ ছিল না ; বরং সুস্থিত বুদ্ধি এবং শুভ চেতনাকে জাতীয় অস্তিত্বের অনেক জায়গাতেই অম্লান আলো ছড়াতে দেখা গেছে।

অথচ এই সময়ের মধ্যে জাতির বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটেছে অবিশ্বাস্য হারে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই উন্নতির পরিমাণ এমন বিপুল যে এর আগের যে কোনো কাল-পরিসরের সঙ্গে তা তুলনীয়ই নয়। সহজেই প্রশ্ন আসে এমন

Scanned by CamScanner

বিপুল সমৃদ্ধির পাশাপাশি এই বেদনাদায়ক অবক্ষয় ঘটতে পারল কী করে। এ ব্যাপারে আমার উত্তর সাদামাটা। আমার ধারণা, আমাদের আজকের এই অবক্ষয় আমাদের আজকের বিপুল বিকাশেরই ফলশ্রুতি। কথাটা পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে বলে প্রথমেই এর ব্যাখ্যা দিয়ে নিতে চাই।

আমাদের ছেলেবেলায় এদেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেখেছি তার আয়তন ছিল নিতান্তই ছোট। দেশের ভেতর সে সময় যে অল্পবিস্তর বৈষয়িক উন্নতির সুযোগ–সুবিধার সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিত তা ছিল কমবেশি এদেরই দখলে। দেশের আপামর জনসাধারণের তাতে কোনো অধিকার ছিল না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করে যেন সবকিছু বদলে গেল। সাতচল্লিশ সালে আংশিকভাবে এবং একাত্তরের পর সারাদেশে সমস্ত জনসাধারণের সামনে কোটি কোটি সুযোগের অবিশ্বাস্য দরজা হঠাৎ করেই খুলে গেল। ব্যবসা–বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এ সুযোগের বিশাল প্রসার দেশের প্রায় প্রতিটি আঙিনাকে স্পর্শ করেছে।

আমাদের ছেলেবেলায় স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল সীমিত। লেখাপড়ার সুযোগের ভেতর আসা ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। গত চল্লিশ বছরে প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা–সুযোগের যে কী বিশাল প্রসার ঘটেছে তা সবারই জানা। হাজার হাজার নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার সুযোগের মধ্যে নিয়ে এসেছে। এরই পাশাপাশি অসংখ্য নতুন কল–কারখানা ব্যবসা চাকরি কর্মসংস্থান তৈরি হয়ে জাতীয় জীবনে সূচিত করেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের উৎপাদন উদ্যোগ যেমন বেড়েছে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি স্নায়ুতন্ত্রীর মতো অজস্ররেখায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দেশের সবচেয়ে সুদূর এবং পশ্চাৎপদ গ্রামটির স্তব্ধ অনড় জীবনযাত্রার নিশ্চল অচলায়তনের ভেতরেও আজ এই উন্নয়নের হাওয়া। আমি নিশ্চিত গত চল্লিশ বছরে আমাদের দেশের যে বিপুল ঐহিক উন্নতি ঘটেছে তা তার আগের এক হাজার বছরের বৈষয়িক সমৃদ্ধিকেও অতিক্রম করেছে। এই ধরনের প্রস্তুতিহীন, আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ও সর্বগ্রাসী বিকাশের মুখে যে কোনো সুশীল মূল্যবোধের পতন ঘটে যাবার কথা এবং সত্যি সত্যি ঘটেছেও তাই। আমাদের ছেলেবেলার ছোট্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই শান্ত নিরুদ্বেগ মূল্যবোধগুলোকে এখন, এই বিশাল 'উত্থানের' মুখে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এখন নীতিবোধ পদদলিত, সুবচন নির্বাসনে, শুভ্র সুন্দর কল্যাণ আনন্দ পলাতক এবং ব্যক্তি আর ব্যক্তিস্বার্থের বর্বর আগ্রাসনের নিচে সারাটা জাতি লুণ্ঠিত এবং বিস্রস্ত।

শুধুমাত্র এ থেকেই আমি কিন্তু এমন বিশ্বাসে উপনীত হতে চাই না যে এই পতন সামগ্রিক বা উদ্ধারহীন। বরং অবস্থাটাকে তুলনা করা যেতে পারে নদীর

Scanned by CamScanner

প্রথম বর্ষার হিংস্র উচ্ছ্বিত জলস্রোতের সঙ্গে। সকলেরই জানা আছে প্রতিটি বর্ষায় নদীতে যখন প্রথম বর্ষার পানির ঢল দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তা কী পরিমাণ কদর্যতাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটাই নদীর চিরকালীন রূপ নয়। কেননা এর পরই নদীর পানি ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসতে শুরু করে, শুরু হয় তার সম্পন্ন ও গভীর হয়ে ওঠার পর্ব। আর এমনি এক সহজ পরিণতির ভেতর থেকেই আমরা ভাদ্রের পরিপূর্ণ নিটোল নদীটাকে প্রাকৃতিক নিয়মেই একসময় পেয়ে যাই।

কাজেই যাকে আমরা অনেক সময় পশ্চাৎযাত্রা বা পতন বলে ধরে নিই, অনেক সময়েই তা ঠিক পতন নয় ; বরং হেরে যাওয়ার ছদ্মাবরণের আড়ালে তা হয়তো এক ধরনের অগ্রযাত্রারই অন্য নাম। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরা যাক, একটা গাড়ি পাহাড় বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে। আমরা এই ওঠার পর্বটাকে কী নামে চিহ্নিত করব? আমরা বলতে পারব : গাড়িটা উঠছে, অর্থাৎ উত্থান হচ্ছে। কিন্তু গাড়িটা যখন পাহাড় বেয়ে নামতে শুরু করবে তখন ওই নামার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা কি বলতে পারব, গাড়িটা যেহেতু নামছে, সুতরাং তার পতন হচ্ছে? না, তা বলতে পারব না। কেননা গাড়িটা নিচের দিকে নামলেও তার চাকা তো পেছন দিকে ঘুরছে না? সে তো সামনেই যাচ্ছে। প্রশ্ন আসবে, তা হলে সে নামছে কেন? উত্তর : নামছে, সামনের পাহাড়ে উঠবে বলে। সুতরাং এই অবতরণ আসলে একটা আরোহণেরই অন্য নাম। আমার ধারণা আমাদের মূল্যবোধের আজকের এই পতন আসলে আমাদের জাতির উত্থানেরই একটা ছদ্মবেশী প্রস্তুতি। আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই মূল্যবোধের পতন ঘটেছে জাতীয় জীবনে বিত্তের অভাবিত প্রবেশের ফলশ্রুতিতেই, যা থিতিয়ে এলে তার ভেতর থেকে উচ্চতর মূল্যবোধসম্পন্ন একটা জাতির জন্ম আমরা প্রত্যাশা করতে পারব?

আমি বুঝি না একটা জাতির জীবনে পুঁজির প্রথম পদপাত অপরাধের ইতিহাস ছাড়া অন্য কীভাবে ঘটতে পারে!

আজ যখন এই জাতির দূর অতীতের দিকে চোখ ফেরাই তখন এর কোন্ চেহারা আমাদের চোখে ভাসে? অনাহারক্লিষ্ট নির্জীব নিরন্ন একটা অন্যায় রকমে বিশাল জনগোষ্ঠী—পৃথিবীর জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত যারা প্রায় কিছুই পায় নি। রুটি, মাখন, জ্যাম, জেলি, পনির—না, কোনো কিছুই খাওয়া হয়ে ওঠে নি এদের। একটা ভালো জামা গায়ে দেয় নি এরা; ভালো সোফায় বসে নি; ভালো বিছানায় শোয় নি। এমনি সময়ে এই উপবাসক্লিষ্ট মুমূর্ষু মানুষের সামনে, প্রায় অলৌকিক ঘটনার মতো বৈষয়িক সুযোগের কোটি কোটি দরজা একসঙ্গে হঠাৎ করে খুলে গেছে। কেবল দেশের নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ আজ তার সামনে অবারিত। হংকং, দুবাই, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, নিউইয়র্ক, প্যারিস—সারা পৃথিবীর

Scanned by CamScanner

সমস্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডারের কোনোকিছুই আজ তার আয়ত্তের বাইরে নয়। ঐশ্বর্যের এই অবারিত হাতছানির সামনে দাঁড়িয়ে এখন, এই মুহূর্তে, সে কী করবে? আদর্শ আর মূল্যবোধের ধুয়ো তুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? চোখের সামনে ঈপ্সিত ঐশ্বর্যের অবাধ লুণ্ঠনকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে উপভোগ করবে? আমার ধারণা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-আশ্রয়হীন নিঃস্ব মানুষের যা করার কথা সে তাই করেছে। এই বিশাল সুযোগযজ্ঞের ওপর উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খুন করে হোক, মেরে হোক, কেড়ে হোক, আজ তাকে সব পেতে হবে। যুগ-যুগান্তের অনেক অসমাপ্ত সাধ, অচরিতার্থ বাসনাকে পূর্ণ করে নিতে হবে এই সুযোগে। মহান কথার ছেঁদো বুলিতে কান দিয়ে ঐশ্বর্যের এই অপ্রত্যাশিত সুযোগকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারে না। এ সুযোগ তার আর আসবে না। সে জেনে গেছে : এটা তার 'মূল্যবোধে'র যুগ নয়, এটা তার 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'র যুগ। আজ আদর্শের ছেঁদো দোহাই তুলে, বিত্তকে বর্বরতা আখ্যা দিয়ে, সম্পদ জড়ো করার উন্মাদনা থেকে তাকে নিরস্ত করতে গেলে তার প্রতি নিষ্ঠুরতা করাই হবে। এখন সে জড়ো করুক, পাহাড় গড়ুক, লিপ্সায় ভোগে মাতাল হোক, সাধ মেটাক, তৃপ্ত হোক, তারপরে প্রকৃতির নিয়মে একদিন সে আপনিই 'মূল্যবোধ' উপহার দেবে। First we have to feed ourselves and then philosophise.

আমাদের আজকের এই মূল্যবোধের অবক্ষয়কে যত নৈরাশ্যজনক বলেই মনে হোক, আসলে আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ একটা প্রগতিশীল ঘটনা— বাইরের নিঃস্ব পরিচয়ের অন্তরালে একটা বিপুল জাতীয় উত্থান।

[টেলিভিশনে প্রদত্ত বক্তৃতার ঈষৎ পরিমার্জিত অনুলিপি]

১৩১

আমার জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল এবং বিয়ের আগের দিন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এ থেকে আমার অনেক শুভানুধ্যায়ীর মনেই এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতোন এমন একটা সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ যদি সত্যি সত্যি পৃথিবীতে ঘটতেই হয় তবে অনুগ্রহ করে তা যেন আমার মৃত্যুর অন্তত ঘণ্টাখানেক পরে ঘটে। সমস্ত দিক থেকেই তা সন্তোষজনক। প্রথমত, এতে আমার নিয়তিনির্ধারিত আয়ুর ব্যাপারটা একটা মোটামুটি পূর্ণতা পাবার সুযোগ পাবে। কেননা এই আমি মানুষটা—যে কিনা মৃত্যুর আজন্ম আতঙ্কে অপরিসীমভাবে ভীত ও ব্যথিত ছিল বলে জীবনের দুই গণ্ড থেকে সমস্ত রক্তিমতা হাঙরের হিংস্রতায় ছিঁড়ে নিতে চাইত, সেই মানুষটা একদিন টানটান শক্ত হয়ে চাদরের নিচে নিঃসাড় শুয়ে থাকবে অথচ পৃথিবীর সব রঙিন টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এমনি মুখর উৎসাহে চলতে থাকবে,

Scanned by CamScanner

লোকেরা বেলেল্লাহল্লায় মেতে থাকবে, গান গাইবে, ফূর্তি করবে—আমার মানবজন্মের প্রতি এর চেয়ে মর্মান্তিক উপহাস আর কী হতে পারে। কিন্তু ধরা যাক, দৃশ্যটা যদি এ রকম না হয়ে এমন হয় : আমার মৃত্যু সংবাদে পৃথিবীর রাস্তায় রাস্তায় তাবৎ পথচারী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে গেছে, যানবাহন বিমূঢ় স্তব্ধ, দেশে দেশে রাষ্ট্রপ্রধানেরা আমার শেষকৃত্যে যোগদানের জন্য তড়িঘড়ি উদ্যত—এককথায়, সারা পৃথিবীর জনজীবনে শোকের কালো ছায়া—তবে আমার মৃত্যুর তার চেয়ে জ্যোতির্ময় ছবি আর কি হওয়া সম্ভব? ধরা যাক এর চেয়েও আরো কাম্য আরো আকাঙ্ক্ষিত সেই অসম্ভব ঘটনাটিই যদি ঘটে—আমার মৃত্যু-মুহূর্তেই বিশ্বসৃষ্টির সেই অন্তিম ধ্বংস-সঙ্গীত তুলকালাম শব্দে বেজে ওঠে—এক কথায় পৃথিবীর সব হাসি-গান, অফিস-যাওয়া, সরগরম সন্ধ্যা আর টেলিভিশনের মুখর রাত—এক তুড়িতে উধাও হয়ে যায়, তবে আমার চেয়ে সুখী আর কে?

তবু জানি, সব দুরাশার মতোই আমার এই ভাবনাগুলোও নিরেট মূর্খতা। আমার মৃত্যুর ব্যথায় মহান বা সামান্য কোনো আপতিক বিপর্যয়ই ঘটবে না কোনোখানে, পৃথিবীতে একটা হল্লার শব্দও কম হবে না কোথাও।

না, যুবরাজ হ্যামলেট আমি নই, আর তা হবার জন্যে জন্মিও নি পৃথিবীতে। আমি তো 'চলনসই পদ্য লিখি'—আমার ডাকে কোন্ নিঃশব্দ শূন্য সাড়া দেবে?

মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রা যাঁদের কাছে সম্পন্ন আত্মজীবনী প্রত্যাশা করে আমি সেই পঙ্ক্তির নই। তবে কেন এই অকারণ ঔদ্ধত্য? আত্মজীবনীর বেনামীতে এই নির্বোধ আত্মপ্রতারণা!

না, আমার রক্তের ধারায় প্রতিভার জ্বলন্ত অগ্নিকণারা অসাধারণ স্ফূরণে জ্বলে ওঠে নি কখনো—অসম্ভবের উদগ্র কামনা জন্মান্ধ আক্রমণে আমার হৃদয়কে হিংস্র করে তোলে নি। গৃহপালিত রক্তে আমি একটা নিরীহ আর গতানুগতিক মানুষের হৃদয়কেই লালন করেছি আজীবন।

তবু বলি, আমি নই, কিন্তু যে যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম অন্তত একটা কারণে তা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটা বিরতিহীন বিশাল পতনকে আমার যুগে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

গিন্সবার্গের মতো বন্য বিষণ্ন চিৎকারে আমি শুধু বলতে পারি :

'আমার যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষদের উন্মাদ হয়ে শেষ হতে দেখেছি আমি।' আমার যুগের প্রায় প্রতিটি মানুষকে আমি ধুলোর দামে বিক্রি হয়ে যেতে দেখেছি। দেখেছি কী করে একটা বিশাল জাতি পুরুষত্বহীন হয়—প্রতিটা মানুষ তার বিশ্বাসকে কত অল্পদামে বেচে দিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মতো আমার যুগের কোনো কৃতার্থ কবি কি জীবনের পরিপূর্ণতা থেকে জেগে উঠে বলতে পারবে : 'আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি।'

এ যুগের তরুণ কবি কী করে তাঁর মতো করে লিখতে পারবে :

Scanned by CamScanner

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'?

আমাদের সময়কার তরুণ কবির কালসম্মত অনিবার্য উচ্চারণ হয়তো তাই :

'দীর্ঘ আয়ু ভালোবাসিনে
মরিতে চাই দ্রুত।'

আমাদের অকালপ্রয়াত কবিবন্ধু হুমায়ুন কবিরের একটা ছোট্ট কবিতার নায়কের মতোই ছিল এ যুগের দুঃখময় রক্তাক্ত অবয়ব :

"ফিরে আসি ফের। ভীরু,
পদাঘাতে পিষ্ট, তবু কুকুর যেমন করে
ফিরে আসে তার প্রভু ঘাতকের কাছে,
তেমনি আবার দ্যাখো ফিরে আসি তোমার দুয়ারে,
তোমার আলোর দিকে ফিরে আসি—ক্লান্ত ক্রীতদাস,
তোমার নিষ্ঠুর ঘরে, হে আমার পরম ঘাতক!

অসহায়তা—উদ্ধারহীন বিশাল এক সর্বগ্রাসী অসহায়তার কাছে ফিরে ফিরে আসার আত্মধ্বংসী দুর্ভাগ্যই আমাদের বিধিলিপি। তবু আলোকোজ্জ্বলতার একটা পৃথিবীকেও এর পাশাপাশি আমি দেখেছি আমার কালে। সম্ভাবনা এবং ব্যর্থতা, উদ্যম এবং আশাভঙ্গ, উৎসাহ এবং পতন পালাক্রমে বা পাশাপাশি স্থান গ্রহণ করেছে আমার সমকালে।

নির্লজ্জ স্বার্থপরতা এবং স্থূল রজতলিপ্সার অধঃপতিত রাস্তায় আমার যুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষদেরও অসহায়ের মতো গুঁড়িয়ে যেতে দেখেছি আমি।

আর্থিক সঙ্কটের নির্দয়তম অভিঘাতের পাশাপাশি জাগতিক উন্নতির অবাধ লিপ্সা আমার কালের সবচেয়ে মূল্যবোধসম্মত মানুষদেরও নিঃস্ব করে দিয়েছে, দেখেছি কী করে তাদের সৃজনশীল সম্ভাবনা ভিখিরি হয়ে যায়।

দেখেছি জাতীয় জাগরণের প্রাথমিক বিপুল সূচনা, সর্বগ্রাসী জলোচ্ছ্বাসের মতোই বর্বর উল্লাসে, মূল্যবোধের দীর্ঘকালবাহিত সুস্থিত সীমিত অঙ্গনকে দলে ধর্ষে শ্রেয়বোধের সব শ্রদ্ধেয় সৌধকে কীভাবে অসম্মানিত করেছে আমার যুগে।

'আমি বিজয় দেখেছি' এবং দেখেছি বিজয় কী নিদারুণভাবে পরাজিত হতে পারে।

স্বাধীনতার অর্থ কীভাবে হয়ে দাঁড়ায় অকর্ষিত দস্যুতার বিবেকহীন অবাধ উপনিবেশ। চিরায়ত মূল্যবোধ এবং বৈদগ্ধের গর্বোদ্ধত মাথা কীভাবে ধুলা আর রক্তের অসম্মানিত লাঞ্ছনায় নিপতিত হতে পারে।

তবু অবক্ষয়ের কালো অন্ধকারের ভেতর তিমিরহননের অম্লান স্ফূরণ আশান্বিত মুখ দেখিয়ে গেছে প্রতিটি সম্ভাব্য বিরতিতে। জাতীয় জীবনের ভিত থেকে মুক্তির অপরাজিত পিপাসা ক্ষুধিত জাগুয়ারের মতো জেগে উঠে এই

Scanned by CamScanner

সময়ের মধ্যে ছিনিয়ে এনেছে দু'দুটি স্বাধীনতার অনিন্দ্য নিষ্ঠুর রক্তগোলাপ।

একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে এই দেশের জন্মমুহূর্ত প্রত্যক্ষ করেছি আমি। আশঙ্কাস্পন্দিত বুকে সুনীল আকাশে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রথম দর্পিত উত্তোলন স্বচক্ষে দেখার দুর্লভ ভাগ্যের আমি অধিকারী ছিলাম। অশ্রু এবং উল্লাসের অকথ্য অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন হতে হতে বাংলার প্রতিটি গৃহে কারনিশে সেই পতাকার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠা আমি দেখেছি।

তিন তিনটি রাষ্ট্রকাঠামোর সার্বভৌমত্বের নিচে এই দেশ ও জাতি এই সময়ে অস্থির বিপুল এক পরিবর্তমানতার ভেতর প্রকৃত আত্মস্বরূপের অন্বেষণে ক্লান্তহীন ছিল।

অসংখ্য উজ্জ্বল সংগ্রাম এবং দুঃখময় আত্মদান—এই কালপরিধির আকাশকে দীর্ঘশ্বাসে মথিত করেছে।

বৈরী অন্ধকার এবং দাঁতাল বর্বরতার মুখে ফিরে ফিরে দুর্জয় হয়েছে সেই অমেয় ও জন্মান্ধ চেতনা যা কালে ও ভূগোলে পরাভবহীন।

এক কথায় উত্থান এবং উন্মোচন, বিজয় এবং বিপর্যয়, উন্মুখতা এবং ক্লান্তি এই ক্রান্তিযুগের রক্তাক্ত মুখাবয়বকে এক বিরোধব্যথিত দ্বৈতচরিত্রে দ্বিখণ্ডিত ও অনন্য করে তুলেছে। সুতরাং আমি নই, কিন্তু যে সময় পরিসরে আমি এই পৃথিবীতে বেঁচে ছিলাম, (কিংবা আরো সঠিকভাবে বলা যায় : একটি অবধারিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে গিয়েছিলাম) নানা কারণে তা ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের এযাবৎকালের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়। এটা সেই সময় যখন আবহমানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই নিষ্ক্রিয় জনগোষ্ঠী একটা সর্বাত্মক জাতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আত্মদানের ভেতর দিয়ে একটা মহান পবিত্রতায় স্নাত হয়েছে ; যখন ভেদাভেদহীন দুঃখ সারা জাতিকে একটা অভিন্ন ছাদের নিচে এক ও অভেদ্য করে তুলেছিল এবং মুখরিত যুদ্ধযাত্রার উচ্চকিত পদশব্দের ভেতর দিয়ে এই জাতি প্রথমবারের মতো জেগে উঠেছিল সামরিক পরিচয়ে।

এটা সেই সময় যখন আবহমানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, এক বিশাল রক্তসাগরের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে, নতুন চরের মতো, একটা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে অভ্যুদয় ঘটেছিল আমাদের। আমাদের এই সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী বিশ্বজনীনতার উজ্জ্বল আকাশে স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আবার বলি, আমি নই, কিন্তু যে দেশ ও কালে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম তা নানা কারণে আগামীকালের মানুষদের চোখে ফিরে ফিরে বিস্ময় জাগাবে। সেই মহান ও মর্মন্তুদ, অভাবনীয় ও আত্মবিরোধী, বিস্ময়কর ও বিভ্রান্তিপূর্ণ কালপরিধিই আমার এই অস্তিত্ব ভুবনের মূল পরিচয়।

১০.১০.৯০

১৩২

দিনকয় আগে কেন্দ্রে এল আমাদেরই একজন পরিচিত তরুণ কবি। ঘটনাচক্রে সে আমার ছাত্র। কবি বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা-ই; শরীরের প্রতিটা রক্তকণিকা তার স্বপ্ন আর প্রেরণায় জ্বলন্ত। হাত নেড়ে নেড়ে সে বলল : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে ছড়িয়ে দিন সারাদেশে। হাজার হাজার প্রতিভা সৃষ্টি করুন—তাজা রগরগে সব প্রতিভা। দেশের প্রতিটা অঙ্গন বড় শূন্য—আজ আমাদের অসংখ্য প্রতিভার দরকার।

আমি বললাম, প্রতিভা সৃষ্টি করার আশ্বাস কী করে দিই। আমাদের এই কার্যক্রম তো কোনো সর্বজনীন জাতীয় অগ্নিকাণ্ড নয়। কোনো অসম্ভব বিপ্লবও তো ঘটাতে বসি নি আমরা।

প্রতিভা সৃষ্টি করব এত বড় কথার স্পর্ধা নেই। শুধু বলতে পারি : যদি কোনো 'প্রতিভা' আমাদের এই প্রক্রিয়ার স্পর্শ পায়, কোনোভাবে এর ভেতর এসে পড়ে তবে সে উপকৃত হবে। যে আলো-ঐশ্বর্যের স্ফুলিঙ্গ সে এখান থেকে তার রক্তে শোষণ করে নেবে তা তার ভেতর কমবেশি স্বর্গীয় প্রজ্বলন ঘটাবেই।

১৯৮৯

১৩৩

জনগণের আত্মাহুতি আর নেতৃত্বের ব্যর্থতা—এই ছিল আমার কালের বাংলাদেশ।

২২.১০.৯০

১৩৪

অপুত্রক রাজা আকস্মিকভাবে মারা গেছেন, নতুন রাজার নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

শেষমেশ সবাই মিলে পরামর্শ করে একটা সুসজ্জিত হাতি নামিয়ে দিল রাস্তায়। হাতি যাকে প্রথম শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নেবে, সেই হবে রাজা। আমাদের দেশে রাজা হবার এইটেই ইতিহাস। এভাবেই ঘটে আসছে চিরকাল। হয়ত আরো অনেকদিন ঘটবে। যোগ্যতা নয়, গুণ নয়, শিক্ষা মেধা প্রতিভা সব নিরর্থক—নির্বোধ অকাটমূর্খ একটা রাজকীয় হাতি অজ্ঞাত কারণে রাস্তার ধার থেকে তাকে পিঠে তুলে নিয়েছে—এইটেই এদেশে রাজা হবার একমাত্র যোগ্যতা। আজকের বাংলাদেশের কথা—এদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কথা—রাষ্ট্রপতি এরশাদের কথা মনে এলে ওই বুদ্ধিহীন মূর্খ জানোয়ারটার ওপরও খুন চেপে যায়। হোক মূর্খ, মূক, অবোধ—তাই বলে এমন আত্মঘাতী নির্বুদ্ধিতা—দেশের এগার কোটি মানুষের

Scanned by CamScanner

ভেতর থেকে এমন একটা আপাদমস্তক মর্কটকে নির্বাচন—এমন দুরারোগ্যরকম লোভী ধূর্ত আর কুটিল একটা মানুষকে—সারা দেশের সমস্ত সম্পদের ওপর দাঁত বসিয়েও যার স্বার্থলোলুপ লোভ-চকচকে চতুর লোলুপতার শেষ হয় না। এরশাদ এই জাতির সমস্ত শক্তিকে ডাইনির মতো শুষে নিয়েছেন। মানুষের প্রতিরোধের শেষতম ইচ্ছাটুকুকেও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন।

তিনি আমাদের সর্বপ্রথম দুর্নীতিপরায়ণ সরকারপ্রধান এবং এ ব্যাপারে হয়তো সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম হিসেবে থেকে যাবেন।

দেশটাকে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর চেয়েও অনেক কষ্টের কথা : এদেশের জনগোষ্ঠীকে তিনি নৈতিকভাবে ধ্বংস করে ফেলেছেন। তার মোসাহেবরা বলে চলেছেন : রাষ্ট্রপতি এরশাদ সারাদেশে রাস্তা করেছেন, পুল বানিয়েছেন, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দালান-ইমারত-কারখানা সবকিছুই করেছেন। তবে আমার মনে হয় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ তিনি যা করেছেন তা হচ্ছে, আজ না হলেও দশ বিশ পঞ্চাশ এমনকি এক শ পাঁচ শ বা পাঁচ হাজার বছর পরেও আমরা যে কোনোদিন কিছু করতে পারব আমাদের এই আশা করার শক্তিটুকুও ধ্বংস করে দিয়েছেন তিনি।

২৫.১০.৯০

১৩৫

হয়তো সবই মিথ্যা আর ভুল ছিল। তবু যত তুচ্ছই হোক এইটাই তো আমার জীবন।

১৩৬

আমাদের পত্রপত্রিকার জগৎ থেকে শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান—সব বিদায় নিয়েছে। এখন আছে কেবল দুটো জিনিস : পর্নোগ্রাফি আর পলিটিক্স।

১৩৭

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য দেশের মানুষকে বুঝিয়ে উঠতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হলাম। দৈনন্দিনের জিনিসপত্তর বা বাসন-কোসনের মতো কোনো জিনিসকে হাতে ধরে দেখিয়ে না দিতে পারলে সাধারণ মানুষ তাকে বুঝতে পারে না। আমাদের কর্মসূচিগুলোর ভেতর দিয়ে সারাদেশে কিশোর-তরুণদের ভেতর আজ ধীর নিঃশব্দ পায়ে যে অমেয় চেতনার বিকাশ ঘটে চলেছে, আজ থেকে পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ বা পঞ্চাশ বছর পর তাদের নানান কর্মযজ্ঞের ভেতর দিয়ে সেই চেতনার প্রকাশ ঘটে সম্পন্নতর একটা বাংলাদেশের সৃষ্টি হবে, কী করে এ কথা একজন মানুষকে বোঝানো সম্ভব?

Scanned by CamScanner

বিশেষভাবে বিমূর্ত কিছুকে বুঝে ওঠা অনেকের পক্ষেই কঠিন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একেবারে যাত্রালগ্নে যখন সবাইকে আমাদের স্বপ্নের কথা বলতাম তখন তারা আমাদের মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করেই, 'সব বুঝে ফেলেছি' এভাবে, চিন্তাশীলের মতো এমনভাবে মাথা নাড়তে শুরু করে দিত যে, স্পষ্ট বোঝা যেত আমাদের সব চেষ্টা একেবারেই মাঠে মারা গেছে। এরপর যখন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অল্পবিস্তর বিত্তসম্পদ হল তখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলা সম্ভব হতে লাগল এটা হচ্ছে কেন্দ্রের দালান, এটা লাইব্রেরি, এটা অফিস, এটা মিলনায়তন। দেখতাম কেন্দ্রকে বোঝানো আমাদের পক্ষে আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের স্বপ্ন আবার অবারিতভাবে বেড়ে যেতে শুরু করলে আবার হল আগেরই অবস্থা।

ছেলেবেলায় আব্বা কলকাতা থেকে একটা প্লাস্টিকের হাঁস এনে দিয়েছিলেন আমাকে। হাঁসটার পিঠের ওপর একটা উঁচু সাদা বোতাম ছিল। সেটার ওপর চাপ দিলেই ভেতর থেকে একটা সাদা ডিম বেরিয়ে আসত। চিত্তের জাগৃতি তো এমনি একটা চালাকি বা চটজলদির ব্যাপার হতে পারে না। এমনকি আসল হাঁসের ডিমই কি এমন হুট করে পাওয়া সম্ভব? জীবজাগতিক বিকাশের একটা দীর্ঘ দুর্লভ প্রতীক্ষা আর পারম্পর্যের ভেতর দিয়েই কেবল একসময় একটা পরিপূর্ণ নিটোলতা নিয়ে তা আমাদের হাতে এসে ধরা দিতে পারে। এটা তো টিউবওয়েলের মতো ব্যাপার নয় যে একদিক থেকে চাপ দিলাম আর সাথে সাথে অন্যদিক দিয়ে পানি ছলকে উঠতে শুরু করে দিল।

২৭.১০.৯০

১৩৮

আমার কেন যেন মনে হতে চায় আমরা বাঙালিরা এখনো 'আমরা' শব্দটার মানে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি নি। আমরা 'আমি' শব্দটাকে ঠিকমতোই বুঝি, কিন্তু 'আমরা', 'সবাই', 'সকলে', 'রাষ্ট্র' এসব শব্দের একটা মানেই আমাদের কাছে বোধগম্য : আমার পকেটে যা আছে আমাদের কাছে তা-ই হচ্ছে রাষ্ট্র, যা আমার পকেটে ঢোকানো গেছে তা-ই জাতি।

২৭.১০.৯০

১৩৯

আমাদের জাতীয় নায়কদের ব্যর্থতা আজ আমাদেরকে সব ব্যাপারে নিন্দুক করে তুলেছে। আমাদের পরনিন্দাগুলো আসলে এক ধরনের কান্না।

২৭.১০.৯০

Scanned by CamScanner

১৪০

ফিরে ফিরে মনে হতে চায় সময়ের একটু বেশি আগেই হয়তো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তৈরির কাজে হাত দিয়ে ফেলেছিলাম। না হলে এত কষ্ট কেন? কেন এই সুতীব্র আর্থিক সঙ্কট? অস্তিত্বের জন্য এই জান্তব সংগ্রাম? সারাদেশে পৃষ্ঠপোষকের কেন এত অভাব? কেন এমন আহত পশুর মতো আর্তনাদভারাক্রান্ত জীবন?

টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসেবে একসময় আমাকে সবচেয়ে বড় পুরস্কারটাই দেওয়া হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে হয়তো ভুল করেই এই পুরস্কার ওরা আমাকে দিয়েছিল। নয়তো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতোন এমন জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারকে কেন এদেশের বিশ জনের বেশি মানুষকে আজ পর্যন্ত বোঝাতে পারি নি? সময়ের বেশিরকম আগে আমরা এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় হাত দিয়েছিলাম। এইসব অমানুষিক কষ্ট তারই ক্ষতিপূরণ।

তবু এর ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। খারাপ দিকটা হল এইসব অকথ্য নির্দয় অস্তিত্বছেঁড়া কষ্ট। ভালোর দিক হল, প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনোমতে টিকে থাকতে পারলে অন্তত কিছু যোগ্য মানুষ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে এই জাতির আগামী দিনগুলোকে রক্ষার জন্যে। সব ছেড়েছুঁড়ে হাত গুটিয়ে পালানোর বিপদ এখানে যে, যেদিন এই সমাজে বড় কিছু নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকরা এসে যাবে, সেদিন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের স্রষ্টাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যাপারটা হবে আমাদের দেশের আজকের শিল্পায়ন সমস্যার মতো। সারা পৃথিবী থেকে জাহাজভর্তি সহযোগিতা এসে ভিড় করে বসে আছে দেশের বন্দরগুলোতে, কিন্তু প্রকৃত উদ্যোক্তার অভাবে শিল্পায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

১৯৯১

১৪১

যে যুগে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মানে ছিল পাড়ার গ্যারেজের মাথার ওপর হলুদ কাপড়ের ওপর লাল রং দিয়ে লেখা 'সবুজ সংঘ' 'তরুণ সংঘ' জাতের সংগঠন—সেই যুগে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো এত বড় একটা আয়োজন সীমানা লঙ্ঘন নয় কি?

১৯৯১

১৪২

তারুণ্য তো এক সম্রাটের নাম। একটা বিশাল সুপরিসর জীবন পড়ে আছে সামনে, সে তার একচ্ছত্র অধিপতি। হাজার হাতে বিলিয়েও সে বিত্তের শেষ নেই। তাই সে এত তাচ্ছিল্যে সবকিছু উড়িয়ে দিতে পারে—এমনকি জীবনকেও। জীবনের প্রৌঢ় পর্বে এসে আমাদের সবকিছুই ফুরিয়ে আসে, নিঃস্ব রিক্ত হয়ে

Scanned by CamScanner

পড়ি আমরা। আমাদের চাওয়াগুলো ছোট হয়ে আসে, আমরা স্বার্থপর আর কৃপণ হয়ে যাই—কুশ্রী ভিখিরির মতো কৃপণ। যে জীবনকে একদিন এত অগাধ আর অপরিমেয় জেনে বিস্ময়ে আনত হয়েছিলাম, তাকেও দরিদ্র আর নিপতিত মনে হতে শুরু হয়। যেন একরাশ মিথ্যা আর অপচ্ছায়ার পেছনে সব শেষ হয়ে গেছে।

দেবী বউদিকে মনে পড়ে, ফুটফুটে চাঁদের মতো বউদি। ঘরে কার্তিকের মতো স্বামী, তবু ফিরে ফিরে কেবলই বলতেন : জান, সামনে বড় কিছু একটা ঘটবে আমার, দেখো। দেবী বউদি জানালা দিয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর চোখের সুন্দর চাউনি অভাবিত কিছুকে পাওয়ার তৃপ্তিতে কোমল হয়ে আসত।

দেবী বউদি, আজ তিরিশ বছর পরে এখন তুমি কোথায়? আর তোমার সেই বড় কিছুর স্বপ্নেরা?

১৯৯১

১৪৩

এরশাদের পতনকে কেন্দ্র করে প্রায় দু'দুটো সপ্তাহ ধরে সারাটা জাতি এমন বিপুল উত্তাল বিরতিহীন উৎসবে মেতে রয়েছে কেন? দুর্বল মানুষের এত আনন্দ দেখলে আমার ভয় হয়।

১৯৯১

১৪৪

আজ দেশের ভবিষ্যৎহীন অবস্থা প্রায় প্রতিটা হৃদয়কে হতাশার খুপরি দিয়ে কুরে নিয়েছে। নিষ্পাপ শিশু থেকে দেশের প্রবীণতম মানুষটির মধ্যেও একই ভেদাভেদহীন নিষ্ক্রিয়তা আর নৈরাশ্য। প্রায় সবাই উৎকণ্ঠিত চকিত দৃষ্টিতে ইতিউতি খুঁজছে কোথাও কোনো আস্থার সোনালি রেখা ঝলসে ওঠে কি না।

সব জাতির জীবন-চত্বরে এমনি অন্ধকার কিছু সময় ফিরে ফিরেই মুখ দেখিয়ে যায় যখন সেদেশের শুভত্বসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানুষদের সব প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি, শ্রেয়বোধ এমনি বিমূঢ় হতবুদ্ধি হয়ে অশুভের দর্পিত বিজয়োল্লাসকে অসহায়ের মতো করুণ চোখে তাকিয়ে দেখে। সবকিছুর অবসান দেখার পরেও আমরা আজো কেন হতাশায় ভুগছি? সর্বাত্মক বিনাশকে স্বচক্ষে দেখেও আমরা আশা করার দুরারোগ্য বদভ্যাসটাকে ছাড়তে পারছি না কেন? যখন সবকিছুই শেষ, তখনো আমাদের দেশের মানুষ কেন আজো বুঝছে না যে আশা আমাদের জন্যে আজ এক দুঃশীল আত্মপ্রতারণা—আমাদের সব সোনালি সম্ভাবনার প্রতিপক্ষ।

কেন আমরা ভাবছি এই ভেঙে-পড়া বিধ্বস্ত ঘরটাকে অলৌকিক জাদু দিয়ে

Scanned by CamScanner

আগের মতো সুঠাম আর ঠিকঠাক তুলে ধরতে পারব। কেন আমরা এভাবে ভাবছি না যে আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। সব হারিয়ে আমরা এখন শক্তিমান। যা গেছে তাকে নিয়ে আর আশা নয়, আমাদের নির্মাণ এখন সম্পূর্ণ নতুনকে নিয়ে।

কেন আমরা এমন একটা দৃশ্যের কথা ভাবতে পারছি না যে কোনো দুর্ভাগ্যজনক পারমাণবিক বিপর্যয়ে আমাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের সারাটা দেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট—আমাদের ঘর-বাড়ি, শস্যক্ষেত্র, শিল্পাঞ্চল, রাস্তা, কারখানা—সবকিছু। এদেশের জীবজন্তু, তৃণ, বৃক্ষ, প্রাণী—এমনকি এগার কোটি মানুষের আমুণ্ডপদনখ শরীরগুলোও। সব লুপ্ত, শুধু অস্ফুটভাবে বেঁচে আছে আমাদের বিলীয়মান চেতনাগুলো—আমাদের সজীব হৃদয়প্রবাহের শেষ স্পন্দনগুলো।

আমরা তো সেই চেতনা দিয়ে এই পোড়া জমিতে সম্পূর্ণ নতুন ধান বুনে আবার নতুন করে জেগে উঠতে পারি। নষ্ট জমিতে হারানো ফসলের মিথ্যা আশা করে কী হবে ? নুহের প্লাবন যখন সর্বকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তখন একটা ছোট্ট নৌকোয় প্রতিটা প্রাণের দ্বৈত একক থেকে এমনিভাবেই তো জীবনের পুনরাবির্ভাব ফিরে আসে !

১৪.৭.৯১

১৪৫

প্রশ্ন : বলুন তো, পৃথিবীর আর সব জাতির তুলনায় বাঙালির গড়পড়তা আয়ু আদ্দেক কেন ?

উত্তর : আর সব জাতি বছরে পাকে একবার, বাঙালি দুবার।

প্রশ্ন : কীভাবে ?

উত্তর : একবার জ্যৈষ্ঠে ; যখন ভ্যাপসা গরমে গাছের ওপরে আম-কাঁঠালেরা পাকে আর নিচে আমরা। দ্বিতীয়বার ভাদ্রে ; যখন গাছের উপরে পাকে বড় বড় তাল, নিচে বাঙালি। সবদেশেই গ্রীষ্ম একটা, কোনো কোনো দেশে আধটা। আমাদের দুটো।

২৬.৯.৮৮

১৪৬

আমরা এমন এক সময়ে বেঁচে আছি যখন যোগ্যতা হচ্ছে সবচেয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৫.১০.৮৮

১৪৭

যে মানুষ প্রতিনিয়ত আমাদের পরাজিত করে যেতে পারে, সেই তো আমাদের প্রিয়তম।

২১.১০.৯০

১৪৮

বছর তিনেক আগে কেন্দ্রে এক বিকেলে দেখা করতে এল জনকয় তরুণ কবি। দলপতি ছেলেটি পুরোদস্তুর বাগ্মী। দু'চারটে কথা থেকেই বোঝা গেল, সাহিত্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্যেই তাদের আসা। বাগ্মিতার বিপুল শক্তি নিয়ে সে বলে যেতে লাগল :

'ষাটের দশকে আপনার সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'কণ্ঠস্বর'—ওই দশকের তরুণ লেখকেরা সেদিন সমবেত হয়েছিল পত্রিকাটিকে ঘিরে। কী উত্তেজনায় অস্বস্ত দিন সেসব, কল্পনা করতেও ভালো লাগে।

'কিন্তু দশটা বছরও পার হল না, পত্রিকাটা বন্ধ করে আপনি চলে গেলেন টেলিভিশনে। সবার কাছে আপনার অবস্থান ত্যাগের কারণ হিসেবে দেখিয়ে গেলেন নেহাতই এক খোঁড়া যুক্তি। লিখলেন : 'যৌবনের মৃত্যুই সুন্দর।' অথচ ভেবে দেখুন, তরুণ লেখকদের মধ্যে কী উদ্দীপনাই না সক্রিয় ছিল পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলতে গিয়ে খানিকটা বোধহয় হাঁপিয়েই উঠেছিল কবি–বাগ্মী। কিছুটা দম নিয়ে ফের বলতে শুরু করল সে :

'আজ এতগুলো বছর ধরে 'কণ্ঠস্বর' বন্ধ। আপনিই বলুন, আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে এর চেয়ে দুঃখজনক শত্রুতা আর কেউ কি করেছে? কিন্তু যা যাবার তা গেছে। সুখের বিষয়, সম্ভাবনাময় নতুন ভূমিকায় জেগে ওঠার অপ্রত্যাশিত আরেকটা সুযোগ হঠাৎ করেই এসে গেছে 'কণ্ঠস্বর'-এর সামনে। সে সুযোগ যেমন অভাবিত তেমনি সম্মানজনক। কেউ লক্ষ করুন আর নাই করুন গত দুই দশকের ভেতর দিয়ে আমাদের কাল ও ভূগোল নতুন একটা জীবনাভূতিতে জেগে উঠে নতুন একটা পালাবদল ঘটিয়ে গেছে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে। আর সেই উত্থানের হাত ধরে আজ এই আশির দশকের শুরুতে একটা সম্পূর্ণ নতুন সাহিত্যদল এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সাহিত্যের দোরগোড়ায়। না, এসে দাঁড়ায় নি শুধু, তারা আজ উদ্যত, একত্রিত, সমবেত। সবই আছে তাদের। ইচ্ছা, চেষ্টা, শ্রম, আত্মোৎসর্গ, প্রতিভা––কোনোখানে কোনোকিছুরই ঘাটতি নেই। অভাব শুধু একটা ছোট্ট জিনিস—তাদের এই উদ্দীপ্ত প্রেরণার একটা মুখপত্র—তাদের জ্বলন্ত চৈতন্যের একটা অগ্নিময় প্রতিনিধি। হ্যাঁ, একটা পত্রিকা—একটা রক্তিম জ্বলজ্বলে প্রাণময় পত্রিকা, যার মধ্যে দিয়ে এই নতুন যুগের শক্তিমান প্রবল নিষ্ঠুর আলোড়ন উৎক্ষিপ্ত হবে তার অনন্য

Scanned by CamScanner

জ্বালামুখ দিয়ে। আমাদের অনুরোধ, আলসেমি ফেলে 'কণ্ঠস্বর' আবার বের করুন আপনি। আপনার নেতৃত্বে 'কণ্ঠস্বর' আবার জ্বলে উঠুক দু দশক আগের মতোই— বেগবান তারুণ্যের অনিবার্য মুখপত্র হিসেবে—তবে এবার আর ফুরিয়ে যাওয়া ষাটের জীবনানুভূতি নিয়ে নয়—আশির দশকের টগবগে তারুণ্যের নির্মম প্রতিভূ হিসেবে।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকে নবাবের শেষ সংলাপের মতোই তাঁর ভাষণের বেদনাময় আকুতি যেন পাগলা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সে একইভাবে বলে চলল : 'কণ্ঠস্বর' বের করার দায়িত্বটা আরেকবার কষ্ট করে শুধু নিন আপনি। ভেবে দেখুন, আপনার সামান্য একটু কষ্টের ওপর কত বড় একটা বিস্ফোরণ অপেক্ষা করে আছে। শুধু এটুকু পেলেই আশির দশকের শক্তিমান তারুণ্য উদ্যত তলোয়ারের মতো আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারবে আর এ সমস্ত কিছুই সম্ভব শুধু আপনার তুচ্ছ একটু দায়িত্ব নেওয়ার ওপর।

অনেকক্ষণ একটানা শুনে একসময় আস্তে আস্তে করে তাকে বললাম, "মানে— যৌবন তোমার আর বেদনা আমার—এই তো?"

হঠাৎ ঘা খেয়ে যেন চমকে উঠল কবি-বাগ্মী। অনুরোধের অসঙ্গতিটুকু টের পেয়েই যেন, সলজ্জ মুখে, থেমে পড়ল সে।

বললাম, এভাবে কি হয়? প্রতিটা নতুন কালই তার পাশব দাবি নিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই যুগের শক্তিমান তারুণ্যের সামনে। নিজেদের স্বেদ রক্ত আত্মোৎসর্গ দিয়ে সে দাবি তাদের মেটাতে হয়। আমার যুগ-চৈতন্য যেসব নতুন অজানিত বক্তব্য উচ্চারণের দাবি নিয়ে আমাদের সামনে এসেছিল, সাধ্যমতো যত্নে আমরা সে ঋণ শোধের চেষ্টা করেছি। তোমার কাল ও ভূগোলের ঋণ তোমাকেই শোধ করতে হবে—আমাদের নির্বীজ বার্ধক্য দিয়ে তোমাদের তারুণ্যের প্রতিকার আমরা কী করে করব?

২৯.১০.৮৯

১৪৯

খুব ছেলেবেলায় স্মৃতির একটা ভাঙা টুকরো—সম্ভবত কোনো একটা ভ্রমণের— আজো মনে আছে। মনে পড়ে, কোনো একটা অস্পষ্ট শহর থেকে বাসে করে রওনা দিয়েছিলাম আমরা। শহর ছাড়তেই বাসের ডানদিক থেকে আঁকাবাঁকা একটা ছোট্ট নদী—হঠাৎ ছুটে এসে আমাদের পিছু নিল। নিল তো নিলই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সেই ছোট্ট নদী আমাদের সাথে সাথে ছুটে চলল। এর মধ্যে তার প্রস্থ বাড়ল, ঢেউ বড় হল, কিন্তু ছোটার কোনো বিরাম নেই। কিছুক্ষণের জন্যে সে হয়তো হারিয়ে গিয়ে চোখের আড়াল হয়ে যায়, কিন্তু তার পরেই আবার বাড়ির কুকুরছানার মতো গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটে এসে বাসটার সাথে সাথে এগিয়ে চলে। একসময় ঘটল এক মজার ঘটনা। যে শহর আমাদের গন্তব্য ছিল তার

কয়েক মাইলের মধ্যে এসে হঠাৎ করেই নদীটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তার আভাসও আর দেখা গেল না। চারপাশের সবুজ শস্যক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ি শহরের ঠিক মাঝখানে—বাসস্ট্যান্ডে এসে থামল। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দোকান, অফিস, লোকজনের চিৎকার, ভিড়। পুরোদস্তুর ঘিঞ্জি শহর। হঠাৎ বাসের উল্টোদিকের জানালা দিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম : সেই নদী। আমাদের আগে পৌঁছে আমাদের থেকে একটু দূরেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার ঢেউ আর বিস্তার তখন আগের চেয়ে অনেক বড় আর উত্তাল।

কাল জানালা দিয়ে তাকিয়ে আমার নিয়তির সেই নদীটাকে দেখতে পেলাম। এগোতে এগোতে এখন একেবারে আমার জানালার ঠিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর একটু এগোলেই সব গল্পের অবসান।

২০.১০.৯০

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় পর্ব

Scanned by CamScanner

১৫০

বিজ্ঞান কলেজে (তখন নাম ছিল ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ) যখন যোগ দিয়েছিলাম, তখন আমি তারুণ্যের দরজায়। অনেক সজীব স্বপ্ন তখন আমার দু'চোখ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। অবিশ্বাস্য অসম্ভব কিছু ঘটবে ভেবে যে জীবনকে সেদিন এত গরীয়ান, এত আকাশস্পর্শী ভেবেছিলাম, আজ টের পাচ্ছি তার তুলনায় কত তুচ্ছ, কত ভিখিরি এই জীবন। তবু সেদিন স্বপ্ন দেখতাম, দেখতে পারতাম, এইটেই ছিল শক্তি।

ওই কলেজের কথা মনে হলে সেই স্বপ্ন দেখার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। তখন শিক্ষাকে শিক্ষকতাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈভব বলে সম্মান জানিয়েছিলাম। এখন চারপাশে তার দুরপনেয় পতন দেখে দুরূহতর সংগ্রামের পদধ্বনি শুনছি।

এই কলেজ ছেড়ে আসার পর কত বদলে গেছে এই শিক্ষায়তন। কত মুখ ছিল, এখন তারা নেই। কত নতুন মানুষের পদপাতে এর চত্বর মুখর হয়েছে এর মধ্যে। কত মানুষ ছিল স্বাস্থ্য আর যৌবনে প্রাণবন্ত। তারা এখন ন্যুব্জদেহ, বার্ধক্যের দিকে নোয়ানো।

একটা পুনর্মিলনী এইসব মনে করিয়ে দেয়।

১৪.১.৮৪

১৫১

সবকিছুকে এমন মিথ্যাচারী আর ভানসর্বস্ব মনে হচ্ছে কেন? মানুষের সব প্রতিজ্ঞাই কি শেষ পর্যন্ত কুকুরের চিৎকার? স্বপ্ন মানেই বর্শাবিদ্ধ লাশ? প্রিয় মুখের স্মৃতি মাত্রেই বিবমিষা?

কোন্ দিকে যাব?

২০.১.৮৪

১৫২

অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। এই না-দেখার ছায়াগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে সমস্ত বাস্তবকে ঢেকে ফেললেই সবকিছুর অবসান।

২৬.১০.৮৪

Scanned by CamScanner

১৫৩

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম–এর কথার জবাবে, মনে মনে :

ওরা অন্যদের ফাঁকি দিয়ে নিজ মিথ্যাকে বাঁচাতে চাচ্ছে, স্যার। আমি মরছি নিজেকে ফাঁকি দেবার অশ্লীলতা থেকে বাঁচবার অত্যাচারে।

১৫.১০.৮৪

১৫৪

আমাদের দেশের উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েগুলো প্রায় দুর্ভাগ্যের প্রতীক। না চাইতে সবকিছু পেয়ে পেয়ে অকালে বুড়িয়ে শেষ হয় পুরোপুরি। বিস্মিত হবার, স্বপ্ন দেখার, নিজের সঙ্গে প্রতিযোগিতার হিংস্র তীব্র সুখটুকু খুইয়ে মরে ঝরে শুকিয়ে যায় একেবারে। আমার ধারণা এদের বুদ্ধিমান বাপ–মায়েরা একটাই দামি সম্পদ রেখে যেতে পারেন এদের ভালোর জন্যে। তা হচ্ছে : সামান্য কিছু দুর্ভাগ্যের যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ—যে রক্তাক্ত বলটাকে লোফালুফি করে এরা এই জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

৬.৯.৮৫

১৫৫

একাত্তরে এত রক্ত দিয়েছি আর আজ দেশের এমন আশঙ্কাকর পরিস্থিতিতেও কেউ কিছু করতে পারছি না। 'দেবার মতো রক্ত' আমাদের কি তবে শেষ।

৬.৯.৮৫

১৫৬

ভালোবাসায় দুজনকে দুজনের কিছুই জানাতে হয় না। অপার্থিব পুলকানুভূতির ভেতর তারা টের পায় : পরস্পরের দিকে তারা অবারিতভাবে শুধু আসছে...।

২৩.২.৮৪

১৫৭

যাদেরকে কিছুই দেবার নেই, তাদেরকেও আমাদের কিছু দেবার আছে। ...

২১.১.৮৪

১৫৮

আমারও একটা সুন্দর যৌবন ছিল একদিন। তোমাদের অনেকের চাইতে সুন্দর।

২৫.২.৮৫

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

১৫৯

শামসুর রাহমান লিখেছিলেন : 'বেগম পেতে চায় বাঁদীর সুখ।' আমাদের যুগটা সম্পর্কে কথাটা আশ্চর্যভাবে মেলে। সবাই রাজমুকুট ফেলে 'গোলাম'—একটা পরিতৃপ্ত সুখী গোলামের 'জীবন' খুঁজে গেল? নিজের প্রাণকোষের আগুনকে বিশ্বাস করতে সাহস করল না।

৩.৩.৮৪

১৬০

আজ মিন্টো রোড ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম। সকাল তখন ন'টা-সাড়ে ন'টা। গাছপালায় ঢাকা সবুজ নির্জন রাস্তাটা অপরূপ। হঠাৎ একটা মিষ্টি নরম হাওয়া কারো স্নিগ্ধ হাতের মতো গায়ে এসে লাগল। চমকে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে নিলাম। না, কেউ নেই কোথাও।

এমনি সময় হঠাৎ সামনেই একটা লাশ দেখলাম—কয়েকটা মানুষ একটা খাটিয়ায় করে নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে চলেছে।

কেন এসব লাশ আমার সব অপরূপ মুহূর্তগুলোকে এভাবে ছিঁড়ে কেবলই গলিত মুখ জাগাচ্ছে আজকাল।

৭.৩.৮৪

১৬১

আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে মুশকিল। এরা এমন সুন্দর আর গুণান্বিত যে প্লেটোর একাডেমিও হয়তো এদের পেলে গর্ব করত। কিন্তু সমস্যা একটাই : এদের মধ্যে যারা সন্ন্যাসী তারা যৌবনকে চেনে না—যারা তারুণ্যদীপ্ত তারা প্রত্যাখ্যানে পরাঙ্মুখ। এক হাতে যৌবন অন্য হাতে প্রত্যাখ্যান--যৌবরাজ্যের সেই কান্তিমান বরপুত্রদের কোথায় পাই?

৮.৩.৮৪

১৬২

কী হল একটা জাতির? এত কোটি কোটি মানুষ একসঙ্গে নির্বীজ হয়ে গেল। কী অসহায় আর নিঃস্বতার অনুভূতির মধ্যে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। প্রিয় দেশবাসী, সবাই এত অল্পদামে তোমাদের 'দ্বীন আর মিল্লাতকে' বিক্রি করে দিলে?

১০.৩.৮৪

Scanned by CamScanner

১৬৩

এক ধরনের স্ত্রী যৌবনের জন্যে ভালো; এক ধরনের স্ত্রী বার্ধক্যের জন্যে। প্রথম ধরনের স্ত্রীরা পৃথিবীতে সত্যিই বিরল। দ্বিতীয় জাতের সংখ্যা প্রথম জাতের তুলনায় হয়তো বেশি, তবুও বিরল। আরেক ধরনের স্ত্রী আছে যারা যৌবন এবং বার্ধক্য—দুয়ের জন্যেই ভালো। এরা যে কত বিরল তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তবে সবচেয়ে বিরল এ পৃথিবীতে যা, তা হল, চলনসই একটা মোটামুটি ভালো বউ।

১৩.৩.৮৪

১৬৪

জীবন তো একগুচ্ছ প্রদীপ—এর সব উঁকিতেই আলো। শুধু একটাকে হারিয়ে আরেকটায় জ্বলে ওঠা।

৭.৪.৮৪

১৬৫

এই কি পাবার ছিল! তুমিও তো একদিন বসন্তের মদিরাহত রাতে ঘাই হরিণীর মতো ডুকরে ডুকরে ডেকেছিলে—এই 'ঘৃণার আক্রোশের' জন্যে! তোমাদের কাছ থেকে বিদায়! এ্যান্টিগোনির মতো অন্ধকার মৃত্যুর অচেনা দেশে চলে যাচ্ছি। এখন থেকে মুখোমুখি নীরব হয়ে অপেক্ষা করবে শুধু দুজন—আমি আর আমার মৃত্যু। বিচারের জবানবন্দিতে সক্রেটিসের শেষ কণ্ঠস্বর কানে ভাসে : আপনারা এখন জীবনের দিকে চলে যান, আমি মৃত্যুর দিকে! কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ বন্ধুগণ? কোন্‌টা?

৭.৪.৮৪

১৬৬

জন্মগতভাবেই যারা বিকশিত, ধরে নিতে হবে না কি যে ওই কারণেই, এক অর্থে, তাদের বিকাশও রুদ্ধ। নিঃশেষিত একটা অগ্রসররহিত স্থির নিশ্চল অসাধারণত্বের আলোকোজ্জ্বল জগতে বেঁচে থাকাই তাদের একমাত্র বিধিলিপি। কী হবার আর থাকল তাদের? কার সঙ্গে সংগ্রামে নিজেকে রক্তাক্ত করতে হবে তাদের এই সংসারে? পৃথিবীতে যাদের নিষ্ঠুরতম সংগ্রাম করতে হয়, করে লাভবান হওয়া সম্ভব হয়, তারা তো 'মাঝারি'। নিজেদেরই ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে, দৈন্যের বিরুদ্ধে, জন্মগত অপারগতা আর বৈকল্যের বিরুদ্ধে জিতে জিতে অসাধারণত্বকে তাদের রোজগার করতে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে। মানবসভ্যতার ইতিহাস যাদের মাথায় অসাধারণত্বের শিরোপা দিয়েছে কিংবা সেইসব মৃত্যুজয়ী

Scanned by CamScanner

লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের রক্তমাখা চন্দ্রমল্লিকায় আজ সভ্যতা কান্তিমান তারা কি এইসব 'জন্মগত প্রতিভা' নাকি অসাধারণের ছদ্মবেশে অনুপ্রেরণাদীপ্র ওইসব উপেক্ষিত 'মাঝারি'?

২২.৭.৮৪

১৬৭

আমার রাশিয়াও নেই, আমেরিকাও নেই। নিজের মাতৃভূমিটাও নেহাতই কপর্দকশূন্য। কঠিন একটা কিছু হলে বিনা ভাড়াতে 'নক্ষত্রপল্লী'।

২৪.৪.৮৪

১৬৮

প্রতিটা জন্মদিন এককেটা ছোট্ট মৃত্যুকে পায়ের সামনে ফেলে রেখে যায়।

২৫.৭.৮৪

১৬৯

সেদিন একজন পরিচিত ভদ্রলোক বলছিলেন, "যদি ধরে নিই কারো কাছ থেকে আমাকে কিছু পেতে হবে, তবে প্রথমে তার কাছে সেটার জন্য হাতজোড় করে 'অনুরোধ জানাব'। বলব, জিনিসটা দেবে ভাই, বড় দরকার, না হলেই নয়, দিতেই হবে তোমাকে, দাও। যদি তাতে না হয় তবে হাতজোড় করে তার কাছে 'ভিক্ষা চাইব'। পা ধরে বলব, না হলে চলবেই না, দাও দয়া করে, ভিক্ষা দাও। তাতেও যদি উদ্ধার না হয়, তবে শেষ কাজটা করব। তাকে বধ করব। কিন্তু জিনিসটা আমার চাই।"

প্রতিকূল একটা পৃথিবীকে জয় করে যাকে প্রতিদিন ইঞ্চি ইঞ্চি এগোতে হচ্ছে এই নির্মম হিংস্র আগ্রাসন তার বিধিলিপি। আমাদের চারপাশে বেশকিছু মানুষের মধ্যেই তো জীবনের এই হিংস্র অপরাজেয় শক্তির বন্যতা লক্ষ করেছি।

এই রক্তবীজের উৎসার নিজের গৃহপালিত শোণিতধারায় খুঁজে পাই না কেন?

১০.১০.৮৪

১৭০

ভালোবাসার কাছ থেকে তিনটি মূল্যবান জিনিস প্রায় অবধারিতভাবেই উপহার পেয়ে এসেছি সবসময় :

অকথ্য সুখ, অসহ্য যন্ত্রণা, আর একটা বিশাল সুপরিপক্ব ব্যর্থতা।

৮.৯.৮৫

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

১৭১

কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলেকে সত্যি সত্যি পটাতে চায় তবে অযথা সময় নষ্ট না করে ছেলেটাকে সোজাসুজি 'ভাইজান' বলে ডাকতে শুরু করে দেওয়া উচিত। লাভ হাতেনাতে। কয়েকদিনের মধ্যেই ভাইজানের 'ভাই'টা লেজের মতো খসে পড়ে যাবে, থাকবে শুধু 'জান'টা।

২৯.৯.৮৫

১৭২

কী নির্মম কষ্ট এই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়ে। তবু কতটুকুই-বা করা যাচ্ছে? বিদ্যাসাগর নাকি বলেছিলেন, এই দেশটার ওপর থেকে কয়েক হাত মাটি উপড়ে ফেলে দিতে পারলে কিছু হবার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। আল মাহমুদের লেখা কবিতার লাইনটাই ফিরে ফিরে মনে আসে :

'পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।'

প্রসঙ্গটা নিয়ে সেদিন বাংলা একাডেমীতে কথা হল অনেক। একজন বলল, 'ভারি কষ্ট গেল আপনাদের।'

'সব কষ্টের মধ্যে প্রসব বেদনাই সবচেয়ে তীব্র'—তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'প্রসব বেদনার কথা আবার আসছে কেন এসব ভালো কথার ভেতর'—অশ্লীল হেসে খ্যাঁ খ্যাঁ করে উঠল একজন পাশ থেকে।

'আসছে এ জন্যে যে মেয়েদের প্রসব বেদনা যদি এর অর্ধেক কষ্টেরও হত তা হলেও মানবজাতি লুপ্ত হত।'

'কেন, কেন?'—এবার চারদিক থেকে প্রশ্ন।

'পৃথিবীর সব মেয়ে জোট বেঁধে মা হতে অস্বীকার করত তাই।'

এবার সম্মিলিত হইচই।

তবু যত মিথ্যাই হোক, একটা নির্মাণের উদ্দীপনার মধ্যে এতদিন জ্বলে জ্বলে বেঁচে ছিলাম, এর চেয়ে উজ্জ্বল ব্যবহার কি আর হতে পারত এই সময়ের?

৩০.৯.৮৫

১৭৩

আজ সকালে শামীম ফোন করে বলল : কলেজটাকে এমন অদ্ভুতভাবে জুড়ে থাকেন যে যতক্ষণ সেখানে থাকেন ততক্ষণ তো চোখে পড়েই, যখন থাকেন না তখনো সবটা জায়গা জুড়ে থেকে যান। কথাটা একই রকম অনুভূতি দিয়ে অনেকদিন আগে বলেছিল আরেকজন লোক। লোকটা নেহাতই সাধারণ। আমি তখন সবে গ্রিন রোডের বাসা ছেড়ে বেইলি স্কোয়ারের বাসায় উঠে এসেছি।

Scanned by CamScanner

লোকটা গ্রিন রোড কলোনির সামনের রাস্তার ধারের একটা ওষুধের দোকানের কম্পাউন্ডার। বেইলি রোডে চলে আসার মাসখানেক পর, বোধহয় কোনো কাজের সূত্রেই, গ্রিন রোডের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কলোনির সেই পুরোনো বাড়িটা দেখে মনে পড়ল, এক সময় এই বাড়িতে ছিলাম বারোটা বছর। জীবনের কত সুখ, স্বপ্ন, রক্তক্ষরণ বাড়িটার মেঝেতে মরে পড়ে আছে। বাসাটার নতুন বাসিন্দারা তাদের নতুন সাজানো ঘরগুলোয়, ড্রয়িংরুমে, বারান্দায় সেসব স্মৃতির কোনোকিছুই দেখতে পায় নি।

হঠাৎ পাশেই কম্পাউন্ডার লোকটার গলার স্বর শুনে ফিরে তাকালাম : 'আমাদের দোকানটায় একটু বসে যান–না স্যার।'

লোকটা আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্যে দোকান ফেলে প্রায় পঞ্চাশ গজ হেঁটে এসেছিল। লোকটার সঙ্গে আমার খুব একটা পরিচয় ছিল এমন নয় ; কিন্তু তার আমন্ত্রণের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে তার দোকানে গিয়ে না বসে পারলাম না। মৃদু মমতা নিয়ে লোকটা বলল, আপনি ছিলেন, জায়গাটা আলো হয়ে ছিল। এখন সবকিছুই কেমন যেন মনমরা।

এমন মমতার সঙ্গে লোকটা কথাগুলো বলল যে আদৌ বানানো মনে হল না। লোকটার সঙ্গে এমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। আত্মীয়স্বজনও নয়। হয়তো আমার টেলিভিশন ভক্তদেরই একজন। সারাটা দিন দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ বেচাবিক্রি করে বাড়িতে গিয়ে টেলিভিশন দেখার মতো শরীর বা মনের অবস্থা থাকার কথাও নয় তার। আর এ ধরনের গরিব কম্পাউন্ডারের বাড়িতে টেলিভিশনই–বা থাকবে কী করে? হয়তো লোকটার নিজের বাসাই নেই ঢাকায়। হয়তো কোনো অবস্থাপন্ন আত্মীয় বা অন্য কারো বাড়িতে থাকে, সেখানে টিভি দেখার সুযোগ পায়।

তা হলে কেন এমন গভীর হয়ে উঠল সে? এত মমতা কোথা থেকে এল? এত আদর কোথায় কী করে থাকে মানুষের মধ্যে?

- ১০.১০.৮৫

১৭৪

কেন্দ্রের ছেলেমেয়েদের জন্যে জুডো আর কারাতে শেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কয়েকটা গুণ্ডা ছুরি হাতে 'কেন্দ্রের গেটে এসে দাঁড়াবে আর অমনি আমাদের দুর্ধর্ষ জ্ঞানতাপসের দল 'কেন্দ্র'র পেছনের দরজা দিয়ে লেজ উচিয়ে দৌড় দেবে—এই লক্ষ্মণসেনী অসম্মানের দৃশ্য বারে বারে একটা জাতির পক্ষে অসহ্য।

গতকাল প্রথম অনুশীলনে ছেলেমেয়েদের সাথে আমিও ছিলাম। সবাই হাসল খুব। একজন বলল, এই বয়সে এসব শিখে কী করবেন? কারো সাথে লড়াইটড়াই করবেন নাকি আবার?

Scanned by CamScanner

আমি চুপ করে রইলাম। কী করে ওদের বলি, মানুষের জীবন কোনোদিন শেষ হয় না।

৩.৮.৮৫

১৭৫

বুঝে কি কেউ ভুল করে? যদি কেউ বলে সে বুঝে ভুল করছে, তা হলে কি বুঝতে হবে না তার ওই বোঝাটাই ভুল?

২৯.১২.৮৬

১৭৬

দুটো ব্যাপারে আমার দুটো থিয়োরি আছে।

প্রথমটা হল : "ক্ষতিকর না হয়ে কোনো কিছুই ইন্টারেস্টিং হয় না।"

আপনার প্রিয় জিনিসগুলোর নাম মনে করুন না একবার? সিগারেট, চা, বোতল, কফি, মেয়েমানুষ, সুখাদ্য, ক্ষমতা, বিত্ত—এদের মধ্যে ক্ষতিকর কোন্‌টা। এদের কার কাছ থেকে উল্টো চড় খান নি এখনো? না খেলে অপেক্ষা করুন। মহামান্য হালাকু আসছেন।

দ্বিতীয় থিয়োরি : 'প্রিয় স্বামীরা তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়।'

সব পতিপ্রাণা স্ত্রী-ই চান, তাঁর প্রিয় স্বামীটি নিদেনপক্ষে আরো অন্তত এক হাজার বছর বাঁচুক, কিন্তু 'বৃদ্ধ আকারে'। স্বামীদের যৌবনগুলোকেই কেবল এদের ভয়।

বেচারা স্বামী দেবতাগুলো তখন বৃদ্ধ না হয়ে কী করে?

৩০.১২.৮৬

১৭৭

সাতান্ন থেকে একষট্টির দিনগুলো মনে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ গাছপালার ছায়ায় আমার জীবনের সুন্দরতম দিনগুলো। মনে আছে শীতের তীক্ষ্ণ হাওয়ায় গাছগুলোর চিরোল চিরোল পাতাগুলো থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠত আর আমার বুকের ভেতরটা বিষণ্ন বেদনায় কনকন করতে থাকত।

এম. এ পরীক্ষার পর মুন্সীগঞ্জ কলেজে চার মাসের মেয়াদে একটা খণ্ডকালীন চাকরি জুটল। কাজেই হন্যে হয়ে তড়িঘড়ি একটা সার্বক্ষণিক চাকরি খুঁজে বেড়াবার দায় পড়ল মাথায়। হঠাৎ আতাউল (তখন অধ্যাপক) জানাল সিলেট মহিলা কলেজে একটা অধ্যাপকের পদ খালি হয়েছে। ওর বোন চাকরি ছেড়ে চলে

Scanned by CamScanner

এসেছেন সেখান থেকে। চেষ্টা করে দেখতে পারি।

পলকে চোখের ওপর এক হাজার রঙিন বেলুনের ওড়াউড়ি। কমলার মতো মেয়েদের দেশ সিলেট। তার ওপর মহিলা কলেজের রক্তিম সম্ভাবনা। রাতের ট্রেনে সিলেট পৌঁছে পরদিনই দেখা করলাম অধ্যক্ষার সঙ্গে। চাকরির জন্যে সব যোগ্যতাতেই টিকে গেলাম, কিন্তু গোল বাধিয়ে বসল ভিন্ন একটা ব্যাপার। কিছুদিন আগে ওই কলেজেরই এক তরুণ অধ্যাপক একটা হৃদয়বান গোছের প্রস্তাব করেছিলেন ওই কলেজেরই একটা মেয়ের কাছে। সে সময়কার রক্ষণশীল সিলেট ব্যাপারটাকে খুবই নির্দয়ভাবে নিয়েছিল। ব্যাপারটার তুচ্ছ অজুহাত তুলে সিদ্ধান্ত করে রাখা হয়েছিল : আপাতত কোনো পুরুষ শিক্ষককে আর কলেজের চাকরিতে নেওয়া হবে না।

তবু অদ্ভুতভাবেই চাকরিটা হয়ে গেল। কলেজের অধ্যক্ষার ঘরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ইন্টারভিউ চলল। কলেজের বেশ কজন বর্ষীয়সী অধ্যাপিকা যতদিক থেকে সম্ভব আমাকে যাচিয়ে, খুঁটিয়ে, বাজিয়ে কনে দেখার মতো করে দেখলেন। তারপর আমাকে স্টাফরুমে পাঠিয়ে শুরু হল তাঁদের গোপন উত্তেজিত, রুদ্ধদ্বার মন্ত্রণা। প্রচণ্ড সে বাদানুবাদ, দূরের স্টাফরুমে বসেও টের পাচ্ছিলাম। আধঘণ্টা পরে অধ্যক্ষার অফিসে আবার ডাক পড়ল। হ্যাঁ, চাকরি হয়েছে।

কিন্তু কেন হল চাকরিটা? এমন অসম্ভব কী করে সম্ভব হল। কিছুদিন পরে ওই বর্ষীয়সী অধ্যাপিকাদের একজনের কাছে আসল কারণটা শুনেছিলাম। নেহাতই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। আমার সরল নিরপরাধ চোখ দুটো তাঁদের সবারই মনে ধরেছিল। এমন সহজ সরল চোখ থেকে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা খুঁজে পান নি তাঁরা। কাজেই কিছুদিন পরীক্ষামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে আপত্তি কী। অধ্যাপিকা, অধ্যক্ষা সবাই বর্ষীয়সী, সবাই আমার শ্রদ্ধেয়া। আমার চোখের প্রেমে পড়ে তাঁরা এমন সিদ্ধান্ত নেবেন, এটা অমূলক। তবু একটা কথা তো সত্যি : তাঁদের মতো অধ্যাপিকাদের বর্ষীয়সী চোখে যে চোখদুটোকে এতটা সরল আর স্বপ্নালু লেগেছিল সেই চোখদুটোকে তাঁরা তাঁদের কলেজের নিরপরাধ মেয়েগুলোর জন্যে নির্ভেজাল ভেবেছিলেন কোন্ বিবেচনায়! বিপত্তিই কি পৃথিবীতে সবসময় বিপজ্জনক? কলেজের পাশেই একটা পুরোনো ভাঙা অভিজাত দালানবাড়িতে থাকার জায়গা পেলাম। দালানটা কলেজেরই, অবিবাহিত অধ্যাপকদের থাকার একটা নামমাত্র সাময়িক ব্যবস্থা। বাড়িটার আধখানা জরাজীর্ণ হয়ে ধসে পড়েছে। সেদিকটার দেয়ালে, ছাদে, ইটের ভাঙা পাঁজরে শ্যাওলা আর আগাছার রাজত্ব। বাকি অর্ধেকটা অবিশ্যি অতীতের বনেদি চেহারা নিয়ে আগের বৈভবেই বর্তমান। বাড়িটাতে ঢুকে বুঝলাম বাড়ির বাসিন্দা মাত্র একজন। ভদ্রলোক ইংরেজির অধ্যাপক, নামটা ঠিক মনে নেই, আমাদের কথাবার্তার শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁচিশ কি পঁয়ষট্টি

Scanned by CamScanner

বোঝা মুশকিল। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে অবাক হতে হল। বেরিয়ে এসেই আমাকে সস্নেহে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন। নিজের হাতে জিনিসপত্র গোছগাছ করে আমার যাবতীয় দায়দায়িত্ব প্রায় জোর করেই নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন।

সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে বসে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ টের পেলাম। দেখলাম, পৃথিবী-জোড়া এক ভয়ের রাজ্যে যেন আমুণ্ড ডুবে আছেন তিনি। তাঁকে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত মনে হল তাঁর আটত্রিশ বছরের 'নবীন' যৌবনটাকে নিয়ে। টেবিলে বসেই সভয়ে কলেজ বিল্ডিংটার দিকে আঙুল উঁচিয়ে আমাকে আরেকবার ভালো করে কলেজটাকে দেখিয়ে নিলেন, তারপর বলতে লাগলেন, 'তেতরে সত্তর, বাইরে বাইশ।' চমকে ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। ভেতরে সত্তর বাইরে বাইশ—কী মানে এসব রহস্যময় কথাবার্তার।

শান্তভাবে অভয় দিয়ে পুরো তাৎপর্যটা নিজেই ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'ওই যে সামনে দেখছ কলেজ, ওর মধ্যে ঢুকলেই তোমার বয়স হয়ে যাবে সত্তর। তোমার গালভর্তি গজিয়ে যাবে লম্বা সাদা দাড়ি। চোখ বসে যাবে গর্তে, দাঁত হবে নড়বড়ে, আর ওই যে মিষ্টি মেয়েগুলো—ওরা হয়ে যাকে তোমার সাক্ষাৎ সব নাতনীর দল, কামনা বাসনার দশ মাইলের মধ্যে কোথাও কোনো কিছু থাকবে না। কিন্তু দাদা যেই-না কলেজ থেকে বেরোলে অমনি তোমার বয়স আবার বাইশ, পুরো বাইশ বছরের তরতাজা ছোকরা তখন তুমি হে, মেয়েদের নিয়ে যা খুশি ভাব, স্বপ্ন দেখ, কবিতা লেখ, কিংবা অন্য যা খুশি—বলে সারা মুখে একরাশ অশ্লীল হাসির আভাস ছড়িয়ে বললেন, বুঝলে, এইভাবে বাইশ-সত্তর বাইশ-সত্তর করে কলেজে আস-যাও, কোনো ভেজাল নেই। আমার দিকেই তাকিয়ে দেখ না! দশ দশটা বছর ধরে চাকরি করছি, কেউ একটা কথা বলতে পেরেছে কোনোদিন! আসলে জান, তোমার মায়া-মায়া চেহারাটা দেখে কেমন একটু ভয় করছে, তাই বলা! ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধরন-ধারণের আদ্যোপান্ত শুনে টের পেলাম প্রথম দেখেই কেন তাঁকে জাদুঘরের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন মনে হয়েছিল। দশ বছর ধরে একটানা আটত্রিশ-বাহাত্তর আটত্রিশ-বাহাত্তর করে এই আসা-যাওয়া আর যাওয়া-আসার ভেতর একসময় তাঁর আটত্রিশ বছরের লেজটা শরীর থেকে কখন যে নিঃশব্দে ঝরে গেছে বেচারা টেরই পান নি। এখন ঘর আর কলেজ সব জায়গাতে তাঁর শুধু ওই একটাই চেহারা—বাহাত্তর।

তিন মাস চাকরি করেছিলাম কলেজটায়। এর মধ্যেও এক মাস আবার বন্ধ। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজ কর্তৃপক্ষ মর্মান্তিকভাবে টের পেতে শুরু করেছিলেন, কলেজের অধ্যক্ষা আর বর্ষীয়সী অধ্যাপিকারা তাদের সারাজীবনের দূরদৃষ্টি ব্যবহার করে ছাত্রীদের জন্যে খুব নিরাপদ দুটো চোখ আমদানি করেন নি।

এমনি সময় হঠাৎ খবর এল সরকারি কলেজে আমার চাকরি হয়ে গেছে।

Scanned by CamScanner

নতুন চাকরিতে রওনা হবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। খুব যে আনন্দের সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম বলব না। বুকের ভেতর কোথায় যেন স্বর্গ থেকে বিদায়ের একটা ঘণ্টাধ্বনি টনটন করছিল। পরের দিন অধ্যক্ষার সঙ্গে দেখা করে নতুন চাকরির প্রসঙ্গ তুললাম। আশা ছিল আমার যাবার কথা শুনে অধ্যক্ষা দুঃখিত হবেন। কিন্তু দেখা গেল তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। 'বাঁচালেন শেষ পর্যন্ত', হঠাৎ বলেই বসলেন তিনি। কষ্ট লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কীভাবে?'

'আপনি না গেলে আমাদেরই আপনাকে কলেজ ছেড়ে যেতে বলতে হত।' কিছুটা আহত হলাম, 'আমার অপরাধ?'

'মানুষ সব সময় অপরাধের জন্যে শাস্তি পায় না?' মিষ্টি হেসে জানালেন অধ্যক্ষা।

হে আমার নিরপরাধ চোখেরা, তোমরা কোথায় এখন। তোমাদের অপরাধে কেউ করুণা করেও এখন আর আমাকে চাকরি থেকে অপসারণের সম্মানটুকু দেবে না। সবশেষে একটা ছোট্ট খবর। আমাকে কেউ চাকরি ছাড়ার কথা বলুন আর নাই বলুন—সেই আটত্রিশ-বাহাত্তর সাহেব কিন্তু ঠিকই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এর কয়েকদিনের মধ্যেই। তবে একা নয়, কলেজের সবচেয়ে ডাঁসা মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে।

২০.১.৮৭

১৭৮

ছেলেবেলার রূপকথায় একটা ঘুমের দেশের গল্প পড়েছিলাম। সেখানে হাতিশালে হাতি ঘুমোয়, ঘোড়াশালে ঘোড়া। সিংহাসনে রাজা ঘুমোন, দরজায় শাস্ত্রী। পাত্রমিত্র অমাত্য সভাসদ সব ঘুমোয়।

এই ঘুমের মৃত্যু থেকে দেশটাকে বাঁচাবার পথ কিন্তু খুব সোজা। সামান্য একটু কাজ : রাজকন্যার শিয়রের কাছের সোনার কাঠি আর পায়ের কাছের রুপোর কাঠির সামান্য একটু জায়গা-বদল। ব্যাস, দুদ্দাড় শব্দে জেগে উঠবে সারা দেশ। জীবন্তভাবে চলাফেরা শুরু করবে সবাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় : এই সামান্য তথ্যটুকু মৃত্যুগ্রস্ত দেশটার এত মানুষের কারো জানা নেই। আর সেজন্যেই দূর অপরিচিত দেশের এক অচেনা রাজপুত্রকে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, কড়ির পাহাড়, শঙ্খের পাহাড় পিছে ফেলে, যন্ত্রণার রক্তময় অভিযাত্রায় একদিন সেই দেশে এসে উপস্থিত হতে হয়—মৃত্যুর ঊষরতা থেকে সারা দেশটাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে।

দুঃসাধ্য পথের এই সুদূর রক্তাক্ত অভিযাত্রীটির নামই কি 'প্রতিভা'?

১০.২.৮৭

Scanned by CamScanner

১৭৯

আমাদের দেশটায় সৃষ্টিছাড়া সবকিছুই। স্মরণীয় মানুষদের জন্ম বা মৃত্যুদিন এলেই স্কুল-কলেজ সব ছুটি। অথচ এর ঠিক উল্টোটাই হওয়া কি উচিত নয়? উচিত নয় কি ওসব দিনেই স্কুল-কলেজ আরো বেশি করে খুলে রাখা। ছাত্রদের লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে আঙুল নেড়ে বুঝিয়ে বলা : 'তাকিয়ে দেখ এইসব মানুষদের দিকে। কাজ থেকে কোনোদিন ছুটি নেন নি বলেই এঁরা এত বড় আর স্মরণীয় হয়েছিলেন। তোমরাও ছুটি নিও না, তাঁদের মতো অগ্রাহ্য কর বিশ্রাম, তোমরাও তাঁদের মতো বড় হবে।'

৭.১১.৮৭

১৮০

লিখতে শুরু করলাম ছিটেফোঁটা। অন্তত কয়েকটা বছর বেঁচে থাকা ভীষণ প্রয়োজন। মস্তিষ্কের খাঁজে খাঁজে লেলিহান আগুনের মতো অজস্র শব্দের গনগনানি। অন্তত তিন-চার হাজার পৃষ্ঠা না লিখতে পারলে কিছুই জানিয়ে যাওয়া হবে না।

বছর পনের আগেও আমার হাতে রবি রেখা (সান লাইন?) ছিল না। যখন সাহিত্য আন্দোলনের দিনগুলোয় মেতে ছিলাম—'কণ্ঠস্বর' বেশ সাড়া তুলেছে, তখনো না। টেলিভিশনে যাবার পর পরই অবাক হয়ে লক্ষ করলাম অনামিকার ঠিক নিচে তালুর মাঝ বরাবর একটা ধারালো সরু রেখা, অস্ফুটে, প্রায় চোখের অজান্তে, ফুটে উঠতে শুরু করেছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দিনগুলোতে রেখাটা আগের চেয়ে অনেক গভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুদিন থেকে আবার লক্ষ করছি, রেখাটার ওপরের দিকটা সরু আর অস্পষ্ট হয়ে আবার ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে।

তবে কি ওই কয়েকটা বছরের আগেই সব শেষ?

কিছুই তো বিশ্বাস করি না। ঈশ্বরের পুত্রকে না, ঈশ্বরকে না, ভাগ্যকে না, ভাগ্যের রেখাকে না—তবু কেন ফিরে ফিরে শুধু এসব অশুভ কথা মনে আসে?

৭.১১.৮৭

১৮১

আমি স্বাস্থ্যবান অসুস্থ। আমার শরীরের কাঠামো বলিষ্ঠ দোহারা, কিন্তু শরীরের অন্ধকার খাঁজের ভেতর আজন্ম লালন করছি মূর্তিমান ক্লান্তির এক ধারাবাহিক কষ্ট।

আর্ত জন্তুর মতো একটা জীবনে বেঁচে থাকতে হল আজীবন। ছেলেবেলায় প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগত। সেই ঠাণ্ডা বেড়ে বেড়ে বছর পঁচিশেক আগে, আততায়ীর মতো, জীবনের ভিতে স্থায়ীভাবে বসে গেল। সারাক্ষণ মাথাটা বেদনায় ভারী আর ক্লান্ত হয়ে থাকে, যেন একটা দুঃখের পাথর। আর তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

Scanned by CamScanner

সারা গায়ে একই পরিমাণ ব্যথা ভার আর ক্লান্তি। একদিন দুদিন নয় ... পঁচিশটা বছর ...।

পঁচিশটা বছর ধরে এই পাশব অত্যাচার—আমার শরীর এখন বিশ্লিষ্ট।

আর কত দুঃখের যৌতুক চাও আমার কাছে, হে আমার অমেয় জীবন!

ডাক্তাররা বলেন (আমিও জানি) এই অসুখের কারণ বাংলাদেশের আবহাওয়া, এখানকার গুমট ভাপসা জলবায়ু। বাতাস আর্দ্র হয়ে উঠলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। শরীরটাকে মনে হয় একটা আহত জন্তুর মতো ভারী আর নিষ্ক্রিয়।

এ রোগের আরোগ্য নেই। সব চিকিৎসাই মোটামুটি শেষ।

কষ্টে কয়েকবার আত্মহত্যার ইচ্ছায় ভুগেছি। এখন ক্লান্ত।

জীবনের বাকি দিনগুলোয় এই কষ্টই আমার নিয়তি।

আমার হৃদয় দেশপ্রেমিক, আমার শরীর দেশের বিরুদ্ধে। এ কালের প্রায় সব বাঙালির মতোই আমার অবস্থা। আমার বাঁচার একমাত্র পথ বাংলাদেশ ত্যাগ ; কোনো দূরদেশের শুকনো আবহাওয়ায় চলে যাওয়া।

হে আমার প্রিয় মাতৃভূমি, আমার কর্তব্য বলে দাও।

৩০.৯.৮৮

১৮২

দুটো জায়গায় আমাদের প্রতিভা একেবারে লক্ষ্যভেদী : পরশ্রীকাতরতায় আর পরস্ত্রীকাতরতায়।

১০.১০.৮৮

১৮৩

কোনো দেশ যখন নতুন টাকা ছাপে তখন ওই টাকার বিপরীতে বিশেষ পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত রাখতে হয়। নইলে ওই টাকা কাগজ হয়ে যায়। প্রতিটা কথার বিপরীতেও তেমনি দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সমপরিমাণ কাজের পৃথিবী। নইলে ওই কথা কেবলই 'আওয়াজ'।

১৫.১০.৮৮

১৮৪

ওহে সলিমুল্লাহ, তোমরা যারা তরুণ, মৃত্যুকে অনুভব কর আমাদের চেয়ে বেশি, কিন্তু চেন অনেক কম ...

১৬.১০.৮৮

Scanned by CamScanner

১৮৫

সকলে একজোট হয়ে হাত লাগানোয় উত্তরার বাড়িটা অলৌকিকভাবে শেষ হয়ে গেল। নিজের বলতে একটা কড়িও ব্যয় করা হয় নি, প্রতিটা ইটই বন্ধকের।

কোনোদিনই বাড়িটাতে থাকা হবে না। বড়জোর সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে করতে পথচারীদের ডেকে বলা যাবে : শুনেছেন, বাড়িটা কিন্তু আমার।

বাড়িটার একটা ছোট্ট নাম রেখেছি মনে মনে : 'সুরঞ্জনা'। কেন্দ্রের গেটের পাশের ছোট্ট সুন্দর ঘরটার নামও তাই। ভেবেছিলাম একটা ছোট্ট সাদা পাথরের ওপর নামটা লিখে নিচে রাবীন্দ্রিক কায়দায় চার লাইনের একটা পদ্য লিখে রাখব :

"আমাদের ছোট মেয়েটির নাম রঞ্জনা,
বড় মেয়েটির স্নিগ্ধ নাম নীলাঞ্জনা,
আমাদের নাম কে—ই—বা এখন শুনতে চায়,
আমাদের বাড়ি ছোট্ট, নাম 'সুরঞ্জনা'।"

পদ্যটা পাথরের ওপর আজো লেখা হয় নি, কোনোদিন হবেও না। আপাতত এই সাদা কাগজেই থাক।

৮.৫.৮৯

১৮৬

হায় প্রিয় 'কেন্দ্র,' এত দাঁড় বাইলাম, কিছুই কাজে এল না। এত বিরুদ্ধতা উজিয়ে কী করে এগোব? সবকিছুই ভবিষ্যৎহীন—শেষ পর্যন্ত মীর্জা গালিবের সেই শূন্যতারই মতো :

প্রিয়তমাকে হয়তো পেয়েই যেতে গালিব
আর ক'টা দিন যদি শুধু বেঁচে থাকতে পারতে ;

* * *

প্রিয়তমার সঙ্গে মিলন ভাগ্যে ছিল না,
যদি আরো বেঁচে থাকতাম, ওই প্রতীক্ষাই চলত।

৫.৬.৮৯

১৮৭

প্রগতিশীলেরা আমাকে রটায় প্রতিক্রিয়ার স্যাঙাৎ বলে, প্রতিক্রিয়াশীলেরা বলে প্রগতিবাদীদের দালাল। ধর্মান্ধেরা চিৎকার করে চলেছে 'নাস্তিক' বলে। কেউ যদি রাস্তার পাশে খুন করে ফেলে রেখে যায়, কেউ বুঝতেই পারবে না কারা খুন করেছে।

৮.৬.৮৯

Scanned by CamScanner

১৮৮

রোজ রোজ চর্ব্যচোষ্য মেলে না।

প্রতিদিন যা দিয়ে আমাদের জীবন বাঁচে তার নাম ভাত।

প্রতিদিন যাকে নিয়ে আমাদের ঘর সাজাতে হয় তার নাম বউ।

৩.৮.৮৯

১৮৯

জ্ঞান মতবাদনিরপেক্ষ। মতবাদসাপেক্ষ হচ্ছে জ্ঞানের ব্যবহার।

১৮.১০.৮৯

১৯০

সকালে লুনা বলল : 'আব্বু বিকেলে আমাকে একটু আসমাদের বাড়িতে দিয়ে আসবে?' শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। বললাম, 'এতদূর যেতে হবে!'

লুনা (চোখ নাচিয়ে) : 'বাবার দায়িত্ব একটু কোরো–টোরো! একেবারে ফাঁকি দিয়েই জীবনটা পার করে দিলে যে!'

২১.১০.৮৯

১৯১

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আর উৎপলা সেন (স্বামী–স্ত্রী) কিছুদিন আগে ঢাকা ঘুরে গেলেন। একসময় কী মিষ্টি কণ্ঠ ছিল দুজনারই। সতীনাথের গানে ছিল বিষাদমাখা মধুর নিঃসঙ্গতা। আমাদের যৌবনের দিনগুলোয় প্রতিটা বাঙালির হৃদয়কে তাঁর গানে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিলেন তিনি! অনবদ্য সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারিণী উৎপলার 'ঝিকমিক জোনাকির দীপ জ্বলে শিয়রে' গানটার মতো অনেক স্নিগ্ধ গানের মাধুর্য এখনো মনে লেগে আছে।

সেদিন টেলিভিশনে তাঁদের দেখলাম। ঔৎসুক্য নিয়ে তাঁদের গান শুনতে বসেছিলাম—আমার যৌবনের কিংবদন্তির নায়ক–নায়িকার সামনে একটা নতজানু স্মৃতির মতো। গান শুরু হতেই টের পেলাম আমাদের সেই লোকশ্রুত রাজপুত্র–রাজকন্যা এখন বার্ধক্য–বিস্রস্ত। উৎপলা এখন ৬৫, সতীনাথ ৭০ বা তারও কিছু বেশি। উৎপলার কণ্ঠ এখনো সব শেষ হয়ে যায় নি, কিন্তু সতীনাথ একেবারেই জরাগ্রস্ত—যেন ভালো করে চারপাশের সবকিছু ঠিকমতো বুঝতেও পারছেন না। কিছুতেই লয় ঠিক রাখতে পারছিলেন না সতীনাথ, তবলচীকে প্রায় বিব্রত অবস্থায় তাঁর ব্যর্থতাকে অনুসরণ করতে হচ্ছিল। বয়সের ভারে সবকিছুই

Scanned by CamScanner

যেন জড়িয়ে গেছে। দুজনারই গানের সেইসব সূক্ষ্ম মিষ্টি অসাধারণ কারুকাজগুলোই শুধু হারিয়ে গেছে—যে অলৌকিক জিনিসগুলোই ছিল তাঁদের সঙ্গীতের অনির্বচনীয়তম মাধুরী। হাত নেড়ে মাথা জোরে ঝাঁকিয়ে অক্ষম গলায় সতীনাথ বৃথাই তাঁর এককালের সেই সোনালি জরির মতো কারুকাজগুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন তাঁর গানের মধ্যে—শিল্পের অনির্বচনীয়তার সামনে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত আর হাস্যকর। পৃথিবীতে 'আবার' বলে কিছু নেই।

১৯২

কিছুদিন আগে একজন তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক আমাকে জানালেন জনাব আ. শ. তাঁকে নাকি বলেছেন যে আমি সি. আই. এ-র (আমেরিকান) এজেন্ট। এসব কথাবার্তা আমরা রাস্তার সাধারণ লোকদের কাছ থেকে শুনতে ও উপেক্ষা করতেই অভ্যস্ত। কিন্তু জনাব আ. শ. দেশের অতি প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার অন্যতম পুরোধা এবং দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের একজন প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। সুতরাং কথাটা শুনে হতচকিত হতে হল।

এর কয়েকদিন পর এমন আরেকজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হল যাঁকে ওই একই কথা জনাব আ. শ. বলেছেন।

সপ্তাহখানেক আগে একজন নাট্যকারের কাছ থেকে পাওয়া গেল আরো খানিকটা বাড়তি খবর। তাঁকে জনাব আ. শ. জানিয়েছেন এ ব্যাপারে তাঁর হাতে নাকি সুনির্দিষ্ট দলিল আছে। জনাব আ. শ. আমার তরুণ বয়সের শিক্ষক। তাঁর মতাদর্শকে গ্রহণ করতে না পারলেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি আমি চিরকালই সশ্রদ্ধ। এই শ্রদ্ধা তিনি যোগ্যতা দিয়েই পেয়েছেন। তাঁর আবেগে অপরিণতি এবং চিন্তায় অতিসরলতা থাকলেও তাঁর মধ্যে এমন একজন প্রবল এবং বলিষ্ঠ মানুষ বর্তমান যিনি তরুণচিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারেন। ক্রমে তাঁর উজ্জ্বল চিন্তাভাবনা আমার বিশ্বাসের জগৎকে বিপুলভাবে ওলটপালট করে দিতে শুরু করে। কোনো কথা বলার সময় তিনি তা এমন জোরের সঙ্গে বলতেন যে তাঁর বক্তব্য, সাময়িকভাবে হলেও, সত্যি এবং অভ্রান্ত বলে মনে হত।

তখন আমার জীবনের প্রথম আত্ম-অন্বেষণের সময়। অল্পদিনের মধ্যেই আমি টের পেলাম আমাদের পথ পরস্পরের থেকে আলাদা। আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করতে লাগলাম যে সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের তিনি চরিত্রহননে মেতে ওঠেন এবং বিভিন্ন সময়ে অনেকের প্রশংসা করেন অবোধগম্য কারণে। আমার মনে হত মানুষের বিশ্বাস ভালোবাসার প্রতি অবিশ্বাসী একজন নেতিবাচক মানুষ তিনি—যিনি জীবনের কোনো পর্বে তাঁর ওপরে অনুষ্ঠিত কোনো অযৌক্তিক ও অসন্তোষজনক অবিচারের নির্মম প্রতিশোধ খুঁজছেন।

Scanned by CamScanner

আগেই বলেছি তিনি তাঁর কথাগুলোকে এমন শক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করতেন যে সেই বয়সের বুদ্ধি বা যুক্তিসক্ষমতার সামান্য পুঁজি দিয়ে তা খণ্ডন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত, অথচ হৃদয়ের অন্তস্তলে আমি তা মেনে নিতেও পারতাম না। আমার হৃদয় তাঁর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করল এবং আমি তাঁর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এরই এক অগ্রবর্তী পর্যায়ে আমি একদিন তাঁর ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা আটকিয়ে, অসহায়ের মতো চিৎকার করে তাঁকে অনুরোধ করলাম আমাদের মতো সরল বিশ্বাসপ্রিয় তরুণদের সামনে জীবন সম্বন্ধে এইসব মোহহীন নিষ্ঠুর নেতিবাচক কথা না বলতে। আমাদের বিশ্বাসের শক্তিকে এভাবে নষ্ট না করে দিতে। আমি চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি যে মানুষের সঙ্গে মানুষের শক্তিমান মতপার্থক্যই মানুষের মূল শক্তি। কিন্তু এদেশে প্রায় কেউই কোনো কিছুকে মতবাদের স্তরে নিতে চায় না। সবকিছুকেই নিয়ে বসে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তিনিও তাই করলেন। তাঁর সঙ্গে আমার দৃষ্টির ভিন্নতাকে তিনি আমার ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় হিসেবে ধরে নিলেন। প্রথমদিকে আমার সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিলেন তিনি। তারপর মেহনতি মানুষের কল্যাণের পক্ষ থেকে আমার প্রতিটি কাজকে গণবিরোধী আখ্যা দিয়ে চললেন। সবশেষে এই সি. আই. এ এজেন্টের অভিযোগ। আজ জনাব আ. শ—র বয়স সাতষট্টি বছর। এ বয়সের একজন দায়িত্বশীল পরিণত মানুষ তাঁরই পরিপার্শ্বের একজন মানুষ এবং এককালের ছাত্র সম্বন্ধে এমন একটা মারাত্মক অভিযোগ তুলে যাচ্ছেন ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে—এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে? আমি জানি আমি যদি তাঁকে প্রকাশ্যে এই বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে বলি তবে তিনি সবার সামনে একজন মিথ্যাচারী হিসেবে প্রমাণিত হয়ে যাবেন অথচ কথাটা একজন মানুষের নামে কত অনায়াসে বলে ফেলতে পারছেন। যা আমাকে সবচেয়ে দুঃখ দিচ্ছে তা হচ্ছে—তাঁর মতো এমন একজন শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ এমন একটা অপপ্রচারে নামবার আগে একবার ভেবেও দেখলেন না যে কথাগুলো রটাবার আগে পরীক্ষা-অনুসন্ধান করে এই বিষয়ে অন্তত কিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে নেওয়া তাঁর উচিত!

আর কতকাল নিজেদের ছুরিতে আমরা এভাবে নিজেরা খুন হতে থাকব, হে আমার জন্মভূমি!

১৯৮৮

১৯৩

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় গড়ে তোলা হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। কেন্দ্রগুলোকে গড়ে তোলা হচ্ছে এক একটা উন্নত পরিবারের মতো করে—বড় স্বপ্নে, উদ্যমে, বড় জীবনের আবেগে স্পন্দমান একটা ঋদ্ধ জগতের আদলে।

Scanned by CamScanner

এখানে সভ্যেরা একই সঙ্গে পাচ্ছে দুটো জিনিস : এক, শ্রেষ্ঠ বই পড়ার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর উচ্চায়ত মানুষদের জীবন ও চিত্তের সঙ্গে নিরন্তর বসবাসের সুযোগ ; দুই, মানসিক বিকাশের উপযোগী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। এসবের পাশাপাশি নানান বিচিত্র সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা আর আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠার এমন সুবিধা তারা পাচ্ছে যাতে জীবনের একটা বড় স্বপ্নের সামনে তারা দাঁড়িয়ে যেতে পারে। একটা অনুভূতিশীল হৃদয়কে, জীবনের সূচনামুহূর্তে, এমনি একটা বড় স্বপ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারাটাই বড় কথা। বাকিটা সে নিজেই পারে। যেসব রকেটকে চাঁদে পাঠানো হয় সেগুলোকে পৃথিবী থেকে বাইরে পাঠানোর জন্য একবারই একটা জোর উৎক্ষেপণের দরকার ; এরপর সে নিজেই চলে যায়। চাঁদকে যদি আমরা 'সব পেয়েছি'র প্রতীক ধরে নিই তা হলে বলা যায় আমাদের জীবনকে 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছোনোর জন্যে আমাদেরকে জীবনের সজীব প্রভাতে এমনি একটা বড় উজ্জীবনে জাগিয়ে দেওয়া জরুরি।

আমাদের কিশোর-তরুণদের চিত্তের এই ছোট্ট জাগৃতিটুকুই আমাদের লক্ষ্য। সারাজীবন তাদের পেছনে লেগে থেকে একটা দাসের জীবনে তাদের নিক্ষিপ্ত করে লাভ নেই। এর পাশাপাশি আরো একটা চেষ্টা আছে আমাদের। আজ সারাদেশে সবচেয়ে শক্তিশালী সংঘবদ্ধতা হচ্ছে অশুভের সংঘবদ্ধতা। আমাদের চেষ্টা কীভাবে দেশের শুভ মানুষদের সংঘবদ্ধ করা যায়—তাদেরকে জ্বলিত করতে পারা যায় একটা শক্তিশালী জাতীয় শক্তি হিসেবে।

পাঁচটা দুষ্ট ছেলে একখানে হলেও তো তারা খুঁজে বেড়ায় কার গাছে কচি ডাব ফলেছে, কীভাবে সেগুলো আয়ত্ত করা যাবে। আর আমরা সারাদেশে ভালো ছেলেমেয়েদের এই যে দলের পর দল গড়ে তুলছি—বড় স্বপ্নে, বড় জীবনাগ্রহে উদ্বুদ্ধ সব দল—একটা দুটো নয়, শত শত—এদের সবার মিলিত উদ্যম, আর পিপাসা—এসব কি শুধু পথের ধুলোয় হারিয়ে যাবার জন্যে?

১৯৮৯

১৯৪

যাকে ক্লেদাক্ত করতে পারায় অকথ্যতম সুখ, সেই কি আমাদের প্রিয়তম?

১৯৫

দিনকয় আগে গোপালগঞ্জ থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন কেন্দ্রে। ভদ্রলোক যেমন রসিক তেমন ধারালো আর আমুদে। কথায় গল্পে রসের ভিয়েন দিয়ে আসরটাকে একেবারে জমজমাট করে রাখলেন। ভদ্রলোক স্কুল শিক্ষক। নানান ধরনের গল্পের ফাঁকে একটা মজার গল্প শোনালেন তিনি।

Scanned by CamScanner

একজন বড় গোছের আমলা এসেছিলেন তাঁদের স্কুলে। তাঁর প্রসঙ্গ তুলে ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন : "তা আমাদের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের দাপটে আমরা তো কেঁইপেই সারা। আজকালকার স্কুল-কলেজের মান যে কোথায় নেইমেছে এ নিয়ে বক্তৃতা করেই তিনি কাটায়ে দেলেন ঘণ্টাখানেক। এমনভাবে সবকিছু তুলোধোনা করতি লাগলেন যে আমরা যে আমাদের ইশকুল আর আমাদের নিজেদের নিয়ে কোথায় লুকোবো ভেবেই পাই নে। দুঃখ কত্তি কত্তি একসময় বললেন, কী যে হয়ে গেছে আজকালকার ইশকুল-কলেজের অবস্থা। আমাদের ছেলেবেলায়—সেই ব্রিটিশ আমলে—কী দেখিছি আর এখন কী! বলতি বলতি শেষে বড় একখানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হায়রে, কোন্ পথ দিয়ে চলে গেলেন আমাদের ছেলেবেলার সেইসব আদর্শ শিক্ষকেরা, সেইসব মহান শিক্ষকেরা।

আমি আর থাকতি পাল্লাম না, বললাম, আমি কিন্তু বইলে দিতি পারি স্যার, কোন্ পথ দিয়ে তাঁরা গেছেন।

একটা স্কুল-মাস্টার বলবে কোন্ পথ দিয়ে সেই মহান শিক্ষকেরা গেছেন! এই কি ভাবা যায়! ঘপ করে বলে ওঠলেন, পারবেন, বলতি পারবেন, বলেন তো কোন্পথ দিয়ে তারা গেছেন। আমি আর দেরি করলাম না। সাথে সাথে বইলে ফ্যাললাম, যে পথ দিয়ে চলে গেছেন সেকালের বাঘা বাঘা জজ হাকিমেরা, জাঁদরেল ম্যাজিস্ট্রেটরা, বড় বড় অফিসারেরা—তাঁরাও সেই পথ দিয়েই চলে গেছেন, স্যার।

শুনে স্যারের মুখখানা দপ করে গম্ভীর হয়ে গেল। হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন, 'আপনার হিসাবের খাতাটা আনেন তো। ভালো কইরে দেখতি হবে।' সবাই লুকায়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি কত্তি লাগল।"

এমনি করে একের পর এক গল্প করে ভদ্রলোক অনেক রাতে বিদায় নিলেন। মনে হল, কত অনায়াসে এই জাতির সার্বিক অবক্ষয়টাকে তুলে ধরলেন ভদ্রলোক। জজ হোক, হাকিম হোক, শিক্ষক অধ্যাপক হোক, খাদ্য বা আবগারি অফিসের লোক হোক—যেই হোক, বাঙালি তো! চলে গিয়ে থাকলে কি আর আলাদা রাস্তা দিয়ে গেছেন!

এমনি এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল আরেকবার—বছর পাঁচ-ছয় আগে। কেন্দ্রের ছেলেদের নিয়ে সাইকেল ভ্রমণে বেরিয়েছি। দিন কয়েকের যাত্রা। তৃতীয় দিনে রাত প্রায় দশটার দিকে আমরা একটা প্রাইমারি ইশকুলের বারান্দায় রাতের আশ্রয় নিলাম। বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁর স্কুল। আমাদের ছেলেরা স্কুলের বারান্দায় বাক্স-প্যাটরা রেখে মাঠের পাশে চুলো জ্বালিয়ে রান্নার আয়োজনে লেগে গেল। চুলোর আগুনে কালো রাতটা লাল হয়ে উঠল। আচমকা এই প্রত্যন্ত এলাকায় এতগুলো শহুরে লোকজন দেখে গাঁয়ের লোকেরা কৌতূহলী হয়ে ভিড় জমাল।

Scanned by CamScanner

তারপর যথারীতি নানান জেরা : কোথা থেকে আসছি, কেন সাইকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সাইকেলে ঘুরে কী হয়—এইসব।

গেঁয়ো মানুষের ভিড়ে একজন লোকের সপ্রতিভ কথাবার্তায় সচকিত হতে হল। লোকটার চেহারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট। পরনে ছেঁড়া শার্ট আর লুঙ্গি, চোখের নিচে কালি। দৃষ্টি উপবাস-আতুর। কিন্তু প্রতিটা কথায় যেন তলোয়ারের ঝিলিক। এমন ক্ষুরধার কথাবার্তা তার যে অবাক না হয়ে পারছিলাম না। তার কথার ধারালো সরস মন্তব্যে আর ব্যঙ্গবিদ্রূপে দমকে দমকে হেসে উঠতে লাগল আমাদের ছেলেরা। কথায় বোঝা যায়, লোকটার লেখাপড়া সামান্য—সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে খুবজোর। আমাদেরকে এভাবে ইচ্ছামতো খেলাতে পেরে লোকটাও যেন খানিকটা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। কথার ধার তার ক্রমেই বেড়ে চলল। এক পর্যায়ে সপ্রশংসভাবে বলেই ফেললাম, 'আপনার বুদ্ধি তো ভাই বেশ চমৎকার!' আমার কথা শেষ না হতেই উত্তর দিয়ে বসল সে। কী প্রশ্ন আর কী উত্তর!

বলে উঠল, "প্রেসিডেন্ট হই নি বলে বুদ্ধিও প্রেসিডেন্টের চেয়ে কম হবে নাকি?" আবার সবার দম-ফাটা হাসি।

হকচকিয়ে গেলাম। কী বলে লোকটা! কিছুতেই বুঝি না যে গাল-বসা, ছেঁড়া জামা-পরা এই তুচ্ছ লোকটার বুদ্ধির আলোচনায় দেশের প্রেসিডেন্টের প্রসঙ্গ আসে কী করে। একটু প্রকৃতিস্থ হতেই টের পেলাম কত সহজে সে ছোট্ট একটা কথায় আমাদের জাতির দুটো বড় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : এ দেশের কোনো মানুষ—এমনকি তুচ্ছতম মানুষটা পর্যন্ত কখনো কোনোকালে নিজেকে কারো চেয়ে—হোক না সে প্রেসিডেন্ট—এক ইঞ্চি কম ভাবতে কতটা নারাজ!

দ্বিতীয়ত : কী করে আশ্চর্যভাবে সে টের পেয়ে গেছে দেশের প্রেসিডেন্টগুলো অন্তত তার চেয়ে নির্বোধ।

২২.৫.৯০

১৯৬

উনিশ শ আশি সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। কেন্দ্রের পিকনিকে ছেলেদের সঙ্গে সাইকেল ভ্রমণের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। একটানা দু সপ্তাহের সাইকেল ভ্রমণের প্রস্তাব কানে যেতেই কাছাকাছি একজনের কান খাড়া হয়ে উঠল। ছেলেটা স্বাস্থ্যবান, কিন্তু সাহস দুঃখজনকভাবে স্বাস্থ্যবিরোধী। ভ্রমণের সম্ভাব্য ফূর্তিতে সবাই হইচই তুলতেই ভয়-পাওয়া গলায় সে বলে উঠল : 'স্যার এতগুলো দিন একটানা সাইকেল চালাবেন, কষ্ট হবে না?' সবাই হল্লা করে উঠল, 'আরে কষ্টই তো আনন্দ! কষ্ট না হলে অ্যাডভেঞ্চার কিসের?' এবার তার জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্ব :

Scanned by CamScanner

'ধরুন স্যার, সারাটা দিন সাইকেলই না-হয় চালালেন, কিন্তু সন্ধ্যার সময় থাকবেন কোথায়?'

'কেন, একটা ইশকুল-টিশকুল দেখে উঠে পড়ব। নিদেনপক্ষে এলাকার চেয়ারম্যান -মেম্বার কারো বাড়িটাড়ি... ।'

'কিন্তু স্যার, সেখানে কত রকমের পোকা ... আ...মাক...অ...ড়...। ধৈর্য রাখা অসম্ভব হল। বলে উঠলাম, শাবাশ বীরপুরুষ, আজ থেকে তোমার নাম দেওয়া যাক 'পোকামাকড়'। কেমন খুশি তো? ছেলেমেয়েরা হল্লা করে সমর্থন জানাল।

এরপর থেকে ছেলেমেয়েরা 'পোকামাকড়' বলে ওকে দিনরাত এমনি উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে দিল যে বেচারি দিনকয়েকের মধ্যেই কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেল। এমনি 'পোকামাকড়' আমাদের চারপাশে শতকে-হাজারে নয়, লাখে কোটিতে।

এই ফাঁকে আরেকটা 'পোকামাকড়ে'র গল্প মনে পড়ছে। ছেলেটা একসময় ঢাকা কলেজে আমার ছাত্র ছিল, হঠাৎ একদিন কেন্দ্রে এসে উপস্থিত।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর ঘরে আমাকে একা পেতেই হঠাৎ নিচু হয়ে খপ করে পা চেপে ধরল।

—স্যার, আপনাকে গুরুর মতো মনে হয়। আপনাকে 'গুরু' ডাকতে চাই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কী একটা অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা তখন যাচ্ছেতাই ব্যস্ত। হাতে কয়েক শ নিমন্ত্রণপত্র, দিন দুয়েকের মধ্যে নিমন্ত্রিতদের হাতে পৌঁছোতে হবে।

বললাম, 'গুরুগিরির ব্যবসা এখনো ধরি নি, তবে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে গিয়ে এই ছ'সাতটা চিঠি যদি ঠিক ঠিক লোকের হাতে দিয়ে আসতে পার তো আবেদন বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।'

আমার প্রস্তাব শুনতেই শিষ্যের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন কোথায় স্যার?'

গাঢ় কণ্ঠস্বরে সুগভীর ভীতি।

'কেন, পুরোনো ঢাকায়!'

'পুরোনো ঢাকায় কী করে যেতে হয়, স্যার!'

জায়গাটার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে চেষ্টা করলাম।

'কিন্তু আমি তো কখনো যাই নি স্যার।'

'যাও নি বলেই তো যাওয়া হবে, চিনবে।'

'আমি বোধহয় যেতে পারব না স্যার!'

কণ্ঠস্বরে করুণ অসহায়তা। আর সহ্য করা দায়। শিষ্যের পরিণতির চেয়ে নিজের গুরুগিরির ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নে।

আমাদের অধিকাংশ মানুষ যে আজ প্রায় কিছুই করতে পারছে না সেটা ততখানি আশঙ্কা নয়। আসল আশঙ্কা, তারা যে করতে পারবে এ কথাটুকুকেও বিশ্বাস করতে পারছে না বলে।

Scanned by CamScanner

দিনকয় আগে কেন্দ্রের একটা মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মেয়েটা একাদশ শ্রেণীর, কেন্দ্রে ওদেরকে 'প্লেটোর সংলাপ' বইটা পড়তে হয়। কথায় কথায় সক্রেটিসের প্রসঙ্গ উঠতেই সে সক্রেটিসের অনমনীয় নৈতিক শক্তির প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম, "সক্রেটিসের মতো ওভাবে অন্যায়ের সামনে দাঁড়াতে পারবে?"

প্রশ্ন শুনেই বঙ্গললনার চোখ সাদা হয়ে গেল। ভীতিবিহ্বল স্বরে বলল, 'আমি কী করে পারব, স্যার!"

গলার স্বরে সারা পৃথিবীর অসহায়তা।

বললাম, "কেউ কি গরম লাল শিক দিয়ে তোমার কপালে বড় বড় করে লিখে দিয়েছে : "তুমি পারবে না।"

হায়, কেন সে কিছুতেই পারার কথা ভাবতে পারছে না। আমরা যা ভাবি আমরা তো তাই হয়ে যাই।

আর হে অবিশ্বাসী মেয়ে, কী করে তুমি জানলে তুমি বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি নও। আজ না হোক, পাঁচ হাজার দশ হাজার বছর পরে মানুষের পৃথিবী তোমাকে ওই নামে ডাকবে না, কে তোমাকে বলেছে।

১.৯.৯০

১৯৭

জীবনের অস্তায়মান সময়ে একটা কথা ভেবে কেবলই কষ্ট হচ্ছে : অনেক কিছু লেখার কথা ছিল, প্রায় কিছু না লিখেই সব শেষ হচ্ছে।

কেবলই মনে হচ্ছে : আমি লেখক হবার জন্যে জন্মেছিলাম, অন্য কাজ করে বিদায় নিলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সবসময় মস্তিষ্কের ভেতরে লিখেই গেছি শুধু, দায়িত্বের চাপ সেগুলো কাগজের ওপর লিখে যাবার সময় দিল না।

একসঙ্গে আমি একের বেশি কাজ করতে পারি না। কোনো কাজ করার সময় তার সর্বগ্রাসী উত্তেজনা আমার অস্বস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে এমন দস্যুর মতো অধিকার করে বসে যে আমার চৈতন্য থেকে বাকি পৃথিবীটা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আমি একেশ্বরবাদী ; আমি একসঙ্গে কেবল এক জনের কাছেই নতজানু হতে জানি। বড় মানুষেরা একসঙ্গে অনেক পারেন, ক্ষমতা অপরিমেয় বলে। আমাদের শক্তি সীমিত, এক আধটা কাজেই আমাদের পুঁজি ফুরিয়ে যায়।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কী উপায়? আমাদের—যারা কেবল 'চলনসই পদ্য লিখি'।

'বেরিয়েছিলাম হাজার বাগান দেখার বাসনা নিয়ে—একটা গোলাপের পাশেই জীবন শেষ হয়ে গেল।'

১.১০.৯০

Scanned by CamScanner

১৯৮

দিনকয় আগে সকালবেলায় একটা টেলিফোন এল। রিসিভার তুলতেই ওধার থেকে জেগে উঠল অনেকগুলো ছেলেমেয়ের বুকভাঙা কান্নার শব্দ—কোনো বাড়িতে মা মারা যাবার সময়, আর কোনোদিন কিছুতেই তিনি ফিরবেন না টের পেয়ে, ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে যেভাবে বুকভাঙা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে সেই রকম। উৎকণ্ঠিত হয়ে বারে বারে জানতে চাইলাম কী ব্যাপার ! যে ফোন করেছিল সে রহস্যজনকভাবে রিসিভারটা আগের জায়গায় আবার রেখে দিল। আবার সব নিঃশব্দ। মুহূর্তের জন্যে যে মৃত্যুব্যথিত পৃথিবী জেগে উঠেছিল চোখের সামনে সেখান থেকে আবার নিজের ঘরে চারধারের সুস্থ সজীব বাস্তবতায় ফিরে এলাম। না, ভয় নেই। এক মুহূর্তের মিথ্যা দুঃস্বপ্ন উৎরে সবকিছু আবার নির্ঝঞ্ঝাট বাস্তবে ফিরে এসেছে। বোঝা গেল ক্রস্‌-কানেকশন। অন্য কোনো টেলিফোনের লাইন এসে চড়াও হয়েছিল আমাদের ওপর। রোশনার কাছেও গল্পটা সঙ্গে সঙ্গেই বললাম। আমার কথা শেষ হয় নি, আবার বেজে উঠল সেই অনিবার্য টেলিফোন। এবারে কিন্তু নিষ্কৃতিহীন শুনতে হল সেই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ। টাঙ্গাইলে মিনিট দশেক আগে আমার ছোট বোন মিকুর মৃত্যুর খবর।

অনেক কষ্ট নিয়ে ও অল্পবয়সে জীবন থেকে বিদায় নিল। পৃথিবীর কোনোখান থেকে কিছুই প্রায় পায় নি ও। কেউ কিছুই দেয় নি ওকে। জীবন ওকে জন্মের পর থেকেই বঞ্চিত করে এসেছে। জন্মের বছরখানেক পর পোলিও হয়ে ওর একটা হাত আর একটা পা অংশত পঙ্গু হয়ে যায়। তারপর সারাটা জীবন সেই নির্জীব বিষণ্ন হাত-পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে জীবন কাটাল। আড়াই বছর বয়েসে হারিয়েছে মাকে। সারা জীবন আর্থিক অনটন আর প্রচণ্ড পরিশ্রম করে দম আটকানো অশান্তি নিয়ে জীবন কাটিয়েছে ও। যে ছেলেমেয়ে দুটোকে গাঢ় মমতায় আঁকড়ে ধরে শেষ অব্দি বাঁচার চেষ্টা করেছিল সেখানেও ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতার উপলব্ধি জীবনের ব্যাপারে আরো বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল ওকে। এর ওপর পিত্তের ব্যথা, রক্তচাপ, আলসার আর হাঁপানিতে ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে এসেছিল ওর অদমিত জীবনাকাঙ্ক্ষা। সবচেয়ে দুঃখের কথা হল, আমার অনুরোধে চিকিৎসার জন্য আমার বাসায় আসার প্রস্তুতিও নিয়েছিল মৃত্যুর আগের দিন। ব্যাগে সবকিছু গুছিয়ে তৈরিও হয়েছিল পরদিন সকালে রওনা হবে বলে। (কাপড়চোপড় গোছানো সেই রংচটা ব্যাগটা আমি টাঙ্গাইলে পৌঁছেই ওর বিছানার ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম)। যতদূর জানতে পেরেছি কী একটা ব্যাপার নিয়ে রাত এগারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে উত্তপ্ত তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাঁটির পরিণামে ওর রক্তচাপ অস্বাভাবিকরকমে বেড়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল হাঁপানিজনিত নিশ্বাসের কষ্ট আর অক্সিজেনের স্বল্পতা। ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া আক্রান্ত হয়ে যায়। বাতাসের অভাবে একসময়

Scanned by CamScanner

বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ও। সামান্য একটু নিশ্বাসের জন্য পাগলের মতো উথালপাতাল করতে থাকে। নিশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে আসছে দেখে দিশাহারার মতো ট্যাবলেটের পর ট্যাবলেট খেতে শুরু করে আর ক্রমাগত ইনহেলার দিয়ে শ্বাসনালীতে স্প্রে করে চলে। কিন্তু প্রাণপণে নিশ্বাস টেনেও সারা পৃথিবীতে এক ফোঁটা বাতাস খুঁজে পায় নি মিকু। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নীল হয়ে বিছানার ওপর পড়ে ও শেষ হয়ে যায়।

ওর মৃত্যুমুহূর্তে আমার এক ভাগনি ছিল ওর পাশে। মিকুর শরীরের খারাপ অবস্থা দেখে ভাগনীটা নিজেই ওর কাছে এসে থাকছিল কিছুদিন থেকে। মরার ঠিক আগের মুহূর্তে মিকু ওকে বলেছিল, 'তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি অনেকদিন। আমাকে মাফ করে দিস।' মৃত্যুর সময় ওর ছেলেমেয়ে–স্বামী পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিল। আমার ভাগনী ছুটে গিয়ে ওর স্বামীকে বলেছিল, 'খালা মরে যাচ্ছে। একটু অক্সিজেনের ব্যবস্থা করুন!' কথাগুলো বলার আগেই মিকু চলে গেছে।

আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে ও ছিল খুবই ব্যতিক্রমী। সুরেলা, আবেগময়, জীবনমুখর আর বন্য প্রাণশক্তির অধিকারী। একটা দুরতিক্রম্য শারীরিক অক্ষমতা নিয়েও সবার অবহেলা–উপহাসের ওপর দিয়ে ও এক–এক করে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক হয়ে দর্শনে এম, এ পাস করেছিল। বিয়ে করেছিল প্রেম করে। সম্পূর্ণ একক শক্তি দিয়ে প্রচণ্ডভাবে জীবনকে আক্রমণ করেছিল। নিয়তি চারপাশ থেকে অলঙ্ঘ্য হয়ে দেখা দিলে দুর্জয় হতাশা নিয়ে চলে এসেছিল লেখার জগতে—অনুবাদে। সম্পূর্ণ একা, সাহায্যহীন, নিঃসঙ্গ। ভালো ইংরেজি জানত না ও, অমানুষিক পরিশ্রমে অভিধান থেকে শব্দার্থ দেখে দেখে অনুবাদের মধ্যে একটানা ব্যস্ত হয়ে থাকত ঘরকন্নার পর দিনরাত্রির সমস্ত সময়টুকু। সময় ফুরিয়ে আসার ব্যাপারটা ও যেন অন্তর্চেতনায় টের পেয়ে গিয়েছিল, তাই হয়তো এমন অপ্রকৃতিস্থের মতো কাজের মধ্যে জেগে থাকত সারাক্ষণ। আয়ারল্যান্ডের রূপকথা, সোমারসেট মমের গল্প, আজটেক সভ্যতার মহাকাব্য প্রপোলভু–এর অনুবাদ শেষ না করতেই আমাদের কাছে এই দুঃসংবাদ।

মিকুর জন্যে কিছুই করতে পারি নি, আজ সেই কথা মনে হলে ফিরে ফিরে আত্মগ্লানি জাগে। কতদিন মিকু সামান্য একটু সাহায্যের জন্যে ভিখিরির মতো কাতরে কাতরে ফিরে গেছে, ব্যস্ততার জন্যে কিছুই করতে পারি নি। নিতান্তই সামান্য একটু সাহায্য—হয়তো অনুবাদটা কেমন হচ্ছে দু'মিনিট দেখে দেওয়া, কোন্ গল্প অনুবাদ করবে সে–সম্বন্ধে এক আধটু উপদেশ, লেখা ছাপার ব্যাপারে কাউকে এক আধটু তদবির—এমনি নেহাতই ছোটখাটো দুয়েকটা টুকিটাকি। বারবার নিষ্ফল জেনেও আমার কাছে ছুটে আসত। ডান পা'টা ঘসটাতে ঘসটাতে সিঁড়ি বেয়ে আমাদের বাসার দরজায় এসে ঘণ্টা বাজাত—সিঁড়ি বেয়ে ওর হেঁটে আসার শব্দ শুনেই বুঝতে পারতাম ও আসছে।

Scanned by CamScanner

আমার মা'র কবর টাঙ্গাইল শহরের পাশেই, করটিয়াতে। করটিয়া কলেজের নিজস্ব গোরস্তানে। মায়ের মৃত্যুর সময় আব্বা ছিলেন করটিয়া কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। মিকুর মৃত্যুর সময়ও ওর স্বামী ছিল ঠিক তাই। মিলটা আশ্চর্য। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল যাবার পথে করটিয়া কলেজে পৌঁছোবার জায়গাটার ডান দিকে চোখ ফেরালেই নির্জন মাঠের মধ্যে শান্ত ছোট্ট একটা গোরস্তানে আমার মায়ের লাল কবরটা চোখে পড়ে। পঁয়তাল্লিশটা বছর ধরে মাঠের মাঝখানকার উঁচু সবুজ জায়গাটায় মার লাল কবরটা রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে একটা নিঃসঙ্গ বড় রক্তগোলাপের মতো ফুটে আছে। কবরের গায় শ্বেতপাথরের ডানদিকে সেকেলে ভঙ্গিতে লেখা আব্বার একটা বিমর্ষ কবিতা :

বেগম করিমউন্নিসা

নবজাত শিশু রাখি চরণকমলে
মহানিদ্রাবৃতা তুমি এ শূন্যপ্রান্তরে,
ভুলি পুত্র–কন্যা–স্বামী, সোনার সংসার ;
হে কল্যাণী, সেবাদাসী, দুর্গত জননী,
পুণ্যশীলা, হাস্যময়ী, তরঙ্গচঞ্চলা,
সুগন্ধকুসুম প্রাণ, চির–আত্মভোলা,
নারীকুল শিরোমণি, হে আনন্দ প্রিয়া,
জেন্নাতের দ্বার মুক্ত তব প্রতীক্ষায় !

আমার সবচেয়ে ছোট ভাই হবার সময় মা মারা গিয়েছিলেন। ভাইটিও মারা গিয়েছিল একই দিনে। দিনের পর সন্ধ্যা নেমে এলে যখন সমস্ত জায়গাটা অপার্থিব পবিত্রতায় নিমগ্ন আর বিষণ্ন হয়ে আসে তখন কখনোসখনো কলেজের দু'চার জন নির্জন ছাত্র হাঁটতে হাঁটতে কদাচিৎ এই কবরটার পাশে দাঁড়িয়ে প্রস্তরফলকের ওপর খোদাই করা এই কবিতাটা পড়ে আর এর গাঢ় বেদনাটুকু টের পায়। আর তারপর এই কলেজের একদা খ্যাতিমান একজন অধ্যাপকের ব্যক্তিগত নিঃস্বতা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আবার নিজ নিজ ছাত্রাবাসে ফিরে যায়—হয়তো অনেকদিন পর্যন্ত তাদের মনে স্ত্রী–সন্তান ফেলে–যাওয়া এই মহিলার কথা কাজের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয়। অনেকের মুখেই শুনেছি কথাগুলো। এমনিভাবে চলে আসছে ব্যাপারটা এই এলাকায় অনেকদিন থেকেই। আজ এতদিন পরে এই কলেজের আর একজন ইংরেজির অধ্যাপকের স্ত্রী, মিকু, মেহের নিগার, স্বামী–সন্তান ফেলে একই জায়গায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় একইভাবে শুয়ে রইল। শ্বেতপাথরের ওপর কবিতার ঠিক বাঁ পাশেই লেখা আছে মার ছেলেমেয়েদের কথা, আমাদের সবার ছোট বলে মিকুর নাম সবার নিচে। সেই মিকুই আমাদের সবার আগে চলে গেল।

Scanned by CamScanner

যার যাবার কথা ছিল সবার শেষে, সে-ই সবার আগে গেল। কয়েক মাস ধরেই মিকু নাকি আশপাশের সবার কাছে কেবলই বলত মৃত্যুর পরে মার কবরের পাশেই যেন ওর কবর দেওয়া হয়। মনে আছে মার মুখ থেকেও ছেলেবেলায় তাঁর মৃত্যুর আগে ফিরে ফিরে এমনি শুধু মৃত্যুর কথা শুনতাম। জানি না কোন্‌টা সত্যি? মানুষ তার মৃত্যুর কথা সহজাত অনুভবের ভেতর থেকে নিজের অজান্তেই এমনিভাবে টের পেয়ে যায় নাকি আজীবন প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুকে এমনিভাবে অনুভব করে, যার কোনো এক মুহূর্তে তার মৃত্যু ঘটে। আমার ধারণা, সত্যি আসলে দ্বিতীয়টাই অথচ আমরা প্রথমটার কথাই কেবল ফিরে ফিরে তুলে ধরতে চাই—হয়তো জীবনের মধ্যে অলৌকিকের দ্যোতনাকে বাড়িয়ে তুলে জীবনকে বড় করে দেখতে চাই বলেই।

প্রত্যাবর্তনকে অসম্ভব করে তুলে মৃত্যু সামান্যকে অপ্রাপনীয় করে দেয়। মারা যাবার পাঁচ সাত দিন আগে মিকু হঠাৎ টাঙ্গাইল থেকে আমাকে ফোন করেছিল। হয়তো আমার লিভারের অসুখ সম্বন্ধে কোনো খারাপ সংবাদ পেয়েছিল কারো কাছ থেকে। ফোন তুলতেই বলল : কেমন আছেন?

বললাম, ভালো। তুই কেমন?

ওর গলার স্বরে কেমন একটা অর্থশূন্যতা। বলল, আমাদের মতো মানুষদের বেঁচে থাকা না-থাকায় কী এসে যায়। আপনারা কত কাজ করেন। পৃথিবীতে আপনাদের বেঁচে থাকা দরকার। আপনার অসুখের কথা শুনলে দুশ্চিন্তা হয়। ওর কথা শুনে চুপ করে থাকলাম। কী করে বোঝাই, সামান্য বা শ্রেয়ের পার্থক্য আমাদের কাছে আছে, মৃত্যুর কাছে নেই।

ওদের বাসায় পৌঁছে পাড়াপড়শীদের একটা ছোটখাটো ভিড় দেখতে পেলাম। ওর স্বামীর জনকয় পরিচিত সহকর্মীকেও চোখে পড়ল ভিড়ের মধ্যে। সবাই কমবেশি শোকবিহ্বল। দু'এক জনের চোখের কোনায় পানি চিকচিক করছে। আমার ভাগনিটা তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, আমাদের দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল।

ওদের বাসার মাঝখানকার ঘরের ওপর মিকু নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে ছিল। কিছুদিন আগে টাঙ্গাইলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখা খুলতে এসে এই ঘরে আমরা অনেকে মিলে হইহল্লা করে গেছি। আমি আসব জেনে আধা পঙ্গু ডান হাতটা দিয়ে সারাদিনের চেষ্টায় হরেকরকম খাবার রান্না করেছিল মিকু। আমাকে নিয়ে মিকুর একটা গর্বের ভাব ছিল। ওদের বাসায় যাবার কথা থাকলে পাড়ার লোকদের জানিয়ে ঘরে ঘরে সংবাদ পাঠিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসত ও। যে ঘরে কয়েকদিন আগে আমরা সবাই মিলে হইচই করেছি আর সবাইকে মিকু সাধ্যমতো খাবার পরিবেশন করেছে, সে ঘরের মেঝেতে ঠিক সেই জায়গাতেই, মিকু এখন শক্ত টানটান হয়ে শুয়ে আছে। ওর ঘরটা নানারকম পুরুষ-মহিলায়

Scanned by CamScanner

ভরা। একজন উদ্যোগী স্থানীয় মহিলাকে দেখা গেল, শেষকৃত্যের নানান কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের সবাইকে কাঁদতে দেখে নির্বিকার উঁচু গলায় ধর্মীয় দার্শনিকতার কথা দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন : আপনারা বুঝমান হইয়া কান্দেন ক্যান। যার জিনিস সে নিয়ে গেছে। এখন কাঁদলে কি পাইবেন, ইত্যাদি। আমাদের কান্না যে কেন, সে তা বুঝবে না।

নানান ধরনের লোক বাড়িতে এল-গেল। মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা নিয়ে কিছু লোককে সারাদিন কর্মব্যস্ত হয়ে থাকতে দেখলাম। গোরখোদকদের খবর দেওয়া থেকে শুরু করে বাঁশ-চাটাই কেনা, ট্রাকভাড়া, গোসল, কাফন—ইত্যাকার তাবৎ বাস্তব কাজগুলোকে এঁরা এমন নির্বিকার দায়িত্ববোধের সঙ্গে করে যেতে লাগলেন যে তাঁদের দেখে মনেই হয় না মৃত্যুর মতো একটা এত বড় বেদনাদায়ক ব্যাপার এই বাড়িতে ঘটেছে। তাঁদের ভাবটা এমন যে মৃত্যুর মতোন একটা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এত হইচই করার কী আছে। বরং এসব জোলো ভাবালুতা রেখে জীবনকে ক্লেদমুক্ত এবং সতেজ রাখার দরকারি দায়িত্বেই সবার নিবেদিত থাকা উচিত এবং তাঁরা তাই করছেন। এই লোকগুলো আমাদের থেকে একটু আলাদা জাতের। জীবনে প্রত্যেকটা মৃত্যুবাসরে এমনি বেশকিছু নিরাবেগ যোগাড়ে এবং দায়িত্বশীল লোককে আমি দেখেছি।

পাড়া-প্রতিবেশীরা একে একে লাশ দেখা শেষ করেই যে যার মতো নিজেদের মধ্যে নানান বিষয়ে গুনগুন করে কথা শুরু করে দিলেন। মৃত্যু নিয়ে বেশিক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকার সময় নেই কারো। কেউ কেউ এগিয়ে এসে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা, এমনি নানান বিষয় নিয়ে আমাকেও প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আমি যে একজন মৃত্যুব্যথিত মানুষ—কথাটা যেন এঁরা বেমালুম ভুলেই গেছেন। ভুলে না গেলেও মনে রাখতেও খুব একটা যেন আগ্রহী নন কেউ। এক ফাঁকে এক ভদ্রলোক আমাকে কাছে পাওয়ার সুযোগটা হাতিয়েই নিলেন পুরোপুরি—মন্ত্রণালয়ের একজন উঁচুদরের আমলার কাছে তাঁর চাকরির বদলিসংক্রান্ত তদবিরের অনুরোধটা পেড়েই ফেললেন। না, মৃত্যুকে—তা সে যত বড় বা বেদনাদায়কই হোক—কেউ একখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে নারাজ। তাই হয়তো সংসারের স্রোত, দরকারের স্রোত, অস্তিত্বের স্রোত মৃত্যুকে হটিয়ে দিয়ে জীবনকে জয়ী করে রাখতে পারে।

গোসল করানোর পর সকলকে দেখবার জন্যে মিকুর মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নেওয়া হল। আশ্চর্য পবিত্র লাগছিল ওকে। মিকুর মুখে কষ্টের কোনো চিহ্ন নেই। শেষ অভিনয়টা ভালোই করে গেল মিকু। মনে হচ্ছিল জীবনভর অনেক কষ্ট আর যন্ত্রণার পর নিষ্পাপ শিশুর মতো ঘুমুচ্ছে। লুনা কাঁদো কাঁদো গলায় আমাকে বলল, 'কী সুন্দর হয়ে গিয়েছে...।' আমিও তাই ভাবছিলাম, চুপ করে ওর কথা শুনলাম।

Scanned by CamScanner

মিকুর স্বামী চিরদিনই একটু নির্লিপ্ত স্বভাবের মানুষ। নিরাসক্ত, নিঃসঙ্গ, আর মানুষের সংসারে কেমন একটু বহিরাগত।

সারাটা দিন ওর বরকে চিরাচরিতের মতোই নির্বিকার আর একাকী দেখাল। একেকবার ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছিল এ বাড়িতে যে একটা মৃত্যু ঘটেছে খবরটা তাঁর আদৌ জানা আছে কি না। নিরাসক্ত চোখে দূর থেকে উনি সবার কাজকর্ম দেখে যাচ্ছিলেন। একসময় একটা ক্যামেরা যোগাড় করে এনে মিকুর মৃত মুখের একটা ছবি তুললেন। তাঁকে দেখে একেক সময় মনে হচ্ছিল যেন এদেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অপরিচিত কোনো বিদেশী পর্যটক—আমাদের দেশে কারো মৃত্যু হলে কী কী আনুষ্ঠানিকতা করা হয়, নির্বিকার নিবিষ্ট চোখে তা দেখে নিচ্ছেন।

মিকুর ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। ওর শেষ ইচ্ছামতো মার কবরের সঙ্গেই ওর কবর হয়েছে। এখানে 'ভাগ্য ভালো' কথাটা হয়তো সেই পরিচিত হাসির গল্পটার কথাই মনে করিয়ে দেবে—সেই গল্পটার কথা—যাতে চিবুকে সাপের কামড় খেয়ে একজন লোক মারা গেছে শুনে আরেকজন দুঃখিত পথচারী স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠেছিল : তবু 'ভাগ্য' যে চোখটা বেঁচে গেছে। যে মানুষ আজ সব সুখ-দুঃখের অতীত তার কাছে পৃথিবীর কোথায় কোন্ প্রান্তে তাকে কীভাবে শুইয়ে রাখা হল, সম্মানে না অনাদরে, ভালোবেসে না উপেক্ষায়—এসবের কী অর্থ? ওসব তো আমাদের অনুভূতি, আমরা যারা বেঁচে আছি, তাদের!

একটা ভাড়া-করা ট্রাকে তুলে মিকুর মৃতদেহটাকে নিয়ে আমরা কবরস্থানের দিকে চললাম। গোরস্তানে যাবার আগে করটিয়া কলেজের মসজিদের সামনে ওর লাশ নামানো হল, দ্বিতীয়বার জানাজা পড়াবার জন্য। মসজিদের ইমাম মাইকে আশপাশের ছাত্রাবাসগুলোর উদ্দেশ্যে জানাজায় যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানাতে লাগলেন। স্পষ্ট মনে আছে, পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আমার মায়ের জানাজাও হয়েছিল ঠিক এমনিভাবেই, এই জায়গাটা থেকে একটু দূরে, কলেজসংলগ্ন ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তার ডানদিকের মাঠে। অনেক মানুষ হয়েছিল তাঁর জানাজায়। মিকুর জানাজাতেও হয়তো আসবে অনেকে। কেবল এই অসম্পৃক্ত ভেদাভেদহীন মানুষগুলো বুঝতে পারবে না এই কলেজের একজন ইংরেজির অধ্যাপকের এই অপরিচিত অখ্যাত স্ত্রীটি—যার জানাজার জন্যে এই মুহূর্তে সবাইকে ডাকা হচ্ছে, আর যার মুখ কাফনের সাদা কাপড়ের নিচে চির অপরিচিত হয়ে গেছে একটা দিনের মধ্যে—সে এই মুহূর্তে আমাদেরকে কীভাবে নিঃস্ব করে গেছে।

মসজিদের মাইকটা নষ্ট থাকায় ইমাম সাহেবের অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে গলার স্বর বা বক্তব্য কেউ খুব একটা বুঝতে পারছে বলে মনে হল না। তা ছাড়া কলেজ বন্ধ থাকায় কলেজ বা হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অপ্রতুল ছিল। তবু মুখে মুখে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় বেশকিছু ছাত্র-শিক্ষক এসে জড়ো হলেন জানাজায়। প্রায়

Scanned by CamScanner

সবাই কখন কী অসুখে মৃত্যু হয়েছে জেনে এই অকালমৃত্যুর জন্যে সমবেদনা জানালেন। অনেকেই কখন কবে শেষবার মিকুকে দেখেছে সেই কথা তুলে মৃত্যুর সর্বজয়ী শক্তি নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

ওর কবরটা খোঁড়া হয়েছিল বেশ যত্ন করে। সকাল থেকে জনকয় গোরখোদক পরিপাটি করে কবরটা খুঁড়েছিল। এমনি একটা কবর যে তাদের প্রত্যেকেরও বিধিলিপি—ব্যাপারটাকে তারা এমনি নির্বিকার সহজভাবে ভুলে আছে যে দেখলে অবাক লাগে। এত পরিচ্ছন্ন আর নিখুঁতভাবে কবরটাকে খোঁড়া হয়েছে যে মৃত্যুকেও একটা পবিত্র কিছু বলে মনে হতে চায়। বড় ভাই হিসেবে মিকুকে কবরে নামাবার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ওপরেই পড়ল। আমার সঙ্গে আরো দুজন সহযোগী ছিল। আমরা মিকুকে ধর্মীয় প্রথা মেনে কবরে নামিয়ে দিলাম।

নিজের হাতে এতদিনের ছোট্ট বোনটাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে ফিরে এলাম আমি। মিকুর কবরের মধ্যে শান্তি, পবিত্রতা আর নিঃসীম অন্ধকার। কেবলই মনে হচ্ছিল আমিও যদি ওই কবরের ভেতর ওর মতো শুয়ে থাকতে পারতাম ঠিক ওইভাবে—কোনোদিন উঠতে হবে না জেনে।

মিকুর বর কবরের মধ্যে এক মুঠো মাটি ফেলতেই উপস্থিত লোকজন বিরামহীন নির্দয়ভাবে মাটি ফেলে ওর কবর ভরে তুলতে লাগল। দেখতে দেখতে মিকু চিরদিনের জন্য চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কাফনের কাপড় সরিয়ে হলেও ওর মুখ দেখার সুযোগ ছিল, এখন তাও শেষ হয়ে গেল। আর কোনোদিন কেনোভাবেই ওকে দেখা যাবে না। গোরখোদকেরা কবরের ওপর উঁচু আর পরিপাটি করে মাটি বিছিয়ে দিলে আমরা কবরের ওপর খেজুরের ডাল পুঁতে টাঙ্গাইলে ফিরে এলাম। ফেরার পথে লুনা বিলাপের মতো বারবার বলতে লাগল, 'একটা দিনের মধ্যে ফুফু কোথায় চলে গেল আব্বু!' আমার সঙ্গে গোরস্তানে গিয়েছিল ও। দুদিন ধরে কাঁদতে কাঁদতে বারে বারে কেবল বলে গেল, 'মিকু ফুফুকে তোমরা কোথায় রেখে এলে! কী নির্জন কবর! কী ঠাণ্ডা—অন্ধকার! মিকু ফুফু এখন ওখানে শুয়ে থাকবে!' সবার চোখের পানি থেমে গেছে, ওর চোখের পানি এখনো থামে নি। লুনার মধ্যে শিল্পীর হৃদয় আছে, ও গান গায়। সবাই জীবনকে ভুলে যায়, শিল্পীরা মনে রেখে দেয়।

জানি না মিকুর বর আবার বিয়ে করবে কি না। হয়তো খুব বেশিদিন পার হতে পারবে না—পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজনেরা ওঁর কাছে ওঁর ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার কথা তুলে ধরে ওঁর ভেতরকার চাপা-পড়া অপরিপূর্ণ মানুষটাকে আবার জাগিয়ে তুলতে শুরু করবে। হয়তো ওঁর একাকিত্ব আর দুঃখ-কষ্টের কথা ওঁকে ফিরে ফিরে স্মরণ করাবে, ভবিষ্যৎ একাকিত্বের করুণতর দিনগুলোর কষ্টদায়ক ছবি তুলে ধরবে চোখের সামনে। কিছু কিছু পাড়া-প্রতিবেশী হয়তো বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতে শুরু করবে গুটি গুটি—ওঁর এই দুঃখপূর্ণ জীবন থেকে

Scanned by CamScanner

মুক্তির সম্ভাবনার একমাত্র উজ্জ্বল উদ্ধার হিসেবে। ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে ধরবে। হয়তো আস্তে আস্তে ওঁর প্রতিরোধের দেয়াল একদিন ভেঙে পড়বে—অস্তিত্বের ভেতর থেকে গভীরতর জীবনাগ্রহ ক্ষুধার্ত জাগুয়ারের মতো জেগে উঠে ওঁর বাইরের সব প্রতিবাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

যা ঘটার তাই ঘটুক। এক নদীতে মানুষ দুবার গোসল করে না। জীবন, যে যাই বলুক, শেষ পর্যন্ত, অবিশ্রাম। তার প্রতিটা সচল হিংস্রতায় সূর্যকরোজ্জ্বলতার দীপ্তি।

সন্ধ্যার পর গাড়িতে করে ঢাকার পথে রওনা হলাম। পথে করটিয়া কলেজ পেরিয়ে গাড়ির সবাই প্রাণপণে বাঁ দিকের মাঠের মধ্যে মিকুর কবরটা আঁতিপাঁতি করে খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নির্জন কালো বিশাল একটা অন্ধকার তুলকালাম বৃষ্টির মতো সারা আকাশ জুড়ে নেমে এসে ততক্ষণে কয়েক ঘণ্টা আগের আমাদের পরিচিত পৃথিবীটাকে দিকচিহ্নহীনতার মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়েছে। চারপাশের দুর্ভেদ্য কালো রাত্রির মধ্যে মিকুর কবরটা ততক্ষণে এক টুকরো ভেদাভেদহীন কালো অন্ধকার।

১৫.১০.৯০

১৯৯

যে তোমাকে তার বিত্তের কথা বলে সে তোমার শরীরকে চায়, যে নিঃস্বতার কথা জানায় সে হৃদয়কে।

২৩.১০.৯০

২০০

আসহাবউদ্দীন আহমদ আমাদের কলেজের প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর মতো শ্রেয়বোধসম্পন্ন অবিচল সুন্দর মানুষ জীবনে অল্পই দেখেছি। মাঝখানে কয়েক মাস আমাদের কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। শারীরিক মানসিকভাবে সতেজ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আসহাব সাহেব সারা কলেজে তাকিয়ে দেখার মতোন একজন মানুষ ছিলেন। বছরখানেক আগে বেঁচে থাকার গভীরতম আস্বাদ এবং তৃপ্তিতে আমাকে বলেছিলেন, জানেন, আমার মনে হয়, আমি কোনোদিন মরব না। আসহাব সাহেব জানতেন না যখন তিনি কথাগুলো বলছিলেন তখন ক্যান্সারের গভীর আক্রমণ তাঁর জীবকোষে জীবকোষে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

আমাদের ভরা বসন্তের পরিপূর্ণ দিনগুলোই কি আমাদের বিদায় নেবার সময়?

অসুখে অসুখে ক্লিষ্ট বিস্রস্ত শরীরে আসহাব সাহেব হয়তো এই মুহূর্তে জীবনের দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। গত পনের দিন ধরে প্রতিদিনই তাঁকে দেখতে যাবার কথা ভাবছি। তিনি কলেজের ভেতরেই থাকেন, আমাকেও প্রতিদিন কলেজে যেতে হয়। তবু নানা কাজের চাপে তাঁকে দেখতে যাওয়া হয়

Scanned by CamScanner

নি। আমি জানি 'কাজের চাপ' কথাটা আসলে না-যেতে-চাওয়ার একটা সুপরিকল্পিত চতুর অজুহাত মাত্র। সমস্যাটা আসলে অবচেতন মনের কোনো রহস্যময় অন্তর্নির্দেশের ভেতর থেকে জেগে-ওঠা। যে মানুষটি সেদিন পর্যন্ত চোখের সামনে এমন দীপান্বিত হয়ে জ্বলে ছিলেন, এই ক্লিষ্ট বিশ্লিষ্ট চেহারায় তাঁকে দেখতে চাওয়ার স্নায়বিক অক্ষমতাই হয়তো 'কাজের চাপ' এই কথাটার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে চলেছে।

১৯৯১

২০১

একজন সাংবাদিক (মাহমুদ শফিক) সেদিন বললেন, আপনার প্রতিষ্ঠান আপনার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে আছে—এটা ঠিক হচ্ছে না। সৃষ্টি স্রষ্টার চেয়ে বড় হতে পারে না। পৃথিবীতে যে সবচেয়ে শক্তিশালী সে সবচেয়ে বড় নাও হতে পারে। দেশের প্রধান সেনাপতি দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ, কিন্তু সবচেয়ে বড় নয়। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে যে আলোর পৃথিবী রয়েছে তা তার নেই। আপনার চারপাশে আলোর সেই বৃত্ত কোথায়? বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আপনার ভাবমূর্তি এখনো জাতীয়ভাবে প্রদীপ্ত নয়। শিক্ষক, সাহিত্য সংগঠক বা টিভি ব্যক্তিত্ব—এসবকে পিছে ফেলে এই কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে আপনার পরিচয় দেশের মানুষের কাছে এখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। কেন্দ্রের স্রষ্টা হিসেবে আপনার প্রচারের ব্যাপকতা কেন এত কম? সৃষ্টি তো স্রষ্টার অংশ। সে কেন আপনার চেয়ে বড় হয়ে থাকবে? প্রতিষ্ঠানের দুঃখে বিপর্যয়ে এত বড় একটা জিনিসকে বাঁচাবে কে? কেন্দ্রের স্বার্থেই কেন্দ্রের চেয়ে আপনার বড় হয়ে ওঠা দরকার।

আমি জানি, দেশের পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে প্রতিটা প্রচার মাধ্যমের জগতে আমার যতটুকু ব্যক্তিগত পদচারণা রয়েছে তাতে কেন্দ্র এবং তার ভাবমূর্তিকে জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। তা হলে কেন তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখার এত সচেতন চেষ্টা?

কার লেখায় যেন পড়েছিলাম বাঙালিরা জন্মায় নিঃশব্দে, বেঁচে থাকে নিঃশব্দে, বড় হয় নিঃশব্দে। কথাটা পড়ে অবাক লেগেছিল। নিঃশব্দে বড় হয় এ কেমন কথা? খ্যাতি আর নৈঃশব্দ্য তো পরস্পরবিরোধী। পরে বুঝেছি হয়—আর কোথাও না হোক অন্তত এদেশে হয়। ভালো কিছু করতে গেলে এমনকি বিখ্যাত হতে গেলেও লুকিয়ে নিঃশব্দে সবার অজান্তে চোরের মতোই তা হতে হয় এদেশে। বিদেশে ফুটবল খেলায় গোল করার পর কিংবা অভাবনীয় কোনো ক্রীড়ানৈপুণ্যে সাফল্য দেখানোর পর চারপাশের লক্ষ লক্ষ ভক্তের মুহুর্মুহুঃ করতালির ভেতর যেভাবে খেলোয়াড়েরা আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠে হাত ছুঁড়ে

Scanned by CamScanner

বিজয় গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করে এদেশে সেটা সম্ভব নয়। এখানে খারাপ কাজই কেবল বুক ফুলিয়ে করা যায়, ভালো কিছু নয়। এদেশে যে কোনো সাফল্যের চেহারাই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের মতো। সাফল্যের অপরাধে নতজানু আর গলবস্ত্র হয়ে সবার সামনে বিনীতভাবে এখানে বলতে হয়, 'মূঢ় আমি, নির্বোধ আমি, সর্বতোভাবে বোধশক্তিহীন। কোনো যোগ্যতা নেই। যতটুকু সাফল্য হয়েছে তা নেহাতই আপনাদের দয়ায়। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন।' এ কথা বলতে পারলে তবেই কেবল এদেশে স্বীকৃতি। কোটি কোটি ব্যর্থ আর হীনম্মন্যতাক্লিষ্ট মানুষের এই দেশে কোনো সাফল্যকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দিত করার ইতিহাস বিরল হওয়ারই কথা।

এদেশে মানুষ উৎভূমিক (Vertical) উন্নতিতে বিশ্বাস করে না। পরিপার্শ্বের সঙ্গে নির্মম যুদ্ধে জিতে কেউ নিজেকে সামান্য সোজা করে একটু দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে তো সবার চোখ পড়ে যাবে সেদিকে :

'মাথাটা যেন একটু উঁচু উঁচু দেখা যায়। পালিশ কইরা দিতে হয় তাইলে।'

স্যাঙাৎরা সম্মতি জানিয়ে ঘন ঘন ঘাড় নাড়ে।

প্রথম থেকেই টের পেয়েছিলাম এদেশে ভালো কিছু করতে হলে করতে হবে অজান্তে, অলক্ষ্যে। তার বিকাশ খাড়া বা উৎভূমিক (Vertical) হলে চলবে না, হতে হবে সমতলধর্মী, আড়াআড়ি (horizontal)। নিঃশব্দ সাফল্যই এদেশের একমাত্র শর্ত। এই জন্যই রাজধানীর ছোট পরিসরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে উঁচু করে তৈরির চেষ্টা করি নি। একই জিনিসকে সারাদেশে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় একটা উঁচু মনুমেন্ট গড়ে তোলার চেয়ে সারাদেশকে ছোট ছোট তুলসীতলার অজস্র প্রদীপে ভরে দেওয়া ভালো। চারপাশের হাজার হাজার ঈর্ষা আর শত্রুতার ক্ষিপ্র চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমাদের এগোতে হচ্ছে, হবে। সাংবাদিককে বললাম, পত্রপত্রিকা বেতার টেলিভিশনে বা ওই জাতের অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে আমাদের মতো আলোকপ্রত্যাশী একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা উচিত নয়। ওই অকর্ষিত প্রচার মাধ্যমগুলো পণ্যকে জলুস দিতে পারে, মানুষের অমেয় চেতনাকে নয়। যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আমাদের পরিচয়কে সারা দেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাকে হতে হবে আরো সূক্ষ্ম, সতর্ক, গভীর, ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি। আমাদের কর্মসূচিগুলোর ভেতর দিয়ে সারাদেশে যেসব হাজার হাজার আলোকিত চিত্ত আজ চিন্ময় বিকাশের দিকে পাপড়ি মেলছে তাদের সবার উজ্জীবিত জিহ্বাই একদিন আমাদের ঈপ্সিত প্রচার মাধ্যম হয়ে জাতির কাছে কথা বলবে।

১৯৯১

Scanned by CamScanner

তৃতীয় পর্ব
[১৯৯৪-৯৮]

Scanned by CamScanner

২০২

পৃথিবীতে প্রথম যেদিন সাইকেল রাস্তায় নেমেছিল, সেদিন, কল্পনা করা যায়, দুটো চাকার ওপর জলজ্যান্ত একজন মানুষকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসতে দেখে কীভাবে অবাক হয়ে গিয়েছিল পথচারীরা। হয়তো পথ ছেড়ে দৌড়ে পালিয়েছিল অনেকে, ভীতিবিহ্বল চোখে চেয়ে দেখেছিল সেই যন্ত্রযানটির আশ্চর্য সব কাজকারবার।

আমি যখন স্কুলের ছাত্র তখন আমার দাদার এক বন্ধুর কাছ থেকে তাঁর প্রথম রেলগাড়ি দেখার গল্প শুনেছিলাম। তখন তিনি দশ-এগারো বছরের কিশোর। ট্রেনের কথা অবিশ্যি এর অনেক আগেই কানে এসেছিল তাঁর, কিন্তু চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন হঠাৎ করেই—পাড়াগাঁ থেকে শহরে যাবার পথে। চোখের সামনে হঠাৎ সেই বিশাল ট্রেনটাকে দানবের মতো গর্জন করে ছুটে আসতে দেখে তিনি ভয় পাওয়া প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের মতো রেললাইন ছেড়ে চিৎকার করতে করতে দৌড় দিয়েছিলেন—ট্রেনটাকে তাঁর মনে হয়েছিল যেন রূপকথার অতিকায় কোনো দৈত্য, তাকে গিলে খাবার জন্যেই ছুটে আসছে। এরপরে জীবনের যতবারই তিনি ট্রেন দেখেছেন ততবারই ওই অমানুষিক ভয় তাঁকে অস্বস্ত করে তুলেছে।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রতিটা উদ্ভাবনই মানুষকে ফিরে ফিরে এভাবে বিস্রস্ত করেছে। প্রথম যেদিন মানুষ একটা ছোট্ট সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়েছে, একটা আস্ত বিশাল মানুষবোঝাই জাহাজকে চোখের সামনে দিয়ে আকাশে উড়ে যেতে দেখেছে, সেদিনকার ভীতিবিহ্বল মানুষের রোমাঞ্চকর ও অভূতপূর্ব বিস্ময়ের পরিমাণ আজকে অনুভব করা সহজ নয়। আজ কিন্তু এ সবকিছুই মানুষের অতি পরিচিত ঘটনা, সাধারণ, গা-সওয়া, পুরোপুরি সাদামাঠা ব্যাপার।

ঢাকায় যখন প্রথম টেলিভিশন এল, মনে আছে, তখন এর হতবাক-করা কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা সবাই কী অভিভূতই না হয়েছিলাম। যে আমি নিজে ওই টেলিভিশনের পরদায় অনুষ্ঠান করতাম, সেই আমারও বিস্ময়ের শেষ ছিল না। অনুষ্ঠান তখন শুরু হত সন্ধ্যা ছ'টায়। ঘরে ঘরে সবাই ঠিক সেই সময় টিভির সামনে এসে বসত, রাত সাড়ে এগারোটায় জাতীয় সঙ্গীত শুনে তবে ক্ষান্তি। কিন্তু বেশিদিন এভাবে যেতে পারে নি, বিস্ময়ের সেই প্রাথমিক আলোড়নের মৃত্যু ঘটেছে কিছুকালের মধ্যেই। টেলিভিশন হয়ে এসেছে 'মাঝেমধ্যে দেখার জিনিস'। এরপর ভিসিআর আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই উত্তেজনা। আজ তাও আটপৌরে। এরপর ডিশ এ্যান্টেনা-কেবল টিভি—চোখের সামনে সারা পৃথিবীর টিভি দেখার সুবিধা। কিন্তু কোথায় সেই অলৌকিক শিহরন।

Scanned by CamScanner

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাজার হাজার সব অভাবনীয় বিস্ময়কর আবিষ্কার, কত অনায়াসে একসময় তুচ্ছ হয়ে যায় মানুষের কাছে।

মানুষ যে এ সব কিছুর চেয়ে বড় এটা তারই প্রমাণ।

২০৩

প্রতিক্রিয়াশীলতার সুবিধা দুটো : তার সামনে যাবার জায়গা নেই, পেছনে যাবার দরকার নেই।

২০৪

আঠার শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের শেষ—এই সময় পরিসরে, ইউরোপ জুড়ে রেনেসাঁসের জোয়ার যখন উপচে পড়ছে—সেই সময়ে, এদেশে ইংরেজ আধিপত্যের হাত ধরে ব্যবসায়ী রাজকর্মচারীদের সঙ্গে রেনেসাঁর আদর্শে উজ্জীবিত অনেক মানুষ এসে হাজির হয়েছিল শহর কলকাতায়। কলকাতার নির্মীয়মাণ পথঘাট সেদিন তাদের পদপাতে সচকিত ছিল।

সেকালের আত্মোন্নতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হিন্দুরা এই মানুষদেরকে তাঁদের চোখের সামনে দেখেছিলেন। তাঁরা তাঁদের সমান হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই বড় হওয়াকে তাঁরা জীবনের সর্বোচ্চ মহিমা বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। তাঁদের এই আর্তি ব্যর্থ হয় নি। বিদ্যাসাগর মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সেই সমাজে অনেক ঋদ্ধ মানুষের উত্থান ঘটেছিল সেই সময়ে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এমন সব দীপ্তি প্রতিভাত হয়েছিল যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলোর রাজপথেই কেবল চোখে পড়ে।

পরবর্তীতে, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, মুসলমানেরা যখন আত্মজাগৃতির পথে পা বাড়ালেন তখন তাঁদের স্বপ্ন ছিল ওইসব জাগ্রত ও সমৃদ্ধ হিন্দুদের সমকক্ষ হওয়া। তাঁদের সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয় নি। মীর মশাররফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী নজরুল ইসলাম, এ কে ফজলুল হক, জয়নুল আবেদীন, কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতো মানুষ থেকে শুরু করে অনেক সম্পন্ন মানুষ জন্মেছিলেন তাঁদের ভেতর—ওই প্রতিযোগিতার পথ ধরে?

কিন্তু আজ আমাদের সামনে কে বড়? কার সঙ্গে প্রতিযোগিতা? নিজেদের নিঃস্বতা ছাড়া কে আজ প্রতিদ্বন্দ্বী?

২০৫

কাউকে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে আমরা আসলে যে মানুষটাকে রিক্ত করে বসি সে তো আমি।

Scanned by CamScanner

২০৬

চেখভের গল্প প্রথম পড়েছিলাম, পঁচিশ বছর বয়সে, ইংরেজিতে। এবার পড়া হল বাংলায়, কেন্দ্রের প্রকাশনা বিভাগের দরকারে—সম্পাদনার দায়বদ্ধতার কারণে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে।

বুঝতে পারছি না কেন গল্পগুলো এমন প্রবল শক্তিতে আমার অন্তর্জগৎকে তছনছ করে দিল।

আমার ভেতরকার আগের মানুষটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেন জন্ম নিল একটা নতুন মানুষ। সারা জীবন মানুষকে যেভাবে দেখেছি, তার থেকে আলাদা চোখে যেন তাদের দেখতে পেলাম।

তাঁর গল্প পড়ে কেবলই মনে হচ্ছে, মানুষ এত দুঃখী! এত মমতা দিয়ে মানুষকে দেখা যায়। চেখভ আমাকে ক্ষমা করতে শেখালেন।

কেন এমন লাগল এবার? ইংরেজির বদলে মাতৃভাষায় বেশি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম বলে? বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়া হল তাই? বয়স আর অভিজ্ঞতায় বোঝার শক্তি বেড়েছে বলে? নাকি চেখভ মানেই এই, ঠিকমতো পড়লে এমনটাই হবে।

২০৭

জন্মের পর থেকে মিত্রা আমাদের এখানেই আছে। দিনকয়েক আগে চার মাসে পড়ল। জন্মের চার-পাঁচ দিনের মধ্যে, চাউনির ঘোলাটে ভাবটা কেটে যাওয়ার পরই উজ্জ্বল সপ্রতিভভাবে তাকাতে শুরু করেছিল ও। ওর ঝকঝকে চাউনিটা ছিল ওর জন্মেরই সমবয়সী। ও জন্ম নেবার আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের বন্ধু মাহবুবুর রব সাদী হাসপাতালে ওকে দেখে এসে তাঁর স্বভাবসুলভ সিলেটি ভঙ্গিতে বলেছিলেন, "দ্যাখে এ্যালাম আপনার নাতনিকে, সবাইকে প্রফেসারের মতো ধমকাচ্ছে।" কেউ কাছে এসে দাঁড়ালে ও এমনভাবে হেসে তাকাবে যেন ভিতরকার সব জারিজুরি ধরে ফেলে হাসছে।

সারা বাড়ির জন্য ও হয়ে উঠেছে এক অপার্থিব তৃপ্তির উৎস। স্বভাবটাও বেশ দিলখোলা আর আমুদে—সারাক্ষণ ওর ফুটফুটে মুখটা হাসিতে ভরে থাকে। কেউ ওর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেই ওর চোখমুখ খুশিতে জ্বলে ওঠে, আর আকাশের দিকে জোরে জোরে হাত পা ছুঁড়ে, সারা শরীর নাড়িয়ে, বড় বড় পাপড়িওয়ালা চোখের আশ্চর্য ফুলগুলোকে খুশিতে ফুটিয়ে হাসতে থাকে। ওর চাউনি উজ্জ্বল কিন্তু কোথাও বাড়তি চালাকি নেই। বড় বড় চোখ জুড়ে বিনম্র মাধুরী। তাকানোর ভঙ্গি বুদ্ধিদীপ্ত আর সরল, কিছুটা হয়তো আমারই মতো।

ভোরে ঘুম ভাঙার পর থেকেই নানান রকমের শব্দে বাড়িটাকে ও উল্লসিত করে রাখে। লুনা আর লুনার মা ওকে কোলে নিয়ে সারাদিন পাখির বিচিত্র ভাষায়

Scanned by CamScanner

অনর্গল কথা বলে। বিরতিহীন অর্থহীন সেসব কথা—সবই মনের অর্থহীন খুশি দিয়ে তৈরি। তবু সেসবের ভেতর দিয়ে জীবনের অনেক অকথিত খুশি আর আকুতি ওরা নিজেদের অগোচরে প্রকাশ করে যায়। ওদের সেই শিশুজগতের ভাষার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো ভাষার মিল নেই। ওদের একজনের ভাষা আবার আরেকজনের থেকে একেবারেই আলাদা। এমন বিরতিহীনভাবে ওই ভাষায় ওরা কথা বলে যায় যে আশঙ্কা হয় ওদের নিজেদের ভাষাটাকেই না ওরা একসময় ভুলে যায়।

মেয়েকে নিয়ে লুনা একটু বেশিরকম টেনশনে ভোগে। এমনিতেই তো সবসময় মেয়ের জন্যে এটা-ওটা করছে, অবসরের সময়টুকুও মেয়ের কাছেই থাকতে চেষ্টা করে ও। এরই মাঝখানে হঠাৎ যখন ঘরে কেউ নেই, এমনকি মিত্রার মা-ও না, একা বিছানায় শুয়ে ও অবোধ উল্লাসে যখন রাজ্যের কথা বলে চারপাশকে সচকিত করে চলেছে, তখন ঘরের ভেতর কেউ পা টিপে ঢুকলে অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাবে দেয়ালজোড়া জানালা দিয়ে উপচে-আসা আলোর রাজ্যে গাছ-ফুল-আঁকা বেডকভারের সবুজ জঙ্গলের ভেতর একটা বড় সাদা ম্যাগনোলিয়ার মতো ও ফুটে আছে।

ওকে দেখে দেখে মন ভরে না। ওর সঙ্গে অনর্থক কিচিরমিচির সেরে যখন দায়িত্বের টানে টেবিলের দিকে পা বাড়াই তখন কে যেন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে : ফিরতে অবশ্য পার তোমার কর্তব্যের জগতে, কিন্তু যে স্বর্গ এই ফুরফুরে বিছানার রাজ্যে ফেলে রেখে যাচ্ছ কোথায় পাবে সেখানে তুমি তা? ওকে না দেখা মানেই তো জগতের অপরূপকে না দেখা।

অদ্ভুতভাবে আদর নিতে পারে ও। যখন একটানা অনেকক্ষণ ওর গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে ওর ভেতরকার প্রদীপ্ত শিশুটাকে নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে চাই তখন ও এমন অপরূপভাবে চুপ করে থাকে যেন গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে পুরো আদরটুকু পেয়ালাভরে নিয়ে নিল।

২০৮

যৌবন অত্যাচার করে হৃদয়ের ওপর, বার্ধক্য শরীরের ওপর।

২০৯

গোবিন্দ দাসের কবিতা পড়ে অবাক হলাম। ভেবে অবাক লাগল এমন ব্যতিক্রমী, মৌলিক, জ্বলজ্বলে আর শক্তিমান একজন কবি কী করে এই সাহিত্যে এতদিন উপেক্ষিত ছিলেন? বাংলাসাহিত্যের বৈভবময় সমালোচনার ধারা কি এতই নির্বীজ?

Scanned by CamScanner

সবরকম গতানুগতিকতা এড়িয়ে সরাসরি মানুষী চোখে জীবনকে দেখার নির্ভুল চোখ ছিল তাঁর। এদিকে থেকে গোবিন্দ দাস (১৮৫৫– ১৯১৮) তাঁর কালের সবচেয়ে আধুনিক মানুষ।

এই বিচারে রবীন্দ্রনাথের চাইতেও আধুনিক তিনি। কেবল রবীন্দ্রনাথ কেন, রজনীকান্ত, ডি.এল. রায়, দেবেন সেন, অক্ষয় বড়াল—তাঁর যুগের এসব কবিদের সবার চাইতেই তিনি আধুনিক। চেতনার দিক থেকে তিনি মার্ক্স ও ফ্রয়েডোত্তর, বোধের দিক থেকে তিরিশের। ওই সময়ে জন্মালে তিনি ওই ধারার অন্যতম প্রধান কবি হতেন।

২১০

মননে উপলব্ধিতে ওদের চেয়ে কম ছিলাম না। অপরাধ হয়েছিল বাড়তি কিছু ছিল বলে। ওদের বিরাট আর গুরুগম্ভীর কথাগুলোকে হালকা হাসিতে সহজ করে বলতে পারতাম।

বুদ্ধিজীবীর শিরোপা থেকে তাই বঞ্চিতই থেকে যেতে হল সারাজীবন।

২১১

কাল ছিল আমার জন্মদিন। তেপ্পান্ন বছর শেষ করে চুয়ান্নতে পড়ার দিন।

জীবনের একটা সময় পর্যন্ত মানুষ বয়স কমিয়ে বলতে ভালোবাসে, এরপর বাড়িয়ে বলতে। মাঝবয়সের আগ পর্যন্ত সবাই নিজের বয়স কমিয়ে বলতে চায়, জীবনকে ভালোবাসে বলে, জীবনকে চলে যেতে দিতে আপত্তি আছে বলে, চলে যাচ্ছে দেখলে ভয় পায় বলে। তবু জীবন তো প্রত্যাবর্তনহীন যাত্রায় চলে যায় যেখানে যাবার। যেদিন নিশ্চিত টের পায় সমস্ত আলিঙ্গন ছিঁড়ে 'নিষ্ঠুর ময়না' চলে গেছে, সেদিন নিঃসাড় শরীরে, অবসিত জীবনের অর্থহীনতাকে টর্চের মতো উঁচু করে তুলে ধরতে চায় সে, পরিণত বয়সের শ্বেতশুভ্র পতনকে জীবনের শস্যময়তার প্রতীক করে দেখাতে চায়। এটা তার বয়স বাড়িয়ে বলার সময়। একটা বছর বাড়িয়ে বলা তখন আর তার জীবন থেকে বিয়োগ নয়, যোগ।

এমন একটা বয়সে আমি বেঁচে আছি যখন বলতে পারব না, জীবন রুমাল উড়িয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেছে, অথচ আবার তা শেষ হতেও দেরি নেই। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান আর আশঙ্কা-স্রস্ত সময়পর্ব এটা—জীবন-শেষের এই দু' চারটা বছরের একমুষ্টি সময়। এর পরই সব শূন্য। এটা সেই সময় যখন জীবন সবচেয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলে উঠতে চায়—সবাইকে ডেকে আর্ত গলায় বলতে চায় : শেষবারের মতো দেখে নাও আমাকে তোমরা—এ প্রদীপ আর কখনো জ্বলবে না।

এরই মধ্যে আমার কষ্টগুলো, দুঃখগুলো, ব্যক্তিগত যন্ত্রণাগুলো কমে আসতে

Scanned by CamScanner

শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই তারা এক অপরিচিত বরফসাদা হিমশীতল নিঃসীম প্রান্তরের দিকে উড়ে পালাবে। এরপর যা থাকবে তা কাফনের মতো সাদা এক বার্ধক্যের দেশ—সান্তিয়াগোর সুন্দর বিশাল শক্তিমান সেই শ্বেতশুভ্র মৎস্য কঙ্কালের আকীর্ণ জগৎ। মীর তকী মীরের একটা ছোট্ট শের মাঝে মাঝেই মনে পড়ে :

'কাল রাতে যেখানে মীরের বাসনার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল আজ সকালে সেখানে গিয়ে শুধু একমুঠো ছাই দেখতে পেলাম'।

হ্যাঁ, একমুঠো ছাই। একমুঠো ফ্যাকাসে ছাই হয়ে পড়ে থাকবে আজকের গনগনে জীবন। কী দুর্লভ আর মূল্যবান তার আগের এই কটা বছরের প্রত্যেকটা মুহূর্ত। কী পরিপূর্ণ ব্যবহার্য, আশঙ্কাকাঁপা, ফলন্ত আর সোনালি!

এই ব্যথিত ক্ষিপ্র পলায়নপর সময়টার একেকটা বছর শেষ হয়ে যে দিনটা আমার দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছে তাঁকে মৃত্যুদিন না বলে কী করে জন্মদিন বলি আজ? কী করে শত্রুকে স্বাগত জানাই? ফাঁসির তারিখ ঘোষিত হয়েছে জেনেও কী করে অসুস্থ না হয়ে পারি?

জীবনকে যারা সুস্থির নিরুদ্বেগে মেনে নিতে পারে তাদের একজনের নাম যৌবন। এটা সে পারে তার ভাঁড়ার সম্রাটের মতো অপরিমেয় বলে। তার এত আছে যে একজোড়া বড় কালো চোখের জন্য দশ–বিশটা বছর সে অনায়াসে প্রতীক্ষা করে যেতে পারে। বার্ধক্যও পারে এমনটা, এর উল্টো কারণে। কঠিন শীতে তার পদ্মের বন পুরোপুরি মরে গেছে বলে। পারে আরেকজন—তাঁর নাম দেবতা। যৌবনের মতো তাঁর বৈভবও সম্রাটের মতো বলে। শেষের কবিতার অমিত রায়ের অকাট্য যুক্তিকে উপেক্ষা করা কঠিন :

'দেবতার হাতে সময় অসীম; তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে, ঠিক সময়ে অস্ত যায়।'

হ্যাঁ, দেবতা পারে। তাঁর সময় অনন্ত, ভেবে চিন্তে সুস্থ সুপরিকল্পিতভাবে সব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমাদের? আমাদের যাদের হাতে আর বড়জোর দু'চার বছরের বিষণ্ণ বরাদ্দ তাদের পক্ষে একটা গোটা বছরকে হারিয়ে ফেলার শোক বেমালুম ভুলে যাওয়া সহজ নয়।

ভেবেছিলাম নিঃশব্দে সবার অজান্তে এবারের জন্মদিন পার হয়ে যাবে। একটা বছরকে হারিয়ে ফেলার ভয় থেকে চোখ বুজে কিছু সময়ের জন্য নিজেকে প্রবোধ দিয়ে রাখতে পারব। তা আর হল না। জন্মদিনের ঘরোয়া অনুষ্ঠান আয়োজিত হল যথারীতি। অনেকেই দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। একজন নামকরা উঠতি গায়িকা উপস্থিত ছিলেন আমাদের মধ্যে। যাবার আগে বলে গেলেন এমনি হাজার বছর যেন আপনার জন্মদিন করে যেতে পারি।

মানুষ হাজার বছর বেঁচে থাকে না, তবু এসব কথা বলতে ভালোবাসে। হয়তো হৃদয়ের চাওয়াগুলোকে এভাবেই ভাষা দিতে চায়। কিন্তু কী করে তাঁকে বোঝানো

Scanned by CamScanner

যাবে যখন তিনি কথাগুলো বলছিলেন তখন কী গভীরভাবে মৃত্যু আমার আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে!

২১২

সাহিত্যের মতো মানুষও দু রকম : সাম্প্রতিক ও চিরায়ত।

২১৩

টাকা আর ভালোবাসা একই জিনিস। বেঁচে থাকার জন্য খুবই জরুরি, কিন্তু অনির্বচনীয় জীবনের শত্রু। ওই জীবনকে পাবার জন্যে যা সবচেয়ে দরকারি তা হচ্ছে এদের অভাব।

২১৪

রূপকথার সেই বিষণ্ন রাক্ষসীদের কথা ভেবে মন ভারী হয়ে আসে। বয়সী, লোল-চর্ম আর কদর্য এক ধরনের করুণ অনভিপ্রেত জীব এরা। কথাও বলে যৌবনের অনধিগম্য ভাষায় : কাছে যাবার কথা বললে দূরের পথে পাড়ি জমায়, দূরে যাচ্ছি বললে কাছাকাছি থাকে। কথা বলার সময় শব্দের প্রথম অক্ষরে অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু বসায়—'হাউ মাউ খাউ' না বলে বলে, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ।' হয়তো ঝুলে-পড়া লোল জিভে শুদ্ধ উচ্চারণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বলেই অমনটা করে। পাউ বলতে গিয়ে আড়ষ্ট জিভের জড়তার কারণে অবোধের মতো বলে ওঠে 'পাঁউ'।

তো একদিন রাক্ষসী বলল, "আজ কাছে যাচ্ছি।" আর যায় কোথায়! তার পাতানো নাতনি—রাজকন্যা—মুহূর্তে বুঝে নিল আজ তারা দূরে যাবে। সহজাত অনুভূতিতে টের পেল আজই ওদের সদলে ধ্বংস করার প্রকৃষ্ট সময়। পুকুরের তলে সযত্নে লুকোনো ভোমরার ভেতর তাদের জীবন—এটা তো সে অনেক আগেই বুড়ি রাক্ষসীকে সেবায় ভুলিয়ে, পায়ে তেল মালিশ করে, পাকা চুল বেছে দিয়ে জেনে রেখেছে।

এক মুহূর্তও অপব্যয় না করে প্রাসাদের জনবিরল ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকা রাজপুত্রকে বার করে আনল সে। জীবন বাজি রেখে রাক্ষসীদের নিপাত করার কাজে নেমে গেল। কাজটা সমাধা করার পথ তখন প্রশস্ত। বার্ধক্যজনিত বিস্মৃতির কারণে বুড়ি রাক্ষসী পুরীরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থা না করেই সবাইকে নিয়ে তখন চলে গেছে অনেক দূরে। রাজকন্যার কাছে তাদের প্রাণভোমরার খবর সে যে মনের ভুলে কখন ফাঁস করে বসে আছে, স্তিমিত স্মৃতির কারণে সে কথাও তখন সে ভুলে আছে।

রাজপুত্র পুকুরের তলা থেকে এক ডুবে প্রাণভোমরাকে তুলে হাতের মুঠোয় চেপে ধরতেই দলসুদ্ধ রাক্ষসীদের শরীর-মন আইঢাই করে উঠল। নিজেদের ভ্রান্তির

Scanned by CamScanner

অনুশোচনায় তখন কপাল চাপড়াচ্ছে তারা। ভয়াবহ পরিণাম আঁচ করে তারা হাঁউমাঁউ করতে করতে ছুটে আসতে লাগল। তাদের ছুটে আসা পথের চারপাশের পৃথিবী ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু পথ তখন সর্পিল এবং শত্রুপরাক্রান্ত।

রাজপুত্র এক ঝটকায় ভোমরার ডানপাশের পাখাটা ছিঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ গর্জনে ছুটে-আসা সব রাক্ষসীর ডানহাতগুলো একসাথে ছিঁড়ে পড়ে গেল মাটিতে। রক্তে ভিজে উঠল তাদের শরীর। তবু তারা অপরাজিত। অবশিষ্ট এক হাত নিয়েই রাজপুত্র-রাজকন্যার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল তারা। কোনোমতে পুরীতে পৌঁছাতে পারলেই তারা বেঁচে যাবে। কোনোমতে শুধু পুরী পর্যন্ত !

রাজপুত্র তখন ছিঁড়ে ফেলল ভোমরার অন্য পাখাটা। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসীদের বাঁ হাতগুলো ছিঁড়ে পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু তখনো তারা ছুটছে। হাতবিহীন অবস্থায় কেবল দুই পায়ের ওপর ভর করেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে তারা। জীবন বাঁচাতে তারা বদ্ধপরিকর। আহা, এই ছোট্ট এতটুকু জীবন কী করে তারা হারায় !

তখন রাজপুত্র ছিঁড়ে ফেলল ভোমরার ডান পা। অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তারা মাটিতে। তাদের সবার ডান পা ছিঁড়ে পড়েছে ধুলায়। তাদের শরীর তখন গড়াগড়ি খাচ্ছে রক্তের জলায়।

তবুও তাদের ক্লান্তি নেই। আর কয়েক মুহূর্তেই গন্তব্য। তা হলে তারা বেঁচে যাবে। এক পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সেই অঙ্গহীন কদাকারের দল তখন হাঁউমাঁউ করে ধেয়ে চলছে শত্রুকে ধরতে। তখন তারা পুরীর একেবারে কাছাকাছি।

রাজপুত্র তখন ভোমরার অন্য পা-টাও ছিঁড়ে ফেলল। হাতপা-হীন হয়ে রাক্ষসীরা আছড়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু তখনো তারা অপরাভূত। রক্তাপ্লুত শরীরগুলো জ্ঞানশূন্যের মতো গড়াতে গড়াতে নিয়ে চলেছে তারা। মুখের ভেতরকার রক্তমাখা দীর্ঘ দাঁতগুলো তখন তাদের আক্রমণের শেষ বর্শা।

রাজপুত্র তখন একটানে ছিঁড়ে ফেললেন ভোমরার মুণ্ড। রাক্ষসীদের মাথাগুলো গগনবিদারী শব্দ তুলে রাজপুত্রের পায়ের সামনে একসঙ্গে এসে আছড়ে পড়ল। রাক্ষসীদের হাত-পা-মুণ্ডহীন ধড়গুলো পুরীর চারপাশে কদাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে রইল।

এই তো আমাদের জীবনে মানুষদের জীবন ! এভাবেই ধীরে ধীরে একে একে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এক সময় শেষ হয়ে যাওয়া।

২১৫

পেছনে চলা বলে কিছু নেই। মানুষের শরীরের দিকে তাকালে এর সমর্থন মেলে। মানুষের গোটা শরীর-গড়নটাই কি সামনে চলার জন্য তৈরি নয়? পায়ের সহজাত উন্মুখতা কি সামনের দিকে নয়? নয় কি হাতেরও। চোখ, নাক, মুখ এমনি যেসব প্রত্যঙ্গ চলার সহায়ক তারা সবই তো শরীরের সামনের দিকে প্রসারিত। নাকি গতির

Scanned by CamScanner

অভিমুখে প্রসারিত বলেই তাকে আমরা সামনের দিক বলি? পেছনেও মানুষ যেতে পারে কিন্তু সে কেবল ব্যতিক্রম হিসেবে, বাড়তি সুবিধা হিসেবে।

কেবল মানুষ কেন, প্রতিটি প্রাণীই কি তা নয়? কে পেছনে যায় পৃথিবীতে? যায় কি উদ্ভিদ জগৎ? গ্রহ নক্ষত্র বিশ্বপ্রকৃতি—সময়, মহাসময়? সবাই তো সামনের দিকে অগ্রসরমান। আসলে কোথায় পশ্চাদ্‌গতি? যারা বলে অমুক ঘটনা আমাদের অত বছর পিছিয়ে দিয়েছে তারা কি ভুল বলে না? কিছুই আমাদের পিছিয়ে দেয় না। যেখানে থাকার আমরা সেখানেই থাকি। মাঝখানে সাফল্যের বিভ্রমে, ঘোরের ভেতর, আমরা ভুলভাবে ভেবে বসেছিলাম, আমরা বেশি পরিমাণে এগিয়ে গিয়েছি। আসলে ওই ঘটনাটি আমাদের প্রকৃত জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

২১৬

রাশফুকোর লেখায় পড়েছিলাম, ঈর্ষা প্রেমের সঙ্গেই শুরু হয় কিন্তু প্রেমের সঙ্গে শেষ হয় না। সে ঈর্ষাও বোধহয় আজ শেষ।

২১৭

মানুষ দু রকম। এক, যারা এষণা করে; দুই, যারা গবেষণা করে।

২১৮

আমাদের খাবার টেবিলে নানান স্বাদের যত বেশি রকমের খাবার পরিবেশন করা হবে ততই তো আমাদের ইন্দ্রিয়ের উল্লাস। শহরে চাইনিজ, ইটালিয়ান, মোগলাই, থাই, কন্টিনেন্টাল, দেশী—যত দেশের যত রকম খাবারের দোকান বসবে, রসনাজগৎকে যত স্বাদে উষ্ণতায় প্রজ্বলিত করবে ততই তো জীবনের সমৃদ্ধি। বৈচিত্র্যের জগৎই তো আমাদের বৈভবের জগৎ। যত বিভিন্ন জাতের গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে রুচিতে সৌন্দর্যে, বৈচিত্র্যে পূর্ণ করা যাবে ততই তো আনন্দের বিস্তার। বাগানকে যত বেশি জাতের রঙ-বেরঙের ফুল ফুটিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারব ততই তো অস্তিত্বের বিস্ময়।

কিন্তু মানুষের বেলা আমরা কেন এত বিপরীত? কেন আমাদের থেকে পৃথক মানুষদের স্বীকৃতিতে আমরা এমন অনুদার? কেন সারা পৃথিবী সব ছেড়ে-ছুঁড়ে একমাত্র আমার মতো না হলে আমরা ক্ষুব্ধ হয় উঠি? অন্যদের আলাদা মনমানসিকতা, রুচি-আচরণের ব্যাপারে আমরা কেন এমন অসহিষ্ণু? কেন সবাইকে স্টিম রোলারের নিচে অবয়বহীন করে কেবল নিজের এক এবং অভিন্ন আস্তিনের মধ্যে না ঢোকানো পর্যন্ত আমরা স্বস্তিহীন? কেন মানুষের ভিন্নতার ব্যাপারে আমরা এমন প্রতিবাদী, অপ্রকৃতিস্থ?

Scanned by CamScanner

২১৯

প্রকৃতির মধ্যেও রয়েছে মানুষের জগতেরই আচরণ।

প্রচণ্ড উত্তাপে যদি কোনো জায়গার উষ্ণ বাতাস আত্মাহুতির ভঙ্গিতে উপরের দিকে উঠে যায় তবে চারপাশের সহানুভূতিশীল হাওয়ারা দল বেঁধে মাতম্ করতে করতে সেই জায়গার চারধারে এসে জড়ো হয়। শুধু জড়োই হয় না। আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি আর গতিতে সেই রিক্ত অঙ্গনের চারধারে মত্ত দীর্ঘশ্বাসে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন জাগিয়ে, বিস্তীর্ণ প্রকৃতি জগৎকে উত্তাল তাণ্ডবে উন্মথিত করে মাতালের মতো আবর্তিত হতে থাকে। যেন সেই প্রথম হাওয়ার আত্মাহুতিকে অশ্রুসিক্ত প্রমত্ত দীর্ঘশ্বাসে স্মরণীয় না করে তাদের ক্ষান্তি নেই।

মানুষের জগৎও এমনি। পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর বেদনায় আর্ত হয়ে এই পৃথিবীর কোথাও কেউ যদি আচমকা আত্মোৎসর্গ করে বসে তবে তার শূন্য চত্বর জুড়েও ঘটে এমনি ঘটনা। বেদনামথিত মানুষের দল চারপাশ থেকে ক্ষুব্ধ আহাজারিতে ছুটে এসে মত্ত হাহাকারে চারধার পূর্ণ করে তুলতে থাকে। মাতাল মাতমে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব জাগিয়ে উৎসর্গবেদির চারধারে এমনি উন্মাতাল আর আবর্তিত হতে থাকে তারা। উৎসর্গিতের স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করেই কেবল সেই বেদনামথিত সংক্ষোভের সমাপ্তি।

আত্মোৎসর্গের ব্যর্থতা নেই—কি প্রকৃতিরাজ্যে কি মানুষের জগতে।

২২০

জীবনের চরিতার্থতার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম। তোমার পরিপক্ব দ্রাক্ষাকুঞ্জও ভাঁড়ারহীন ছিল না।

সম্পন্নতার হাতটাকে আর একটু অকুণ্ঠিত করলে কী এমন ক্ষতি ছিল?

২২১

যৌবনে মৃত্যুগ্রস্ততা থাকে সবচেয়ে বেশি। মৃত্যুর বেদনায় যৌবনের চোখের পাতা নিজে থেকেই ভিজে ওঠে :

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি জল।

রবীন্দ্রনাথ 'কেন যে কে জানে' লিখলেও আমরা জানি কী সেই অকথিত কষ্ট যার জন্যে 'সমস্ত প্রাণে' আঁখি জল ভরে আসে। এই শ্যামলা বিপুলা পৃথিবী চিরদিন এমনি মঞ্জরিত উচ্ছলিত হয়ে চলবে অথচ সুখের সেই পরিপূর্ণতম মুহূর্তগুলোকে অনুভব করার জন্য একদিন এখানে আমি থাকব না—এই ব্যাপারটা তাঁকে কষ্ট

Scanned by CamScanner

দেয়। এই অনুভূতি বিশেষভাবে যৌবনের। জীবনের সুন্দরতম মুহূর্তেই মানুষ গভীরতম বেদনাকে অনুভব করে।

জীবনকে এত প্রাণ-বাসনা ঢেলে ভালোবাসে বলেই যৌবন এত মৃত্যু-আচ্ছন্ন। এমন ভিখারির মতো সে বাঁচতে চায়। মৃত্যুর মধ্যে এই রূপ-রস-উপভোগমধুর জীবনের অবসানের আশঙ্কা তাকে বিষাদাচ্ছন্ন করে রাখে। তাই অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য মৃত্যুকে সে প্রত্যাখ্যান করে। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' তাই যৌবনের সঙ্গীত, বার্ধক্যের নয়।

আমার জীবন পুরো ব্যর্থ হয়েছে এ কথা আজ জোর গলায় বলতে পারব না। তবু বিদায়ের আগে অচরিতার্থতার দুঃখও কম নয়। কিন্তু পৃথিবীর সার্থকতম মানুষের জীবনও তো এমনি সব অসম্পূর্ণতা দিয়েই তৈরি। জীবনচক্রের প্রধান পর্ব আমি শেষ করেছি, এখন যা ঘটবে তা তো ওই তারই উন্নততর পুনরাবৃত্তি মাত্র। দুঃখের প্রক্রিয়াকে কী করে আমি এড়াব?

জীবন বড়-ছোট ক্ষতির পর ক্ষতির ভেতর দিয়ে অজান্তে আমাদেরকে মৃত্যুর জন্যে তৈরি করতে থাকে। তাই মৃত্যুকে আমরা এক সময় এত সহজে গ্রহণ করতে পারি।

সেই ক্ষতির পর ক্ষতি আমাকে রিক্ত করতে করতে আজ মৃত্যুর প্রতিবেশী করে তুলছে। আমাদের যা আনন্দেরও অধিক আনন্দ—সেই দুঃখগুলো কষ্টগুলোও জীবন থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। মৃত্যুকে আমি এখন প্রতি মুহূর্তে দেখি। সকালবেলা প্রাতঃভ্রমণ দলের দৈনন্দিন সঙ্গীর মতো আজকাল আমার পাশাপাশি সে নিঃশব্দে হেঁটে চলে। কেন তবু ফাল্গুন দিনের মৌমাছির মতো আমি কাঁদছি। রক্তের কণায় কণায় কেন মৃত্যুর এমন প্রত্যাখ্যান। কেন আর অল্পকটা বছরের জন্যে এমন ভিখারির মতো আকুলতা।

যৌবনের মতো আমিও অসম্পূর্ণ। আমার রক্তে আজ কোটি কোটি শব্দের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বর্শাগ্র উঁচিয়ে সারে সারে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ বিজয়হীন উষ্ণীষহীন যুদ্ধহীন—তাদের সদলে মুছে যেতে হবে, নিজেদের শক্তিকে ব্যবহারের কোনো সুযোগই তারা পাবে না। মৃত্যুর দিকে কী করে আমি বন্ধুত্বের হাত বাড়াব। লেখা আমার রক্তের মৌল আকুতি। হাজার কোটি শব্দের সুন্দর বিশাল উন্মোচনের উত্তাল শীর্ষে তার সম্পূর্ণতা।

আজ লেখা শুরু করার পর অপরিচিত অনাবিষ্কৃত, অবিশ্বাস্য যেসব জগতের রহস্যময় আভাস চেতনালোকের ভেতর প্রত্যক্ষ করছি তাকে ভাষায় তুলে ধরার সময় কোথায়?

২২২

কালকে একটা মজার কথা শোনা গেল। কথাটা এইরকম :

পৃথিবীতে একটা সময় ছিল যখন মানবজাতিকে পথনির্দেশ করতে স্বয়ং ভগবান নেমে আসতেন মানুষের মধ্যে, অবতারের চেহারায়। এর পরবর্তী পর্যায়ে, যখন

Scanned by CamScanner

মানুষের অবস্থান আরো একটু শক্ত-পোক্ত হল, ঈশ্বরের নিজের আসার দরকার তখন অনেকটা কমে এল, প্রেরিত পুরুষ দিয়েই তখন মোটামুটি কাজ চলে যায়। কয়েক শ বছরের ব্যবধানে বেশ কিছু মহাপুরুষ এই সময় এসে গেলেন পৃথিবীতে। এটা এক কথায় পয়গম্বরদের যুগ। পরের যুগে দেখা গেল প্রেরিত পুরুষদেরও আর দরকার পড়ছে না, জিনিয়াস বা প্রতিভাবানদের দিয়েই কাজ চলে যাচ্ছে। এটা মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রতিভাবানদের যুগ। এরপর দেখা গেল জিনিয়াসও দরকার নেই, মোটামুটি কিছু মেধাবী লোক দিয়েই ওই কাজটা চলে। তখন এল মেধাবীদের যুগ। এরপর বোঝা গেল মেধাবী নয় মোটামুটি শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত ও উজ্জ্বল লোকদের দিয়েই চলে কাজটা। সারা পৃথিবীতে আজ ওই যুগই চলছে।

ব্যতিক্রম কেবল আমাদের দেশে। সব বিষয়ে পুরোপুরি অশিক্ষিত আর অকর্ষিত হতে না পারলে এখানে কোনো কিছুই হতে চায় না।

২২৩

শিক্ষা বিনোদনের চেয়ে অনেক বড়। আমরা সারাক্ষণ নাচি না কিন্তু সারাক্ষণ ভাবি।

২২৪

কেন্দ্রের নন্দনচক্রের অনুষ্ঠানে সেদিন বেহালা বাজালেন রাজশাহীর রঘুনাথ দাস। আমন্ত্রণ করে তাঁকে রাজশাহী থেকে আমরাই নিয়ে এসেছিলাম।

রঘুনাথ বাবুর বয়স পঁয়ষট্টির ওপর, কিন্তু বুড়িয়ে গেছেন আরো একটু বেশি। তবে চেহারায় মিইয়ে আসার চিহ্ন নেই, বরং উল্টোটাই আছে। ছোটখাটো ছিপছাপ পরিপাটি মানুষ তিনি। মাথার একপাশ থেকে সামান্য পাক-ধরা চুল পরিচ্ছন্ন করে আঁচড়ানো। সারা শরীরে একটা পারিপাট্যময় স্নিগ্ধতা। কিন্তু আসল বার্ধক্য আছে তাঁর শরীরের ভেতরে, বাইরের মার্জিত পরিশীলনের আড়ালে। সামান্য কষ্টেই অসহায়ভাবে এলিয়ে পড়েন তিনি। রাজশাহী থেকে বাসে চড়ে ঢাকায় আসার ধকল কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারেন না। তাই প্লেনে আসতে হয়।

কিন্তু বেহালা হাতে নেবার সাথে সাথে কী শৈল্পিকভাবেই না জ্বলে উঠলেন তিনি! জরা বৈকল্যকে দু হাতে উড়িয়ে জ্বলে উঠলেন। যে তারুণ্য পৃথিবীর জন্মদিনের সঙ্গে শুরু হয়ে আর কোনোদিন মরে নি সেই তারুণ্যেরই মতো জ্বললেন তিনি।

বেহালা শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রোতাদের মন এক অলৌকিক খুশিতে নেচে উঠতে শুরু করল—সেই বিস্ময়কর আনন্দ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতে চাইবে না। এই স্নিগ্ধ চপল আনন্দের উৎস রয়েছে তাঁর হৃদয়ের চির যৌবনের রাজ্যে—শরীরী জরা এখনো সেখানে পা ফেলতে সাহস করে নি।

রাগের শেষ পর্যায়ে—ঝালার সেই ঝংকারমুখর ক্ষিপ্র অস্থির সময়টুকুতে যেন পুরোপুরি বিস্ময়কর আর অচেনা হয়ে উঠলেন তিনি। মনে হল হাজার হাজার

Scanned by CamScanner

পায়রা তার বেহালার রুপোলি তারের ওপর উজ্জ্বল নিক্কণে নেচে বেড়াচ্ছে। তাঁর বেহালা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল সুন্দরতম যৌবনও কি এমনি? সুকান্তের লাইনটা মনে পড়ে—

'আমাদের ভালো পুরোনো চাই না বৃথা নবীন।'

অনুষ্ঠানের শেষে তাঁকে ফুল উপহার দেবার সময় একটা কথাই কেবল মনে আসছিল : এমন বৃদ্ধ পাওয়া গেলে যুবকের কী দরকার।

২২৫

ক

তরুণ বয়স একদিকে যেমন জীবনের ঈপ্সিত উপভোগগুলোকে সারা পৃথিবী থেকে ধরে এনে আমাদের দরজায় দাঁড় করায় তেমনি আবার অবাঞ্ছিত উপভোগগুলোকে ঘাড় ধরে দরজার বাইরে তাড়িয়ে দেয়। প্রৌঢ়ত্বে, যৌবন ধরে আসতে শুরু করলে, এক কালের অনেক সাধে ডেকে আনা যৌবনের ওই ভোগ্যগুলো যেমন এক দুই করে বিদায় নিতে শুরু করে তেমনি সুযোগ পেয়ে দরজার বাইরে মাতৃহীন শিশুর মতো তাড়িয়ে দেওয়া সেই অবাঞ্ছিত উপভোগগুলো দরজা দিয়ে চুপে চুপে ঢুকে পড়তে থাকে জীবনের অন্দরে। ফলে তখন শুরু হয় অন্য এক আনন্দের ঋতু। এইজন্যে যৌবনের অবসান জীবনের অবসান নয়। বার্ধক্য জীবনপিপাসার নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না। জীবনভোগেরও না। জীবন যৌবনের চেয়ে বড় বলেই পারে না।

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি?
আস্তে একটু চল–না ঠাকুরঝি।
ওমা, এ যে ঝরা বকুল, নয়?

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতার অন্ধবধূ ফুলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হত স্পর্শ দিয়ে। আমি নিশ্চিত হতাম ঘ্রাণ দিয়ে, চোখ ছিল বলে। তবু এ ব্যাপারে আমার একটা পার্থক্য ছিল অন্যদের সঙ্গে। আমার ঘ্রাণশক্তি ছিল অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি।

বড় বেশি দূর থেকে টের পেয়ে যেতাম আমি ফুলের গন্ধ। না দেখেও বলতে পারতাম কোথায় কতদূরে কীভাবে আছে কোন ফুল। যেসব ফুলের শরীরে বড় বেশি গন্ধ—সৌরভ–গরবিনী বলে যাদের একটু বেশি দেমাগ ফুলের বাজারে, যেমন কেয়া, হাসনাহেনা, নাগেশ্বর, জুঁই বা মহুয়া তাদের তো বটেই, এমনকি অতি সাধারণ গন্ধ–আছে–কি–নেই ফুলদেরও টের পেয়ে যেতাম দূর থেকেই। আশপাশের সুগন্ধিমাখা প্রতিটা মেয়েকে মনে হত একঝাড় চলন্ত হাসনাহেনা। সৌগন্ধ্যকে টের পাবার এমনি অবিশ্বাস্য ঘ্রাণশক্তি ছিল আমার ভেতর।

যে কোনো অতিপ্রদত্ত ক্ষমতার মতো এর শাস্তিও ছিল নির্মম। কড়া গন্ধের ফুল তো বটেই, বেশি–ঘ্রাণ–নেই এমন ফুলের ঘ্রাণও আমার অসহনীয় লাগত। বেলি–

Scanned by CamScanner

গন্ধরাজের মতো হালকা আর পেলব গন্ধের ফুলকেও আমার দূরে সরিয়ে রাখতে হত। নাসারন্ধ্রের কাছে ফুল আনলেই মনে হত গন্ধের হিংস্র ছোবলে আমার চেতনা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। প্রতিটা ফুলকে আমার মনে হত কুণ্ডলী পাকানো ক্রূর একেকটা কালসাপের মতো। তাদের গন্ধের অত্যাচারে বিবমিষায় আমার গা ঘুলিয়ে উঠত। মাথা ঘুরত। ফুলের সঙ্গ থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করতাম আমি।

যৌবন এভাবে ফুলের সৌগন্ধ্যময় পৃথিবী থেকে আমাকে নির্বাসিত করে রেখেছিল। অধুনা, প্রৌঢ়ত্বে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সেই তীব্র সংবেদনশীলতা শমিত হওয়ার পর ফুল আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে। কেবল ভালো লাগা নয় মাধুর্যের কারণে ফুল আমার কাছে সুন্দর আর প্রিয়দর্শিনীও হয়ে উঠছে। ফুল আমাকে একটা গন্ধে ভরা পৃথিবী উপহার দিচ্ছে। প্রৌঢ়ত্ব আমাকে যৌবনের পক্ষে অদেয় কিছু দিচ্ছে। জীবনের সামনে ইন্দ্রিয়ের সামনে জগতের সব জায়গায় আমি একটা ঘ্রাণেন্দ্রিয়–বিভোর উৎসব টের পাচ্ছি। যেখানে তা পাচ্ছি না সেখানে তা পাবার জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছি।

খ

সহজ আর পরাক্রান্ত—এই দুয়ে মিলেই আমাদের জীবন। সহজকে দিয়ে আমরা রচনা করি আমাদের দৈনন্দিন জীবন, এর ওজন কম বলে, বিমানবন্দরের ট্রলিগুলোর মতো জীবনের ভেতর তরতরিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারি বলে। কিন্তু জীবনের যে অংশটুকু পরাক্রান্ত আর পরুষ তাকে ঘরের ভেতরে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না বলেই রেখে দিতে হয় ঘরের বাইরে। ওই যে কঠোর আর অত্যাচারী তাকে কিন্তু বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় বলে তা করতে হয় তাকে একটা সুন্দর নাম দিয়ে। আমরা তার নাম দিই স্বপ্ন। বাস্তব জীবনের পক্ষে যা দুর্মর, বহনের পক্ষে অসহ তাই তো আমাদের স্বপ্ন।

সময়ের হাওয়ায় যৌবনের সহজ সম্পদগুলো এক সময় চৈত্রের দুপুরের ধুলোর মতো মিহি আকাশে নীরবে মিলিয়ে যায়। প্রৌঢ়ত্ব আসতে আসতে এরা মোটামুটি শেষই হয়ে যায় জীবন থেকে। কিন্তু জীবন তবু খালি হয় না। জীবনের যে পরাক্রান্ত জিনিসগুলোকে আমরা রুদ্র আর নির্দয় বলে স্বপ্ন নাম দিয়ে বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম তারাও ততদিনে দাঁতাল হিংস্রতা খুইয়ে ধীরে ধীরে নিরীহ আর নখরহীন হয়ে এসেছে। এক কথায় সহজ হয়ে এসেছে। তাই তারা জীবনের অরক্ষিত দরজা দিয়ে ঢুকে প্রাক্তন সহজের খালি হওয়া জায়গাগুলো অবলীলায় ভরতি করে ফেলে।

কিন্তু যৌবনের সবচেয়ে বড় সম্পদটাকে আমরা আর কোনোদিনই ফিরে পাই না। এই সম্পদের নাম ছিল স্বপ্ন। প্রৌঢ়ত্বের সবচেয়ে বড় নিঃস্বতা এটাই। ধার যন্ত্রণা খুইয়ে সেই স্বপ্ন তখন নিরীহ নিরপরাধ ছোট মেয়েটির মতো টেবিলে বসে পড়া তৈরি করছে। দরজার ওধারে তার এতদিনের জাগ্রত সুন্দর বর্শাগ্র তখন ভাঁড়ারঘরের পাশে নতজানু।

Scanned by CamScanner

যৌবনের বিনিময়ে আমি ফুল পেয়েছি। কিন্তু যে স্বপ্নের জন্য মানুষ ফুল খোঁজে সে স্বপ্ন কোথায়। ফুল তো যৌবনের জন্যে তৈরি। যৌবনের সেই যন্ত্রণাময় দাঁতাল আর প্রিয়তম মুহূর্তগুলোর জন্যেই।

তবু এই যে প্রাণের জগৎ, রূপের জগৎ, রঙিন অনুভূতির জগৎ—এরাই কি কিছু কম? দুটো একসঙ্গে হলে হয়তো আরো সুন্দর হত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিতা লেখা হয়ে যেতে পারত তা দিয়ে। কিন্তু পাতা-ঝরার দেশে এই যে কবন্ধ সুন্দর—এ-ই বা খারাপ কিসের।

২২৬

মোহাম্মদ রফির জোছনান্বিত কণ্ঠের সেই বিমর্ষ গান শ্রাবণরাত্রের স্তিমিত ধারার সঙ্গে ফিরে আসে: 'কভি না কভি, কাঁহি না কাঁহি, কোয়ি না কোয়ি তো আয়েগা। আপনা মুঝে বানায়েগা....... ।'

আজ নয়, কিন্তু—কোনো এক দিন, কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ তো আসবেই, আপন করে আমাকে তো নেবেই.....

জীবনে ওই মানুষটি কি কোনোদিন আসে?

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।"

ওই মন্দির কেবলই বড় থেকে বড় হতে হতে এক সময়ে পৃথিবীকে শুদ্ধু ঢেকে ফেলে।

২২৭

আমার কোনো একটা বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে একজন বক্তা সহৃদয় আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, টেলিভিশনে গিয়ে আমি আমার জীবনের একটা মূল্যবান সময়ের অপব্যয় করেছি।

আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই।

আন্তরিকভাবে মানুষ যা করে তার কোনোকিছুই নষ্ট নয়।

কেন অপচয় বলব? শরীরনির্ভর শিল্প পৃথিবী থেকে মরে যায় এই জন্যে? শিল্পমূল্যে ছোট তাই?

কিন্তু আমি কী করতে পারি। আমার ভেতরে আছে যে ব্যাপারটা। সাহিত্যের বা সামাজিক বেদনার মতো একইরকম অত্যাচারীভাবেই যে আছে।

২২৮

আজ কয়েকদিন ধরে একটা হতচ্ছাড়া কোকিল আমাদের বাসার চারপাশের গাছগুলোয় ডেকে ডেকে ছাতি ফাটিয়ে ফেলছে। প্রতি বছরই দেখছি ধারালো বাসনার মতো ফাল্গুনের হাওয়া বইতে শুরু করলেই রাজ্যের কোকিলগুলো কোথা

Scanned by CamScanner

থেকে এসে যেন এভাবে ডাকতে শুরু করে। কাকে ডাকে তারা? তাদের বসন্তবধির সঙ্গিনীদের? নাছোড়বান্দার মতো এমন ছাতি ফাটিয়ে কেন ডাকে? তাদেরও কি জানা আছে মানুষের সঙ্গিনীদের মতো তারাও একইরকম অঙ্গীকারবিমুখ? একবার গেলে আর ফেরে না।

কাল.....ফোন করেছিল। ওর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে ঠিক তখনই কোকিলটা হঠাৎ বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কোকিলের সুর শুনিলে কয়েকটি বিশ্রী কথা মনে পড়িয়া যায়।' মনটা কেমন করে। না, মন নয়, শরীর। শরীরকে মনকে কাঁদিয়ে ডেকে উঠল কোকিলটা। মানব অস্তিত্বের সব শূন্যতা মনে পড়িয়ে দিয়ে ডুকরে উঠতে লাগল। রোদনভরা বসন্তের প্রতীক এই কোকিল।

...জিজ্ঞেস করল, কোকিল ডাকছে?

বললাম, 'হ্যাঁ।'

মনে পড়ল একদিন ওই কোকিলের মতো আমিও ওকে এইভাবেই ডেকে ফিরেছি।

২২৯

আমি বুঝি না দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনের শেষ ছবিকে কেন তাঁদের সর্বজনীন প্রতিকৃতি হিসেবে তুলে ধরা হয়।

এটা বুঝি যে বিখ্যাত মানুষদের কোনো বিশেষ একটা ছবিকে তাঁদের প্রতীক করে তোলার দরকার আছে, আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁদের পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য। যদি তাই হয় তবে জীবনের যে পর্বে তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য ও যুধ্যমান, প্রতিভা ও অসাধারণত্বের সর্বোচ্চ শীর্ষে, সেই পর্বের কোনো একটি ছবিকে তাঁদের সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেই তো সত্যের কাছাকাছি থাকা যায়।

সুদূরের দিকে নিমগ্নভাবে তাকিয়ে-থাকা উদাস চেহারার যে বৃদ্ধকে আমাদের কাছে আইনস্টাইন বলে তুলে ধরা হচ্ছে, মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটি কি তিনি? তাঁর ভেতরকার অমিত প্রতিভাবান মানুষটি তো এর অনেক আগেই চৈতন্যের অগ্ন্যুদ্গীরণ করে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তবে কেন তাঁর শক্তি ও সৃজনশীলতার শীর্ষমুহূর্তের কোনো ছবিকে তাঁর সর্বজনীন প্রতিকৃতি হিসেবে পরিচিত করানো হয় নি? আমরা ছবিতে তাঁর যে প্রশান্ত সৌম্য রূপটিকে চিনি সে তো সেই অবিস্মরণীয় প্রতিভাবানের সৌন্দর্যস্নিগ্ধ বর্ষীয়ান একটি নিরীহ শব কেবল। জীবনের তুঙ্গ মুহূর্তের আহত ক্রুদ্ধ গর্জমান সিংহ তো সে নয়।

শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের যে মহিমান্বিত কান্তিকে আমাদের সামনে তাঁর চিরন্তন প্রতিকৃতি হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা কি শক্তির উচ্চতম শীর্ষের অগ্ন্যুৎপাতময় রবীন্দ্রনাথের ছবি—যখন তিনি গেয়েছিলেন 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'? এ তো সেই মানুষটি যে তাঁর নিজের ভাষাতেই 'রিডাকশন সেলে' উঠেছে।

'যে কবির ভাঙা গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না।'

বিদ্রোহী নজরুল কি শিশুর মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা একজন দন্তহীন অশীতিপর বৃদ্ধ পাগল? যদি না হয় তবে মৃত্যুর আগের সেই উদভ্রান্ত লোল মানুষটিকে নজরুল বলে প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা কেন?

কেন জীবনের শেষ ছবিটিকে—অধঃপতিত মনুষ্যত্বের বেদনাদায়ক পরিণামটিকেই—তাঁদের প্রতীক করে তোলা হয়?

২৩০

আগের যুগে গ্রামের জীবন ছিল ছোট্ট এতটুকু জায়গার ভেতর। গ্রাম তখন নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি-জগতের ভেতর থেকে মাথা উঁচিয়ে থাকা একেকটা শান্ত নিস্তরঙ্গ আত্মমগ্ন দ্বীপের মতো। চারপাশে চাষাবাদ আর পশুপালনের মাঠ, তার ভেতর খালে আর পুকুরে মাছের পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত। এ ছাড়া রয়েছে বাড়ির আঙিনায় নিজেদের হাঁস মুরগি আর সুস্বাদু মাংসের আয়োজন। গ্রামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে দূরের মেলায় বা উৎসবে যোগ দেবার আগ্রহ রক্তপ্রবাহের ভেতর চাঞ্চল্য জাগালেও সে নিতান্তই ক্ষণকালের আকুতি। জন্ম ও মৃত্যু, উৎসব এবং লোকান্তর সবই গ্রামের গণ্ডিতে। বিচার আচার সভা সালিসের অবস্থাও তাই।

ছোট্ট গ্রামটার ভেতর সবাই সবার পরিচিত আর চেনা, সবাই সবার কাছের। গ্রামের এই আবহমান জগতে পরিচিত মানেই প্রতিবেশী, প্রতিবেশী মানেই আত্মীয়। একেকটা গ্রাম রক্তে-সূত্রে গ্রথিত মানুষদের একেকটা নিটোল পৃথিবী। সেখানে নাম ধরে কাউকে ডাক দিলে সহজেই প্রত্যুত্তর মেলে, যে ঘর দূরের তাও নাগালের বাইরে নয়। বাড়ির ওপর নুয়ে পড়া গাছের ডাল, শিশিরের শব্দ, মানুষ, ঘরদোর, প্রাণী—সবই চেনা, সবই নিজের জগৎ।

আধুনিক যুগের মানুষের জীবন এই ছোট্ট গ্রামের পরিসর থেকে মুক্তি পেয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, হাজার হাজার মাইলের সে ব্যবধান। এতে একদিকে সে যেমন বড় হয়েছে তেমনি হয়েছে একা। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ওপর তাই এখন দায়িত্ব পড়েছে সেই দূরকে কাছে, বিশালকে সীমায় এবং অচেনাকে পরিচিত জগতের ভেতর নিয়ে আসার। সাইকেল মোটর ট্রেন জাহাজ এরোপ্লেন টেলিগ্রাফ ফ্যাক্স সংবাদপত্র বেতার টেলিভিশন এবং সবশেষে কম্পিউটার—এইসবের অপ্রতিহত বিস্তৃতি পৃথিবীর বস্তু আর চেতনার বিপুল বিচিত্র জগৎকে আমাদের কাছে এনে হাজির করছে, সারাটা পৃথিবীকে আমাদের চারপাশের অনুভবগম্য দূরত্বে এনে দাঁড় করাচ্ছে।

আজ পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে অতিকায় ও দানবীয় বিকাশ তার স্বপ্ন হয়তো শেষ পর্যন্ত এইটাই : যে ছোট্ট গ্রামটাকে একদিন আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাকে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। বিশাল পৃথিবীকে সেই গ্রামটার ছোট পরিসরে নিয়ে আসা।

Scanned by CamScanner

২৩১

আজ এ বয়সে মৃত্যুকে আমার কাছে আর বিস্ময়কর মনে হয় না। মৃত্যু তো চেনাই আমাদের। জন্মমুহূর্ত থেকেই তো আমরা মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত।

যাকে আজ আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয় তার নাম জন্ম।

কেবলই মনে হয়, পৃথিবীতে আমাদের জন্ম নেওয়া—কী অভাবিত এই ব্যাপারটা। কোনো কথা বা প্রতিশ্রুতি ছিল না, কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না, কোনো আবেদনপত্র পাঠানো বা সাক্ষাৎকার দেওয়া হয় নি, কোনো যোগ্যতাও ছিল না এর জন্য, তবু তাই পাওয়া গেছে, সম্পূর্ণ বিনা প্রার্থনায় বিনা এত্তেলায় স্বর্গ থেকে খসে পড়েছে এই অভাবিত মানবজীবন। কী অপরিমেয় আনন্দ আর আলো-আস্বাদময় এই জীবন! গারো পাহাড়ের মতো বড় আর সুবিশাল একটা রাজভোগের ভেতর, তার অফুরন্ত রস আর মাধুর্যের ভেতর যদি ছোট্ট একটা পিঁপড়েকে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তার কাছে তা যেমন আনন্দ আর উপভোগের এক অন্তহীন জগৎ বলে মনে হবে এ জীবনটাও তো আমাদের কাছে তেমনি।

বিনা মূল্যে বিনা দরখাস্তে পাওয়া এই অমেয় জীবন—অথচ উপেক্ষায় অনাদরে কী অসম্মানই না তাকে আমরা করি!

২৩২

প্রতিদিন আমরা যেসব কাজে হাত দিই, তাদের কটাই-বা শেষ অব্দি ভণ্ডুল হয়? অফিস, বাজার, রান্নাবান্না, বন্ধুদর্শন, খাওয়া-পরা, কেনাকাটা এমনি যেসব হাজারো দৈনন্দিন কাজ আমাদের করতে হয় তার কটাতেই-বা আমরা ব্যর্থ। সাধারণভাবে সবই তো প্রায় সফল। কদিনই-বা অফিসে যেতে চেষ্টা করে পেরে উঠি না? কদিনই-বা খাওয়া বাদ পড়ে কিংবা রান্নার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই? কটা দিন? সারা বছরের সর্বমোট কটি?

সফল তো হই প্রায় সব কাজেই। বড় ধরনের দুর্বিপাক না ঘটলে ব্যর্থতা কোথায়? ধরা যাক দিনে মোট ২৪টি কাজ হাতে নিয়েছি। ব্যর্থতা আসবে কটায়? খুব জোর তিনটা কি চারটায়। অর্থাৎ ধরতে পারি ২৪টা কাজে হাত দিলে গোটা বিশেক কাজে আমরা প্রতিদিন সফল হই।

এবার দেখি 'কোনো কাজে সফল' কথাটার মানে কী? মানে একটাই : আনন্দের প্রাপ্তিঘটা। কাজেই যদি দিনে ২০টা কাজে আমরা সফল হতে পারি, তবে দিনে ২০টা আনন্দ উপভোগের অপার তৃপ্তির অধিকারী হতে পারি। আর এই হারেই যদি প্রতিদিন কাজ চলে তবে এক মাসে ৬০০ আনন্দের, এক বছরে ৭২০০ আনন্দের, এবং যদি বছর ষাটেক এমনি কাজের মত্ততার ভেতর বেঁচে থাকতে পারি তবে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ আনন্দের এক অথৈ জীবনের শীর্ষকে স্পর্শ করতে পারি আমরা।

Scanned by CamScanner

এমন বিপুল অপরিমেয় আনন্দের আস্বাদ যে মানুষ একটা জীবনে পাবে, মৃত্যুর সামনে দুঃখিত বোধ করার তার কি কোনো কারণ থাকতে পারে?

জীবনের মুহূর্তগুলোকে কাজে ভরিয়ে রাখা কী জরুরি। আর এভাবে আনন্দের ভেতর মানবজন্মকে অর্থবান করা।

২৩৩

আজ আমেরিকা জাপান এমনকি ইউরোপের যে কোনো গরিব দেশের একজন সাধারণ শ্রমিক যেরকম বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে, স্বয়ং সম্রাট শাহজাহানও কি তেমন বৈভবময় জীবন কল্পনা করতে পারতেন? সকালবেলার সাধারণ নাশতা হিসেবে যে অনবদ্য মানের জ্যাম-জেলি-রুটি-মাখন-পনির সে টেবিলে পায়, রেস্তরাঁ বা হোটেলে সন্ধ্যায় দুপুরে যে রাজকীয় খাবার তার ভাগ্যে জোটে, চমৎকার পানপাত্রে যে অলৌকিক মদ্যের স্বর্গীয় সুস্বাদ অনুভব করে, যে নরম সুখদ বিছানার রেশমি রাজ্যে তার স্বপ্নময় অলীক রাত কাটে, টেলিভিশনের সুপরিসর রঙিন পরদায় বিশ্বসংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যকে সে যেভাবে উপভোগ করে, বিস্ময়কর গতিসম্পন্ন যে নিটোল সুন্দর ছোট গাড়িটাতে চড়ে সে ঘুরে বেড়ায়, যে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে সে গাড়ি চলে—না, ভারতের সম্রাট শাহজাহানের স্বপ্নেরও সম্পূর্ণ বাইরে এইসব অভাবনীয় ব্যাপারস্যাপার।

একেকবার ভাবি, কী ভাগ্য আমাদের, আমার যুগের প্রতিটা মানুষের। একে তো এই ছোট গ্রহটাতে জন্মেছিলাম মানুষ হিসেবে, বিশ্বচরাচরের আনন্দলোকের নিমন্ত্রণ পাওয়া শ্রেষ্ঠতম রসভোক্তা হিসেবে, তার ওপর জন্মেছিলাম ওই পৃথিবীটারও সবচেয়ে সম্পন্ন একটা যুগে—মানবসভ্যতার সবচেয়ে বিকশিত, জীবন-উপভোগের সবচেয়ে গরিমাদীপ্ত একটা সময়ে।

নিজের কথা যখন ভাবি তখন আরো দুটা বাড়তি লাভের কথা মনে আসে। প্রথমটা হল : সোনার চামচ মুখে অপর্যাপ্ত বৈভবের ভেতরে আমি জন্মাই নি। প্রাপ্তি আর প্রাচুর্যের স্থূল আর শ্বাসরুদ্ধকর চাপে বিত্ত তাই আমার কাছে দুর্বহ বা ক্লেদাক্ত চেহারায় দেখা দেয় নি। ঐশ্বর্যকে আমি দেখেছিলাম অক্ষতিকর দূরত্ব থেকে। বৈভব তাই আমার চোখে দেখা দিয়েছিল জ্যোতির্ময় দেবদূতের মহিমায়। বিত্তবান ছিলাম না বলে বৈভব আমাকে ছুঁয়ে গেছে, কিন্তু ধরা দেয় নি। বৈভবকে আমি ভালোবেসেছি দূর থেকে, তরুণ প্রেমিকের অসহায় করুণ উৎকণ্ঠায়, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর সোনার হরিণকে খুঁজেছিলেন সেভাবে।

দ্বিতীয় : আজ পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর একজন মানুষ জন্ম নেয় একটি মাত্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের ভেতর—সেটা হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। যেসব উন্নত দেশ এর বাইরে সেসব দেশের মানুষেরা, আমার ধারণা, পাশ্চাত্যের

Scanned by CamScanner

মানুষদের তুলনায় এক ডিগ্রি বেশি ভাগ্যবান—তারা জন্মায় দুটো সংস্কৃতির ভেতর। একটা তাদের নিজের অন্যটা আধুনিক পাশ্চাত্যের। যেমন একজন ভারতীয় বা একজন জাপানি নাগরিক নিজ সংস্কৃতির পাশাপাশি আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির ঐশ্বর্যেও একইভাবে সমৃদ্ধ ও আলোকিত।

কিন্তু আমাদের, আমাদের দেশের সেইসব উপমহাদেশীয় মুসলমানদের, যাদের জন্ম এবং আশৈশব লালন হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতে, কী অপার ভাগ্যবান আমরা। জন্মেছিলাম একসঙ্গে তিনটি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের ভেতর : মুসলমান হিসেবে ইসলামি সংস্কৃতির, ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতির এবং আধুনিক মানুষ হিসেবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির। কিন্তু কী সম্পন্ন উত্তরাধিকার আর কী তার বেদনাবহ অপচয়!

২৩৪

বাড়ি মাথায়-করা লুনার তিরিক্ষি মেজাজের মুখ ঝামটা আজো কানে বাজে :

সব বাড়িতে ছেলেমেয়েরা করে সমস্যা, বাপ-মা তাদের নিয়ে করে টেনশন। আমরা এমন এক বাড়িতে জন্মালাম যেখানে বাপ নিজেই সমস্যা পাকায় আর তাই নিয়ে টেনশন করে মরতে হয় আমাদের সবাইকে।

২৩৫

সেদিন আয়নায় নিজের মুখটার দিকে তাকিয়ে মনে হল একজন মানুষ ভালোবেসে এতগুলো বছর ধরে মমতায় আদরে এই মুখটাকে দেখেছে, হয়তো আর বেশিদিন দেখবে না।

২৩৬

পৃথিবীতে সব মানুষই তাদের স্বপ্নের চেয়ে ছোট, আমি হয়তো একটু বেশি ছোট।

২৩৭

মায়া হচ্ছে ভীরুতা।

২৩৮

অক্ষম বা শক্তিহীন লেখক, ব্যর্থ বা বিত্তহীন লেখক লিখুক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ বা জর্নাল, চম্পু বা লিমেরিক, গজল বা কাসিদা। হাজার হাজার লিখে ব্যর্থ হোক। ব্যাপারটা অত দুঃখের নয়। কম শ্রমের ছোট লেখা—ব্যর্থ হলেই-বা কী! চেষ্টা করলে আবার লেখা যাবে। আরো ভালো করে লেখা যাবে। কিন্তু অপারগ বা ক্ষমতাহীন লেখক যেন উপন্যাস না লেখে। অমানুষিক পরিশ্রমে, আত্মক্ষয়ী

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

পরিকল্পনায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার ভেতর দিয়ে হাজার হাজার শব্দের দুঃসাধ্য বিশাল অভ্রভেদী প্রাসাদ গড়ে তোলার পর তাঁকে যেন শুনতে না হয় তাঁর সব শ্রম তিনি কেবল জলের গায়ে দাগ কাটার জন্যে লিখেছিলেন।

২৩৯

মানুষ বৃদ্ধ হলে এসে দাঁড়ায় তার বাবার যৌবনের বিশ্বাসে।

২৪০

জীবনকে দামি বা মূল্যবান মনে করা মানুষই ভীরু মানুষ। সাহসী হচ্ছে এর উল্টোরা।

২৪১

সেদিন ঠিকঠাক জরিপ চালাতেই ধরা পড়ল আমাদের খ্যাতিমান লেখকদের ভেতর 'সম্পন্ন' পাঠক আজ কত কম। শুনতে ভালো না লাগলেও কথাটা সত্যি। যে অল্প কজন ভালো পাঠক আছেন তাঁদের মধ্যেও হাতে গোনা এমন মাত্র দুয়েকজনকেই হয়তো পাওয়া যাবে যাঁরা আমাদের সময়ে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো নিয়মিতভাবে সম্মান দিয়ে পড়েন। সবার ভাবভঙ্গি প্রায় এরকম : আমি লিখব, তোরা পড়বি। তুমি লিখলেও আমি পড়ব—এসব ভাবাটাও যেন একটা প্রেস্টিজের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকের জন্যে। এই অবস্থা চললে এই সাহিত্য বাঁচবে কী করে? উপেক্ষা আর উদাসীনতার শীতে এরই মধ্যেই তো সব মরে এসেছে!

২৪২

আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মানুষই আজ মাস্তান, যে যার জায়গায়।

২৪৩

মানবিক হওয়া মানেই আধুনিক হওয়া।

২৪৪

দেশের কজন ভালো মানুষ আইনের শাসন চাচ্ছে তার ওপর রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে না। আইনের শাসন নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় দস্যুরা তা চাচ্ছে কি না তার ওপর।

Scanned by CamScanner

২৪৫

বাঙালির অস্তিত্বগত সংকটের কারণে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ এখন ঈশ্বরের আসনে। সবখানেই বন্দনা, সবখানেই আবাহন। রাবীন্দ্রিকতার দাম বড় চড়া এখানে এখন। নাম উচ্চারণের আগেই বাজার বসে, মেলা জমে। এই তো সময় হে উৎসব পূজারীরা। মরম না জেনে ধরম বাখানোর এই তো সুবর্ণ মওকা। সুশোভন পাঞ্জাবি পরে সুসজ্জিতাদের সাথে মনোরম রাবীন্দ্রিক সন্ধ্যা উদযাপনে বেরিয়ে পড়ার মাহেন্দ্রক্ষণ।

২৪৬

আজো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংগঠনের নাম 'ব্যক্তি'।

২৪৭

স্বপ্ন হচ্ছে গন্তব্য।

২৪৮

কম্পিউটারে লেখা আরম্ভ করার পর থেকে আমাকে যেন লেখার মত্ততায় পেয়ে বসেছে। সারাদিন পাগলের মতো কেবলই লিখে চলেছি। এই উন্মাদনার উচ্ছৃতির যেন শেষ নেই। হাজার হাজার ভাবনা সবকিছুকে ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দিচ্ছে। এত কথা, এত স্বপ্ন, এত অস্তিত্বছেঁড়া আনন্দের অত্যাচার, এমন প্রচণ্ড উথালপাতালের দুর্ধর্ষ বন্যাতাকে কোথায় রাখি? থেকে থেকে কেবলই রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে :

পউষের পাতাঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস।
লজ্জা নাই, নাই ত্রাস।

প্রায় আমার বয়সেই, হয়তো আমার চেয়ে দু-চার বছর আগে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছরের দিকে লিখেছিলেন তিনি কথাগুলো। সত্যিই কি এমনটা হয়? কখনো কখনো ফিরে আসে যৌবন? মরে যাওয়া ভুলে যাওয়া বোকা হয়ে যাওয়া যৌবন? এমনি উষ্ণ রোমশ জলজ্যান্ত শরীরে, এমনি উদ্যত চোখে? সার সার মৃত যোদ্ধার মতো বর্শা হাতে জেগে উঠে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যায়? জীবনের মরা গাছের ডালে আগুনেরা এমনি তালে তালে নাচতে থাকে?

"যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে তারাও...জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে

Scanned by CamScanner

যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে
করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে যেন—

যৌবন যেন ল্যাজারাসের মতো পুনরুজ্জীবিত হয়ে ক্ষুধার্ত চিৎকার শুরু করেছে আমার চারপাশে। সেতারের ঝালার মতো মনকে উৎক্ষিপ্ত ব্যাকুল করে তুলেছে। কাজের ভিড়ে, আলস্যে, অপচয়ে যে হাজার হাজার কথা আমি লিখে যেতে পারি নি সেগুলো লেখার জন্যে মন উদগ্রীব হয়ে জেগে উঠেছে আজ। অথচ এমনি মুহূর্তে কী কষ্টকর খবরই না শুনতে হচ্ছে ডাক্তারদের কাছ থেকে।

হঠাৎ করেই সেদিন বুকের কাছে হাত রেখে মনে হল আমার বাঁ দিকের কণ্ঠার হাড়ের ঠিক নিচের পাঁজরের হাড়টা যেন একটু ফুলে উঠেছে। সন্দেহ হওয়ায় দুয়েকজনের পরামর্শ শুনে ডাক্তারের কাছে দেখাতে গেলাম।

আমাকে পরীক্ষা করে ডাক্তারের মুখে চিন্তার গভীর রেখা ফুটে উঠল। একেবারেই সময় নষ্ট না করে তিনি আমাকে সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থাপত্র দিলেন। পরীক্ষায় কী আসবে জানা নেই। এ পৃথিবীতে চিরদিন বাঁচতে পারে নি কেউ। সম্রাট রাজা মহামহিম কেউ না। একটা চিনা কবিতায় পড়েছিলাম : 'মহাকবিদের ডাকেও ওপার থেকে সাড়া দেন নি ঘরনী,/ আর আমি তো চলনসই পদ্য লিখি।' সেই চলনসই পদ্য লেখকও তো আমি নই। এসব অলীক ভাবনা আমার জন্যে অবান্তর। তবু একটা মানুষ, সে যত অবান্তরই হোক, তারও জীবনের উর্বরতা আর সম্ভাবনার একটা শীর্ষ থাকে। একেক মানুষের সেটা আসে জীবনের একেক পর্বে। আমার এটা চলছে আজ। হয়তো একটু দেরি করেই, এই সাতান্ন-আটান্নর দিকেই এসেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কাজে কাজে ভরে আছে জীবন। আগামী তিন বছরে তিনটা বড় বড় কাজ করতে হবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক ভবনটা তৈরি করতে হবে, কেন্দ্রের শাখা তিন শ থেকে বাড়িয়ে পাঁচ শ-তে নিতে হবে, আর অন্তত বিশটা নতুন বই লিখে শেষ করতে হবে। এই কাজগুলোর তিনটিই ভারি দরকারি। সাংস্কৃতিক ভবন তৈরি না হলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আর্থিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হবে না, আমার মৃত্যুর সঙ্গেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। শাখার সংখ্যা না বাড়ালে কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় কর্মসূচিটাই—সারাদেশে আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার স্বপ্নটাই—ঠিকমতো অর্জিত হবে না। আর বইগুলো লিখে শেষ করতে না পারলে নিজের ভেতরের স্বপ্নচারী দীর্ণ মানুষটাকে অন্যের কাছে তুলে ধরার সব কাতরতা মিথ্যা হয়ে যাবে। জীবনের সোনালি মধুর মুহূর্তগুলোর সাধ আকাঙ্ক্ষা আর ব্যর্থতাগুলোকে, মস্তিষ্কগ্রাসী ঘাতক কষ্টগুলোকে কোনোদিন শব্দবর্শায় আর্তনাদমুখর করে রেখে যেতে পারব না। কত হাজার লক্ষ কথা

Scanned by CamScanner

দাবানলের মতো গনগনিয়ে উঠেছে মনের ভেতর, কত অপর্যাপ্ত, রঙিন সম্ভার অপার্থিব হয়েছে জীবনে—সব আমার সঙ্গে কবরের ভেতর নিঃশব্দে শুয়ে থাকবে, যেন এরা একরাশ মিথ্যা ছিল কতগুলো, কিংবা কোনোদিন ছিলই না কোথাও এই পৃথিবীতে। এমনি এক অচরিতার্থতার দুঃখ নিয়ে মৃত্যুর আগে কিটস লিখেছিলেন :

> যখন ভয়ে ভয়ে ভাবি আমার কলম আমার উর্বর মস্তিষ্কের উপচোনোগুলো কুড়িয়ে নেবার আগেই এই পৃথিবী থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে, দেখতে পাব না জীবনের পূর্ণপক্ব শস্যেরা বৈশিষ্ট্যের অসামান্যতায় আমার লেখা রাশি রাশি বইয়ের সম্ভারকে কেমন সুবিখ্যাত ভাঁড়ার করে তুলেছে; যখন ওই তারা-ভরা রাতের অপরূপ আকাশের দিকে তাকিয়ে সম্পন্ন স্বপ্নলোকের বিপুল মেঘ-ওড়া প্রতীক দেখতে দেখতে আমি আমি বুঝতে পারি সৌভাগ্যের কোনো জাদুকরী প্রভাবেই মেঘরূপের ওই মায়ালোককে এঁকে যাবার সুযোগ আমি পাব না ; যখন মনে হয়, প্রিয়তমা, হে আমার পলকের নশ্বর সন্তান, তোমাকে এভাবে তাকিয়ে দেখার সুযোগও পাব না আমি আর, তোমার প্রতিদানহীন প্রেমের অলীক শক্তিকে এভাবে আর অনুভব করব না; তখন—
> —যতদিন না প্রেম খ্যাতি সবকিছু ধুলোয় একাকার হয়ে যাচ্ছে ততদিন এই বিপুল পৃথিবীর কূলে দাঁড়িয়ে এই দুঃখগুলো নিয়ে বেঁচে থাকাই আমার নিয়তি।

এমন অসাধারণভাবে প্রকাশ করতে পারব না, কিন্তু আমার কষ্টগুলো অনেকটা এরকমই।

১.১.৯৭

২৪৯

গল্পে উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠুররকম বাস্তববাদী। জীবন ঠিক যেমন হুবহু তেমনিভাবে জীবনকে তিনি এঁকেছেন। স্বপ্নের আবির মাখাতে গিয়ে কোথাও কোনোকিছুকে এদিক-ওদিক করেন নি। এ জন্যেই গল্পে তিনি এত বড়। ওই নির্মোহ নিষ্ঠুরতাটুকুর জন্যেই বড়। তাঁর উপন্যাসগুলোর শ্রেষ্ঠত্বও একই কারণে। এগুলোতেও আমরা জীবনের সৎ ও রক্তাক্ত মুখাবয়ব দেখতে পাই। আদর্শ বা স্বপ্নের মোহে সত্যকে তিনি অপমান করেন নি। তাঁর লেখায় প্রেম, লোভ, নীচতা, দাম্পত্য, প্রকৃতি কিংবা মানুষ আসলে হুবহু প্রেম, লোভ, নীচতা, দাম্পত্য, প্রকৃতি বা মানুষেরই মতো। শেষের কবিতার অপার্থিব প্রেম কলকাতা শহরের বাস্তবের কুৎসিত রাস্তায় গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, তাই শিলং পাহাড়ের শিখরছোঁয়া অভ্রভেদী প্রকৃতির জগতে, স্বর্গের অলীক কিনারায় তিনি সেই অবিশ্বাস্য প্রেমের বাসর রচনা করেছিলেন। কিন্তু গোরা উপন্যাসে, অত্যন্ত হিসেব করেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত শহর কলকাতার এক অস্বস্ত কালপর্বকে।

Scanned by CamScanner

শেষের কবিতার কথাই ধরা যাক। কেন লিখেছিলেন তিনি বইটি? এটি লিখেছেন তিনি বহুচারিতার সমর্থনে। কী বক্তব্য বইটার? বক্তব্য : মানুষ বহুচারী। পুরুষ নারী উভয়েই। বিবাহ আরোপিত প্রথা। এর সীমানা সংকীর্ণ বলে তা মানুষের মৌল স্বভাবকে পদদলিত করে। মানুষের ভেতরকার অবারিত যৌন কামনাকে তা তৃপ্ত করতে পারে না। এইজন্যে দাম্পত্য জীবনের স্বামী বা স্ত্রীর মতো বিবাহবহির্ভূত সঙ্গী বা সঙ্গিনী তার জীবনে অপরিহার্য, বাস্তব জীবনে না হলেও মনোজগতে। ঘরের ভেতরকার ঘড়ায় তোলা জলের মতো দূরের দিঘির অবারিত সাঁতার—এ দুইয়ের কোনোটা না হলেই সে বাঁচে না। এ কেবল পুরুষের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়, নারীর ক্ষেত্রেও। এ কথা ঠিক যে প্রকৃতিরাজ্যে নারী জীবজাগতিক ধারাকে বহন করে বলে তার ভেতর কেন্দ্রানুগ শক্তির সক্রিয়তা বেশি, কিন্তু তার মধ্যেও বহুচারিতার স্বপ্ন পুরুষের মতো প্রায় একইভাবে সজীব। এমনকি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাজার হাজার বছরের স্টিমরোলারও তার এই স্বপ্নকে খুব একটা মেরে ফেলতে পারে নি। এই জন্য শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেবল অমিত রায়কেই ঘরের ভেতরকার ঘড়ার জল আর দূরের দিঘির অবাধ সাঁতারের ব্যবস্থা দেন নি, দিয়েছেন লাবণ্যকেও। অমিতকে ঘরের ঘড়ার জল হিসেবে কেটি আর দূরের দিঘি হিসেবে লাবণ্যকে; তেমনি অমিতের মতো লাবণ্যকেও—ঘরের ঘড়ার জল হিসেবে শোভনলাল আর দূরের দিঘি হিসেবে অমিতকে দিয়েছেন।

২৫০

সারা জীবন আকুতি ছিল : জীবন যেন কষ্টকর না হয়। আজকে সেই প্রার্থনা মৃত্যুর জন্য।

২৫১

মৃত্যুর সামনে মানুষ জীবনের পাওয়াকে ভুলে যায়।

২৫২

বৈষয়িকতা আর ধার্মিকতা দুটোই ইন্দ্রিয়জাগতিক ব্যাপার। একটা ইহকালের, একটা পরকালের।

২৫৩

আমি যেখানে যেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকি না কেন সময়ের স্রোত আমাকে পেছনের দিকে ভাসিয়ে নিচ্ছেই। যৌবনে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি যদি একঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি তবে বৃদ্ধ বয়স আসতে আসতে ওই স্রোত পেছনের দিকে ঠেলে ঠেলে আমাকে

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

প্রতিক্রিয়াশীলতার কাছে নিয়ে যাবে। ওই স্রোত যে গতিতে আমাকে পেছনের দিকে ভাসিয়ে নিচ্ছে যদি হুবহু একই গতিতে আমি সামনের দিকে এগোতে পারি তবেই আমি কেবল যে জায়গাটায় আজ দাঁড়িয়ে আছি বুড়ো বয়সেও সেখানে থাকতে পারব। কালের স্রোত যে গতিতে আমাকে পেছনে ঠেলছে তার চেয়ে যে পরিমাণ বেশি গতিতে আমার চেতনাজগৎ সামনের দিকে এগোবে বার্ধক্যে বা যৌবনের তুলনায় আমি সেই পরিমাণে থাকব প্রগতিশীল।

অনেক প্রগতিশীল মানুষকে দেখেছি যৌবনে চিন্তাভাবনার যে জায়গায় তাঁরা ছিলেন, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কঠোর সততার সাথে সেই অবস্থানকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। এতে তাঁদের বিশ্বাসের অবিচলতা প্রমাণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এককালের সেই অভিনন্দিত প্রগতিশীল লোকটি কখন যে সভ্যতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলের উচ্ছিষ্ট প্রেতাত্মায় পরিণত হয়েছেন তা হয়তো তিনি বুঝতেও পারেন নি।

২৫৪

জীবনে সমস্যা আর সংগ্রামের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে সে নায়ক। ভিলেন সে, যাকে এটা করতে হয় না।

২৫৫

অবৈষয়িক মানুষই ধার্মিক মানুষ। জীবনের মতো ধর্মের ব্যাপারেও এদের আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তি নয়, প্রেম।

২৫৬

একটা যুগে যত 'ভালো লেখক' থাকে 'ভালো সমালোচক' তার দশ ভাগের এক ভাগও থাকে না। প্রতিভাবানদের বুঝতে অনেক সময় যে যুগ যুগ পার হয়ে যায় তার কারণ এটাই।

২৫৭

সাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষের চেয়ে ছোট নয়, বিপরীত।

২৫৮

কোনো যুগই নায়কবিহীন নয়। সবচেয়ে অনটনকবলিত কালও সে যুগের হাস্যকর ভাঁড়দের ভেতর থেকে তার যুগনায়কদের তৈরি করে নেয়।

২৫৯

আমার ছেলেবেলায় এদেশ ভরা ছিল গরিব মানুষে। আজ ভিখিরিতে।

Probal Ahmed
Scanned by CamScanner

২৬০

হাস্যরস এক ধরনের ক্ষমা। অস্তিত্বের স্বার্থে জীবনের নিষ্ঠুর বৈষম্যকে প্রাণখোলা হাসিতে ক্ষমা করে নিজেকে বাঁচানো।

২৬১

ওরা আমার তুলনায় দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় বেশি, আমি প্রিয় বেশি।

২৬২

আমি নৈতিক নই, নান্দনিক। আমার কাছে যা অগ্রহণযোগ্য তা অনৈতিকতা নয়, সৌন্দর্যহীনতা।

২৬৩

নৈরাশ্যবাদী আর আশাবাদীর পার্থক্য এই যে আশাবাদী দুর্ভাগ্যকে সাময়িক ব্যাপার বলে মনে করে, নৈরাশ্যবাদী চিরস্থায়ী ব্যাপার বলে।

২৬৪

অনেকদিন আগে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে একজন বিদেশী গায়ক—সম্ভবত পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশের—আমাদের গোটাকয় রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ভদ্রলোক যেমন বলিষ্ঠ তেমনি প্রাণবন্ত। হাতের গিটারের উত্তাল সঙ্গীতোন্মত্ততার সঙ্গে নেচে, আনন্দ আর শক্তিমত্তায় উদ্বেলিত হয়ে আত্মবিস্মৃতের মতো গান করেছিলেন তিনি। তাঁর গানগুলোর ভেতর সঙ্গীতের সর্বোচ্চ রূপটি যেন দেখতে পারছিলাম আমরা। উদ্দাম আবেগে মথিত হয়ে উঠছিল তাঁর আশীর্ষপদতল অবয়ব। শরীরকে নানান কষ্টকর মধুর ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে, কখনো মাটির সাথে নুইয়ে দিয়ে, কখনো পেছন দিকে ধনুকের মতো টানটান করে বাঁকিয়ে, কখনো গিটারের সাথে চিবুক এবং বেদনাকে একাত্ম করে, সঙ্গীতের প্রতিটা সূক্ষ্ম মধুর অস্ফুট অভিঘাতকে হৃদয়ের ভেতর অনুভব করে করে তিনি গান করছিলেন। মানুষের ভেতর সঙ্গীতের সেই অগ্নিময় প্রজ্বলনের ঐশ্বরিক দৃশ্য ভোলার নয়। মনে হচ্ছিল তাঁর গাওয়া প্রতিটা গানের অনির্বচনীয় সাঙ্গীতিক প্রাণনা যেন তাঁর শরীর-মনের দুর্বার শক্তিমত্তার পরতে পরতে আগুন লাগিয়ে রক্তিম জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গে চারপাশে ঠিকরে পড়ছে।

ছেলেবেলা থেকে ভেদাভেদহীন অসংখ্য গায়কের গলায় পরিচিত গতানুগতিক ঢঙে একঘেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে আমরা অভ্যস্ত। প্রাণহীন নীরক্ত সেসব গান। এই ভদ্রলোকের জীবনের শক্তিতে বলীয়ান গানগুলো ছিল সেসব থেকে অনেক দামি

Scanned by CamScanner

জিনিস। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভেতর সঙ্গীতৈশ্বর্যের পরাক্রান্ত বহ্নিকে যেন চোখের সামনে নেচে উঠতে দেখেছিলাম সেদিন। রবীন্দ্রনাথের রক্তধারায় যে বহ্নিমান জীবনাগ্রহ নিদ্রাহীন ছিল তাঁর সঙ্গীতের পরতে পরতেও তিনি তা সঞ্চারিত করে গিয়েছেন। সেই শক্তিকে ধারণ করার মতো যোগ্য মানুষ এসে দাঁড়ালেই সেই অগ্নিকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের একঘেয়ে অসাড়তার ভেতর তাঁর সেই সঙ্গীতৈশ্বর্য আমাদের চেতনার কাছে অগোচর থেকে যায়।

আমার মনে হয়, আমাদের চারপাশের প্রায় কোনো গায়কই রবীন্দ্রনাথের ভেতরকার সেই অদম্য প্রাণশক্তিকে ধারণ করতে পারেন না। আমাদের অক্ষমতার আর অযোগ্যতার ভেতর আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রাণহীন অসাড় করে তাঁকে প্রতিনিয়ত হত্যা করছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বসে তখন ছেলেদেরকে মনে হয় মেয়ে, মেয়েদের বিধবা। তাদের অস্ফুট অক্ষম রক্তকণিকায় রবীন্দ্রবহ্নি কোনো ঐশ্বরিক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত করে না। রবীন্দ্রনাথকে কী করে আমরা বাঁচাব? রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য যে তাঁর জীবন–প্রাণনাকে ধারণের অযোগ্য একটা জাতির ভেতর তিনি জন্মেছিলেন। এত উদ্দাম উচ্ছ্রিত প্রাণশক্তি নিয়েও এই জাতির কাছে তাই তিনি কার্যত অপরিচিতই রয়ে গেলেন। তাঁর জ্বলন্ত জীবনকে ধারণের অযোগ্য জাতি তাঁকে দেবতার সম্মানে অভিষিক্ত করে, মানুষের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে, তাঁর সুযোগ্য ধারণের অপ্রীতিকর যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের পথ বের করে নিয়েছে।

২৬৫

মোল্লা আছে সব জায়গায়। প্রতিক্রিয়াশীলতার যেমন মোল্লা আছে, তেমনি আছে প্রগতিশীলতার মোল্লা। বাঙালি মোল্লা, রাবীন্দ্রিক মোল্লা—কোনখানে মোল্লা নেই?

মোল্লা সম্প্রদায়গত নয়, জন্মগত ও পরিপার্শ্বগত।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ধাঁচে বলতে গেলে মোল্লা মানে অদার্শনিক, অমননশীল একমাত্রিক মানুষ। বুদ্ধি ও চিন্তার সামনে হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া তেড়িয়া মানুষ। অকর্ষিত, কঠোর, ত্বকসর্বস্ব জল্লাদ মানুষ। বোকা, অপ্রস্তুত, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন উপস্থিত মানুষ। অবিকশিত অসহায় করুণাযোগ্য মানুষ।

২৬৬

ধর্মান্ধতা আমাদের নিয়তি। আমাদের প্রতিক্রিয়াশীলেরা যেমন ধর্মান্ধ, তেমনি ধর্মান্ধ প্রগতিশীলেরা। শক্তির অভাবে সবাই অবতারবাদী, সমর্পিত। ছাত্র–কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী সবাই উত্তেজিত, ভাবোন্মাদ। শক্তি নেই বলে যুক্তির ভারসাম্য নেই। পরমতসহিষ্ণুতা নেই। সবচেয়ে যুক্তিবাদীও অন্তর্গত রক্তে মোল্লা, ফতোয়াবাজ।

Scanned by CamScanner

বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন এই দেশে এত কবি, শিল্পী, গায়ক, ধার্মিক আর মরমীয়া। কেন নেই কর্মবীর? কেন একজনও দার্শনিক নেই।

১৯৯৩

২৬৭

আজ থেকে পঁচিশ বছর পর ঢাকায় সারা দেশের রাষ্ট্রীয় দস্যুদের এক মহাসম্মেলন হবে। নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ওই লুণ্ঠনকারীরা সেই সম্মেলনে সেদিন এক মহতী প্রস্তাব পাস করবে। তারা সিদ্ধান্ত নেবে : 'আজ থেকে দেশে সবরকমের দস্যুতা (ব্যক্তিগত, দলীয় বা রাষ্ট্রীয়) সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কেবল নিষিদ্ধ নয় ওই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মান্য ও অলঙ্ঘনীয়। এটা তারা করবে এ জন্যে যে আজকের এই দস্যুতাকে অবারিতভাবে চলতে দেওয়া হলে যা সর্বপ্রথম আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হবে তা হচ্ছে অবাধ দস্যুতার পথে গড়ে তোলা তাদের এতকালের বিত্ত ও সম্পদের অবৈধ বিশাল ভাণ্ডার। নিজেদের লুণ্ঠিত ধন–সম্পদের বৈধতা দেবার জন্যে লুণ্ঠনের ইতি টানার ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের।

অর্থাৎ জাতীয় দস্যুদের স্বার্থরক্ষার পথ ধরে তাদের অজান্তেই হয়তো আমাদের সমাজে সূচনা ঘটবে আইনের শাসনের।

আজ জাতির ভাগ্যবিধাতারাই যেখানে বিবেকবর্জিত দস্যু, সেখানে এই মুহূর্তে আইনের শাসনের ভবিষ্যৎ কোথায়?

১৯৮৬

২৬৮

কিছুদিন থেকেই টের পাচ্ছি ধীরে ধীরে 'ম' আর 'সা' দুজন দুজনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। 'কেন্দ্রে' একজনকে দেখতে পেলাম কি মুহূর্তে আরেকজন শাঁ করে এসে উপস্থিত।

কী করে জ্যৈষ্ঠের মৌমাছির মতোন যে টের পেয়ে যায়!

অন্যদের ব্যঙ্গ, সমালোচনা, ভ্রূকুটি, চাউনি অনায়াসে উপেক্ষা করে এক অপার্থিব খুশির জগতে দেবশিশুর মতো বিরতিহীনভাবে ওরা কথা বলে চলে...।

আজ রাত্রে গাড়িতে আমার সঙ্গে উত্তরায় ওদের বাসায় ফিরল 'সা'। কিছুক্ষণ আগেও আমতলায় বসে ওরা বিভোরভাবে কথা বলছিল। সেই খুশির আলো তখনো ওর মুখের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছিল কোনো এক অপরিমেয় স্বপ্নের দিকে যেন চোখ ফিরিয়ে আছে ও।

অপার খুশির ভেতর ডুবে গিয়ে গুনগুন করে গাইছিল 'সা'। একসময় আনমনে গাড়ির বৃষ্টিভেজা কাচের ওপর অকারণ আঙুল বোলাল কিছুক্ষণ, যেন স্বপ্নের রুমালে ফুল তুলল। হঠাৎ বাইরের দিকে উদ্ভাসিত ইশারা করে পেছনের সিটের

Scanned by CamScanner

'ল'কে বলল, দেখেছ কী আলো ওদিকটায়। মনে হচ্ছে যেন ভোর হচ্ছে।

'ল' মনে করিয়ে দিল, ওটা ভোর নয়, গলফ মাঠের আলো। রোজ সন্ধ্যায় জায়গাটাকে এমনটাই দেখায়।

সবার মধ্যে এমনি সব ছোট ছোট কথা চলছিল থেকে থেকে।

এমন সময় হঠাৎ অনেক দূরের আলোকিত এয়ারপোর্টটার দিকে তাকিয়ে ঠিক আগের মতোই 'সা' বলল : কী আলো ওদিকটায় না! মনে হয় ভোর হচ্ছে।

'সা' আজকাল রাতের বেলাতেও কেবলই ভোর দেখতে পাচ্ছে।

মনে পড়ছিল, অনেকদিক আগে একদিন আমিও এমনি ভোর দেখতাম। এখন রাত মানে কেবলই রাত। ঘুটঘুটে কালো পাথরের মতো অন্ধকার।

১৯৯৪

২৬৯

আজ একটা অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি। চিঠিটার বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যাচ্ছে পত্রলেখক আমার একজন একনিষ্ঠ টিভিভক্ত। আমার 'বিস্রস্ত জর্নাল' উপন্যাসটা (?) হাতে পেয়ে গভীর শ্রদ্ধায় পড়তে বসেছিল সে। প্রতিটি জর্নালকে এক্কেকটা অধ্যায় ধরে নিয়ে উপন্যাসের মূল কাহিনীটি প্রাণপণে খুঁজে বের করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আমার কাছে তার সনির্বন্ধ অনুরোধ যেন উপন্যাসের কাহিনীটা সংক্ষেপে তাকে লিখে জানাই যাতে সে তার বাকি শক্তি একখানে করে এই অসাধারণ (?) বইটার সামগ্রিক মর্ম বুঝে নিতে পারে। চিঠির শেষে মৃদু অনুযোগের সঙ্গে আমাকে উপদেশ দিয়ে লিখেছে : এই মূর্খ দেশে এমন 'উপন্যাস' লেখাই-বা কেন যা এত 'খটকা করে' বুঝতে হয়?

চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে একজন শুভানুধ্যায়ীকে বলছিলাম 'জর্নাল'কে উপন্যাস ধরে নেওয়ায় কী বিপদেই না পড়েছে ছেলেটা! শুভানুধ্যায়ী বললেন, কেন, উপন্যাস কেন হতে যাবে ওটা? চোখ খোলা রাখলেই তো বোঝা যায় লেখাগুলো গল্প। প্রত্যেকটার ওপরে নিচে নম্বর তারিখ সবই তো দেওয়া আছে!

১৯৯৪

২৭০

শুনেছি ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁকে একবার প্রধান অতিথি করে শিশুদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক জবরজং প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগী শিশুদের দাঁতমুখ খিচিয়ে কালোয়াতি করতে দেখে ওস্তাদজীর মনে নাকি খুব চোট লেগেছিল। প্রধান অতিথির ভাষণে ধরা গলায় বলেছিলেন, দেখিয়ে, বাচ্চে লোগ বড়ি পেয়ারি চিজ হ্যায়। শিশুরা বড় আদরের জিনিস। বুলবুলির মতোন ওরা নিজের খেয়ালে গান গেয়ে আমাদের মন জুড়িয়ে দেবে। কিন্তু বড় মানুষদের মতো হারজিতের দৌড়ে ওদের কেন এভাবে ঠেলে দিলেন যাতে এমন সুন্দর শিশুদেরও কুৎসিত লাগছে।

Scanned by CamScanner

আমাদের টেলিভিশনেও প্রতি বছর জাতীয় ভিত্তিতে শিশুদের এমন একটা আলিশান প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। নাম 'নতুন কুঁড়ি'। এর কাজ হল দেশ জুড়ে নানান ধরনের গান, নাচ, নাটক, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি এসবের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে দেশের শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পীদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করা। কিন্তু প্রশ্ন হল শিশু তো শিশুই। শিশুর আবার শ্রেষ্ঠত্ব কী? 'সফল শিশু' বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। জয়-পরাজয়, সাফল্য-শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, মহত্বপূর্ণতা—এসব বড়দের জগতের ব্যাপার। শিশুদের জীবনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্যই এটা যে, তারা অসম্পূর্ণ, অক্ষম। চারপাশের কোনো কিছুকেই তারা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না, স্পষ্ট করে দেখে না। এই আধো-দেখা, আধো না-দেখার অসহায়তা দিয়েই ওরা আমাদের জয় করে নেয়। ওদের অসহায় ভাবটুকুর জন্যেই বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে ওদের আমরা বাঁচাতে চাই। বড় হওয়ার সাথে সাথে, এই অসহায়তাগুলো কমতে শুরু করলে, তাদের জন্যে আমাদের এই বাৎসল্যের পতন ঘটতে শুরু করে।

শিশুর দেখার জগৎ বোঝার জগৎ দুই-ই অসম্পূর্ণ। কোনো জিনিসের যে জায়গাটি তার কাছে সবচেয়ে অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর বা রঙচঙে লাগে তার ভেতরেই সে তার মনোযোগের ছোট্ট পুঁজিটুকুকে পুরোপুরি বিনিয়োগ করে বসে। এটা সে এতটাই করে যে জিনিসটির বাকি আর সবকিছু তার চেতনা থেকে হারিয়ে যায়। 'পথের পাঁচালী'তে বনের পথে জীবনে প্রথমবার খরগোশ দেখার মুহূর্তে অপু খরগোশের শরীরের তুলনায় অসঙ্গতরকমের বড় বড় কান দুটো দেখে হতবাক হয়েছিল। বাকহীন বিস্ময়ে বাবাকে ফিরে ফিরে কেবলই জিজ্ঞেস করেছিল ; 'কী গেল বাবা ওই যে বড় বড় কান।'—কান দুটোই তার কাছে পুরো খরগোশ হয়ে উঠেছিল। হয়তো খরগোশটার চেয়েও বড়। এই তো শিশুর জগৎ। সে পুরোকে দেখতে পায় না, কোনোকিছুর সবচেয়ে জ্বলজ্বলে ব্যাপারটাকে সে পুরো জিনিস বলে ভুল করে। একটা উদাহরণ দিই। ধরা যাক একজন শিশু দেখতে পেল একজন কার্ডিগান পরা ভদ্রমহিলা এগিয়ে আসছেন, তাঁর কার্ডিগানের লালরঙের বড় বড় বোতামগুলো তাদের উজ্জ্বল রক্তিমতা নিয়ে চোখের সামনে ধকধক করছে। তখন ওই লাল বোতামগুলো শিশুটির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তার মনকে সেই সৌন্দর্যের ভেতর এমনভাবে আবিষ্ট করে ফেলবে যে এরপর ওই শিশুটিকে যদি কেউ সেই ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তবে সে হয়তো প্রথমেই বলে উঠবে : 'কে ওই যে লাল বোতাম।' যদি তাকে ওই মহিলার একটি ছবি আঁকতে বলা হয় তা হলে সে কী করবে? হয়তো সরু সরু হাত-পাওয়ালা একজন মহিলাকেই সে আঁকবে—যার সঙ্গে ওই মহিলার কোনো বাস্তব মিল না-ও থাকতে পারে। যাই তাই করে কার্ডিগানের মতোন কিছু একটা তার গায়ে চড়িয়ে দেবার চেষ্টাও হয়তো করবে সে। কিন্তু বোতাম আঁকার সময় সে করবে তার স্বপ্নকল্পনার সবচেয়ে সমৃদ্ধ কাজটি। রক্তের মতো তাজা লাল রং দিয়ে ছবিটার মাঝবরাবর হয়তো চারটা ইয়া বড় লাল

Scanned by CamScanner

বোতাম এঁকে দেবে—সেগুলোর লাল ছোপ এতটাই বড় হবে যে সেসবের আড়ালে গোটা মহিলাটিই হয়তো ঢাকা পড়ে যাবে। তার ছবিতে লাল বোতামগুলোই ওই মহিলা হয়ে উঠবে। সবকিছুকে যথাযথ রেখে বাস্তব পৃথিবীর অবিকল ছবি শিশুরা আঁকতে পারে না। তাই নিখুঁত কিছু আঁকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ওটা পারে বড়রা। সবকিছুকে পুরোপুরি দেখতে পায় বলে পারে।

এই জন্যই শিশুর পৃথিবী কেবল অসম্পূর্ণ নয়, নানানভাবে গোলমেলে। রঙের ব্যবহারে, পরিপ্রেক্ষিতের ধারণায়, বস্তু বা দৃশ্যের বিন্যাসে অবাস্তব আর উদ্ভট। ছোট সেখানে বড়কে ডিঙিয়ে যায়, বড় কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে তার খবর থাকে না।

যে শিশু এমন অবিকশিত, কাঁচা আর ভুলে ভরা—অসম্পূর্ণ বলেই অনবদ্য, অসহায় বলেই আদরণীয়, সে কী করে শিল্পের সম্পূর্ণ ভুবনকে উপহার দেবে? কেন দেবে?

তবু শিশুদের কেউ কেউ যে তা করছে না তা নয়, না হলে ফি-বছর আমরা এত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া 'শ্রেষ্ঠ' শিশুশিল্পী পাচ্ছি কী করে। এখন প্রশ্ন—এই সফল শিশুরা তবে কারা?

এক ধরনের শিশু আছে যারা গড়পড়তা শিশুদের চেয়ে এগোনো। বয়সের দিক থেকে বা দেখতে শুনতে শিশু হলেও মস্তিষ্কগতভাবে পরিণত মানুষ। দশ বছর বয়সে এদের মানসিক বয়স হয়ে পড়ে পঁচিশ বা তিরিশ বছরের বয়সের মানুষের মতো। আর হয় বলেই একজন স্বাভাবিক শিশুর অপরিণতি, ভুল, অসহায়তা উৎরে পরিণত মানুষের সুসম্পূর্ণ পৃথিবী এরা অনায়াসে তৈরি করে ফেলতে পারে। আমরা, নতুন কুঁড়ির ব্যবস্থাপকেরা, এদের এই সব শিশুত্ববিরোধী ব্যাপারটাকে শিশুর সর্বোচ্চ সাফল্য বলে ভুল করে তাদের জাতীয় পুরস্কার দেন। পরবর্তী জীবনে উচ্চতর সাফল্য দেখানো এককালের এই সব শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কীভাবে দেখাবে সাফল্য? শিশুবয়সে অস্বাভাবিক এগিয়ে থাকা এই শিশুরা নিজেদের এই অগ্রসরতার খেসারত দেয়। যখন তাদের বয়স আট তখন তাদের মানসিক বয়স যদি তিরিশ হয়ে থাকে তবে যখন তাদের বয়স চল্লিশ হবে তখন বুদ্ধি আর অনুভূতিগতভাবে তারা তো হবে এক শ উনষাট বছরের বৃদ্ধ। এই নির্বীর্য বার্ধক্য দিয়ে কী করে শিল্পের রক্তিম ভুবন উপহার দেবে তারা?

সফল শিশুর ছদ্মাবরণে কিছু অকালবৃদ্ধকে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিশু হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে এদেশে। এটা চালু না রাখলেই কি নয়। দেশের প্রকৃত শিশুত্ব প্রতি বছর এদের উপেক্ষার নিচে অবহেলায় অসম্মানে মরে যাচ্ছে যে!

সিদ্ধান্ত 'সর্বোচ্চ ভালো'র পক্ষে নেওয়া হয় না, নেওয়া হয় 'তুলনামূলক ভালো'র পক্ষে।

Scanned by CamScanner

২৭২

প্রাক্তন সুন্দরীদের সুবিধা এখানে যে তাদের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রেমিকদের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসে।

২৭৩

ইতিহাস তো আসলে সাম্প্রতিকতম সময়।

২৭৪

বিশ্রাম মানে কাজ না-করা নয়, অন্য কাজ করা।

২৭৫

যার দানের কথা অন্যে জানে, সে দেয় না, নেয়।

২৭৬

আজকের বাংলাদেশের বড় মানুষ তারাই যারা মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসে।

২৭৭

কেবল স্বকালের যুবকদের কাছে নয়, পরের প্রজন্মের যুবকদের কাছেও একইরকম সুন্দরী থাকতে চায়—এটাই হল সুন্দরীশ্রেষ্ঠাদের ট্র্যাজেডি।

২৭৮

নিয়ম মানে কোনো কাজকে সবচেয়ে সহজে, লাভজনকভাবে ও সর্বোত্তমভাবে করতে পারার উপায়।

২৭৯

মৃত্যু দরোজার ওধারে। কতটা মর্যাদার সঙ্গে এখন একে মোকাবেলা করা যাবে, এটাই দেখার বিষয়।

২৮০

সমবয়সীদের কাছে নবী হওয়া কঠিন।

২৮১

কোনো আক্রমণের আসল জবাব প্রতিরক্ষা নয়, প্রতি আক্রমণ।

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner

২৮২

ক

আশ্চর্য সুন্দর জায়গায়—প্রকৃতির একেবারে কোলের ভেতর—লেকের ধারে আমাদের বাড়ি। ইংরেজিতে যাকে কর্নার প্লট বলে আমাদের প্লটটাও তাই। বাড়ির পুব-দক্ষিণ দুটো দিকেই রাস্তা। দুটো দিকই খোলা, আলো-উপচানো। বাড়ির সামনে দিয়ে লেকের ধারঘেঁষে উত্তর দক্ষিণ বরাবর দীর্ঘ সোজা রাস্তাটা সরাসরি চলে গেছে। বাড়ির পাশের রাস্তাটা ওই রাস্তা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দক্ষিণ ঘেঁষে গাছপালার নিবিড় জগতের ভেতর সরু হতে হতে হারিয়ে গেছে। সামনের রাস্তার ধার বরাবর ইউক্যালিপটাসের রহস্যময় দীর্ঘ সারি। দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা উত্তাল হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসগুলোর বেণির মতো দীর্ঘ ঝোলানো সবুজ পাতাগুলো সারাদিন ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে আর গাছের কচি পাতাওয়ালা মাথাগুলো এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করে দিনরাত কেবলই নড়ে.....কেবলই নড়ে.... । এই চির-তারুণ্যের চির-রহস্যের যেন শেষ নেই।

উত্তরার সবচেয়ে শান্ত আর নির্জন জায়গায় এই বাড়ি। শহরের ভেতরকার একটা জায়গা যতটা জনবিরল হতে পারে এই জায়গাটা ঠিক তাই। বাসার ঠিক সামনেই উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ বিরাট উত্তরা লেক। দক্ষিণে বিমানবন্দরের পাঁচ মাইল ফাঁকা জায়গার পর ক্যান্টনমেন্ট আর গলফ ক্লাবের সবুজ নিরবচ্ছিন্ন পৃথিবী। সারা বছর অফুরন্ত হাওয়া ওই বিস্তীর্ণ খালি জায়গাটার উপর দিয়ে বয়ে এসে আমাদের ঘরগুলোর পরদায়, চাদরে বিরতিহীন খেলা করে। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সবুজ জীবনের মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

বিশে শতাব্দীর নাগরিক যান্ত্রিকতার ভেতর কবি রফিক আজাদ এক নিরীহ সবুজ অর্কেডিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। গাছপালায় ঢাকা ওই ছোট্ট গ্রামটির নাম চুনিয়া। আমাদের উত্তরার বাড়ি আমার কাছে ঢাকা শহরের সেই চুনিয়া। আমাদের বাসার চারপাশের সতেজ হাওয়া ওই চুনিয়ার মতো বিশুদ্ধ আর নিরীহ।

শহরের দম-বন্ধ-করা ভারী বাতাস পেছনে ফেলে উত্তরার দিকে এগিয়ে আসার প্রতি মুহূর্তে বাতাসের এই সজীবতাকে টের পেতে থাকি আমি, মনে হয়, প্রতি পলে যেন একটা মুক্ত জগতের অবারিত শান্তির দিকে এগিয়ে চলেছি। জ্যৈষ্ঠ কিংবা ভাদ্র মাসে যখন সমস্ত ঢাকা মহানগরী দুঃসহ গরমে গুমট আর ভাপসা, গাছে একটা পাতাও নড়ছে না, ঘামে গরমে জনজীবন দুর্বিষহ, তখনো আমাদের এই জায়গাটায় নির্মল হাওয়ার পর্যাপ্ত ছড়াছড়ি। কুর্মিটোলা স্টেশন পেরোলেই টের পাই মিষ্টি হাওয়ায় গাছের চিরোল চিরোল পাতাগুলো সবার অজান্তে ঝিরঝির করে একটু একটু কাঁপছে। যখন আমাদের লেক পার হয়ে বাসার কাছে পৌঁছি তখন দেখি ইউক্যালিপটাসের দীর্ঘ রহস্যময় পাতাগুলো ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে অবিশ্রান্ত নড়ে চলেছে।

Scanned by CamScanner

খ

রূপে বিস্ময়ে সচকিত আমাদের ছোট্ট বাড়িটা। সন্ধ্যার পর দোতলার দক্ষিণ-পুবের ঘরটায় যখন আলো থাকে না, কেবল দক্ষিণের উত্তাল হাওয়া আর রাস্তার আলোর অস্ফুট আলেয়া রহস্যলোক তৈরি করে, তখন আমি স্পষ্ট চোখে ঘরের ভেতর রূপের পরীদের চকিত পায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখি। এই দেখা একান্তই আমার নিজের। পৃথিবীর পরিচিত-অপরিচিত আর কোনো মানুষের সঙ্গে এসব অতিপ্রাকৃতিক বিষয়-আশয়ে আমার মিল হবে না।

বাড়িটার আর্কিটেক্ট উত্তম উত্তম কুমার সাহা। ঢাকার তরুণ স্থপতিদের মধ্যে ও এখন অন্যতম খ্যাতিমান। এটাই ছিল ওর প্ল্যানের প্রথম বাড়ি। বাড়িটা করার আগে উত্তমকে একটা অনুরোধ করেছিলাম আমি। বলেছিলাম, আমাদের এই জায়গাটায় প্রকৃতি তার সব অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য অবারিত হাতে ঢেলে দিয়েছে : এই উত্তাল হাওয়া, লেকের পানি, রোদ, উজ্জ্বলতা ! বাড়ি করার সময়, এসো, আদিম মানুষদের মতো প্রকৃতির এই অপরিমেয় দানকে আমরা সম্মান জানাই। প্ল্যান করার সময় আমার একটা অনুরোধ অন্তত রেখো, কোনো দেয়াল রেখো না বাড়িটাতে। চারপাশের প্রকৃতি যেন আমাদের বিরতিহীন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সারা বছর আমাদের ঘরের অতিথি হয়ে উপস্থিত থাকতে পারে। উত্তম আমার অনুরোধটা রেখেছিল। কথাটা ওর শিল্পরুচির সপক্ষে মনে হয়েছিল বলেই রেখেছিল। একটা অবারিত জানালাওয়ালা বাড়ি বানিয়েছিল উত্তম। রোদের পড়ন্ত আঁচ থেকে বাঁচানোর জন্যই হয়তো পশ্চিম দিকে সামান্য একটু দেয়ালের বরাদ্দ—না হলে বাকি সারাটা বাড়ি শুধুই জানালা।

পাড়ার লোকেরা রসিকতা করে এই বাড়িটাকে তাই বলে পিকনিক-বাড়ি।

এইসব খুলে রাখা জানালা বাইরের জগতের প্রতি এ বাড়ির প্রসারিত অবারিত আহ্বান। দিনরাত উত্তাল হাওয়া ছোট্ট বলের মতো সারাটা বাড়ি জুড়ে দুষ্টুমি করে লাফিয়ে বেড়ায়। রাত্রিবেলা লেকের উল্টোদিক থেকে তাকালে আলো-জ্বালানো বাড়িটাকে দেখতে একটা সোনালি মৌচাকের মতো লাগে।

এত বড় জানালাওয়ালা বাড়ি রোশনা পছন্দ করে না। বাড়ির ভেতরকার নিভৃত, নিজের মতো করে বাঁচার ছোট্ট জগৎটুকুকে পৃথিবীর কাছে বেআবরুভাবে বিকিয়ে দিতে সে নারাজ। বাড়ির জানালাগুলোকে ও বলে 'রাক্ষুসে জানালা'। কিন্তু আমাদের চারপাশের লিলুয়া প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমি কেবলই বলি, 'হে অবাধ্য হাওয়া, হে মেঘ, হে রৌদ্র, হে লেকের জল আর উজ্জ্বল আকাশ, আমাদের এই অবারিত জানালাগুলো আসলে তোমাদের প্রতি আমাদের সাংবাৎসরিক ভালোবাসার উদার আহ্বান। আমাদের পরিবারের স্বামী-স্ত্রী-সন্তানদের মতো আমৃত্যু সদস্য হয়ে তোমরা এর ভেতর ইচ্ছামতো আস-যাও, এইসব পাথুরে দেয়াল সরিয়ে আমরা দুই ভেদাভেদরহিত পড়শী একই পৃথিবীতে শরতের বৃষ্টিচপল উৎসবে বেঁচে থাকি।

Scanned by CamScanner

গ

আমাদের বাসার সামনের লেকটা একসময় ছিল আদি তুরাগ নদী। টঙ্গী থেকে খানিকটা ভাঁটিতে নেমে বাঁক ঘুরে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বিমানবন্দরের কাছে মোড় নিয়ে মিরপুরের দিকে বয়ে চলত এককালে। পরে একসময় গতিধারা পাল্টে সরাসরি মিরপুরের দিকে বইতে শুরু করলে নদীর এই আদি ধারাটি আস্তে আস্তে মরে আসে। এখনো এই লেকের দুই পাড়ের ভূগঠন-স্বভাবে সেই জীবন্ত নদীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নীলনকশা অনুসারে মাটি ফেলে লেকের দুই ধার সমান্তরাল করার কাজ বছরখানেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। এই কর্মসূচি শেষ হবার সাথে সাথে এককালের এই শক্তিমন্ত স্রোতোধারার শেষ পরিচয়টুকুও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

লেকের ধারগুলো কোথাও খাড়া, কোথাও অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো। এককালে এই লেক যখন বর্ষার ঢলনামা পানিতে উপচে উঠত তখন সে এক বিশাল নদীর রূপ নিয়ে দেখা দিত। উত্তাল হাওয়ায় পাল তুলে শত শত নৌকার বহর এগিয়ে যেত এর উপর দিয়ে। অনেক আনন্দ আর কলরবে ভরে থাকত এর জলজ-জগৎ। একদিনকার সেই বেগবান নদী এখন কেবলই একটা ভেদাভেদহীন দীর্ঘ নিটোল জলা, একটা সমৃদ্ধিশালী জলধারার নির্জীব নীরক্ত মৃতদেহ। এখন লেকের তিরতির করে কাঁপা পানিতে রাস্তার ধারের বিদ্যুতের আলোরা রাতভর কেবল সার সার তরল সোনার জ্বলন্ত মিনার তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখানকার প্রকৃতির মতো এই লেকটাও আশ্চর্যসুন্দর। লেকের ওপর দিয়ে সারাক্ষণ হাওয়া আর কুয়াশার রহস্যময় ছোটাছুটি। ফাল্গুন থেকে ভাদ্র পর্যন্ত দক্ষিণে হাওয়ায় পদ্ম-বনের মতো ঢেউ তুলে সারাদিন সে কেবলই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে। আর ঝড় হেঁকে উঠলে যখন লেকের পানিতে কালো অজগরের মতো বিশাল ঢেউ চারধার তোলপাড় করে তোলে তখন আমাদের বাড়ির দোতলার জানালায় বসে মনে হয় আমি যেন লেকের ভেতরকার ওই ঝড়ের সংক্ষুব্ধ উত্তাল মাঝখানটায় বসে আছি। আমাকে ঘিরেই ওইসব ভয়াল গোক্ষুরের কোটি কোটি সংক্ষুব্ধ ফণার উম্মাদনা। যখন ঠিক ঝড় ওঠে না কিন্তু বলদৃপ্ত হাওয়ায় লেকের পানিতে সাদা মাথাওয়ালা কোটি কোটি কালো ঢেউ জেগে ওঠে তখন এই মৃত অসহায় জলাশয়ের সঙ্গে অনেকদিন আগের সেই উদ্ধত নদীর রক্তসম্পর্ক ধরা পড়ে যায়।

আমাদের লেকের হাওয়াদের মতিগতিও এই জায়গাটার মতোই, অদ্ভুত। ঢাকা শহরে অন্যসব জায়গার হাওয়াদের থেকে এ একেবারেই আলাদা। ফাল্গুন থেকে ভাদ্র পর্যন্ত দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পুবের অবিশ্রান্ত হাওয়ারা আমাদের সারা বাড়িটায় হল্লা করে বেড়ালেও ভাদ্র আশ্বিন আসতে না আসতেই একটা অলক্ষ্য পট পরিবর্তনের পালা শুরু হয়। তখন অনেক আগের পালিয়ে যাওয়া উত্তুরে হাওয়ারা আগের জায়গা দখল নেবার জন্যে বর্শা উঁচিয়ে লেকের উত্তর দিকে দল বেঁধে এসে দাঁড়ায়। তখন আমাদের লেকের শিশু হাওয়ারা কোন দলে যাবে ঠিক করতে না পেরে

Scanned by CamScanner

গালে হাত দিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত গুম হয়ে বসে ভাবে। ওই দিনগুলো আমাদের জন্য সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে বিমর্ষ সময়। গুমট গরমে আমাদের এই ছোট্ট এলাকার কোথাও নিশ্বাস নেওয়ার মতো এতটুকু হাওয়া থাকে না—ইউক্যালিপটাসের পাতাগুলোও যেন নড়াচড়া করতে ভুলে যায়। রাতে লেকের নিশ্চল অপলক পানিতে রাস্তার আলোগুলো আয়নার মতো নিটোল অবয়বে ধরা পড়ে। এরপর বেশ কিছুদিন উত্তুরে আর দক্ষিণে হাওয়ার মধ্যে একটা বিবাদ চলার সময়। প্রথমে উত্তুরে হাওয়া দক্ষিণের বাতাসকে বিমানবন্দরের ওধার পর্যন্ত পিছু হটিয়ে লেকের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করে। কিন্তু সে নেহাতই দিন কয়েকের জন্য। দক্ষিণে হাওয়ারা তাদের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের ডেকে জড়ো করে ফের বড় আকারের আক্রমণ চালালে উত্তুরে হাওয়ারা পিছু হটে তুরাগ নদীর ওধারের বিশাল বিলটার পদ্মবনে, পরাজিত দুর্যোধনের মতো, লুকিয়ে থাকে। এমনিভাবে বারকয়েক ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর দক্ষিণে হাওয়ারা পশ্চাদপসরণ করে একসময় লেক থেকে চার পাঁচ মাসের জন্যে বিদায় নিয়ে চলে যায়। অনেকদিন আর তাদের কোনো খবরই থাকে না। উত্তুরে হাওয়ারা তখন একপাখায় শীত আর অন্য পাখায় শিশির কণা নিয়ে আমাদের এই বসতিতে অতিথি পাখিদের সঙ্গে সারা শীতের জন্য বাসা বাঁধে।

যদি বৃষ্টির অবিশ্বাস্যরূপ দেখতে চাও তবে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটায় এসো। দেখবে কীভাবে দিগন্তকে ঝাপসা করে অপরূপ বৃষ্টিপরীরা হালকা খুশিতে তোমাকে পার হয়ে চলে যাচ্ছে। এখানকার বৃষ্টি আসাটা যেমন অপরূপ তেমনি অদ্ভুত। এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি দেখবে বৃষ্টির বিপুল কালো মেঘ, এখানে এসে পৌঁছোবার আগে, আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের বিশাল প্রান্তরটার ওপর আনত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহুক্ষণ। তারপর হঠাৎ চোখের এক ফোঁটা পানি তোমার কপোলের ওপর টুপ করে ঝরিয়ে গাঢ় অভিমানে চুপ করে আছে আরো খানিকটা সময়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে দেখবে অনেকক্ষণ পর ঝরবে আরেক ফোঁটা। তারপর একসময় শালুক, পানিফল আর রক্তপদ্মের ঠোঁট ভিজিয়ে সারা পৃথিবীর ওপর বিরতিহীন ঝরতে থাকবে। এইসময় যখন রাস্তাঘাট জনশূন্য, রিকশাওয়ালারা একটানা অনেকক্ষণ ভেজার পর হাল ছেড়ে বিমর্ষ মুখে বিদায় নিয়েছে কিংবা রাস্তার পাশে গাছের নিচে কাকের মতো অঝোরে ভিজছে, জরুরি কাজে অগত্যা বের হওয়া দুএক জন নিঃসঙ্গ পথচারীর আচমকা তীক্ষ্ণ চিৎকার আর ক্ষিপ্র গাড়িগুলোর পানি ছিটিয়ে চলে যাবার বিরস শব্দ ছাড়া কিছুই কানে আসছে না, তখন তুমি এখানে, এই ঢাকা শহরের মাঝখানে বসেই মধ্যযুগের বাংলাদেশের আর্ত আক্রান্ত জগৎকে দেখতে পাবে—সেই জগৎ যেখানে এমনি অবিরল বর্ষণধারার নিচে সমাজ সভ্যতা লুপ্ত, জনজীবন বিপর্যস্ত, রাস্তাঘাটে মানুষের দেখা নেই, কেবল সেই একটানা বিচ্ছিন্নতার ভেতর প্রেমিকার নিঃসঙ্গ একাকিত্বের গুমরে ওঠা বিরহবেদনার সুর কেঁপে কেঁপে উঠছে :

Scanned by CamScanner

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

যদি সোনালি দৃষ্টি দেখতে চাও, রাতে এসো। আমাদের নির্জন বারান্দায় বসে চারপাশের ছড়িয়ে-থাকা স্নিগ্ধ বিদ্যুৎবাতির আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা সোনালি বৃষ্টির অঝোর নারীকে দেখতে পাবে। দেখবে আশপাশের প্রতিটি লাইটপোস্টের বিচূর্ণিত আলোর ভেতর, প্রতিটা বাড়ির গেট আর দরজা বা জানালা দিয়ে ছিটকে-পড়া স্নিগ্ধ আভার সৌন্দর্যলোকে, পানি থেকে উঠে আসা বিচ্ছুরিত আলোক-কণার ভেতর সেই বৃষ্টি অবিরাম ঝরে ঝরে সমস্ত রাতটাকে কেমন রোদনরূপসী করে রেখেছে।

ঘ

একেকদিন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় আমাদের বাসার ঠিক সামনে, পুব আকাশে, ডাকাতের মতো বিশাল গোল চাঁদ ওঠে। সোনার থালার মতো তার বিরাট শরীর গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে একসময় জোরালো আলোয় সবটা উত্তরাকে উপচে দেয়। আমি তখন বড় বড় গাছের ছায়ায় অস্ফুট রূপের পরীদের সারাটা এলাকা জুড়ে হেঁটে বেড়াতে দেখি। পাতাদের খসখস আওয়াজের সাথে তাদের অপার্থিব কথাবার্তার শব্দ টের পাই। এইসব রাত্রিতে একেক সময় লেখার কথা পুরোপুরি ভুলে ছাদের উত্তাল হাওয়ায় আপ্লুত জ্যোৎস্নাধারার নিচে আমি সারারাত শুয়ে থাকি। সারারাত জ্যোৎস্না আমার শরীর প্রত্যঙ্গ প্রাণকোষ ভিজিয়ে নির্জনে ঝরে ঝরে আমার সারা অস্তিত্বকে জোছনাস্নাত করে তোলে। একেকদিন ঘুম বেশি হয়ে গেলে আকাশ থেকে চাঁদ লুকিয়ে ডুবে যায়। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে চারপাশের সেই চন্দ্রালোকিত রাতটাকে তখন আর দেখতে পাই না। টের পাই আমার জোছনাভেজা শরীর সেই স্নিগ্ধ ফুটফুটে রাতটি হয়ে যেন ছাদের আকাশে শুয়ে আছে।

প্রকৃতির নিচে এই বাড়িতে এমনি শুয়ে থাকাটা সত্যি অদ্ভুত। একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের নিচের তলার সিঁড়ির ধারে বোগেনভেলিয়ার একটা চারা বুনেছিলাম ছ' সাত বছর আগে—গাছটা দোতলার বারান্দার ধারঘেঁষে ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। সারা বছর অফুরন্ত ফুল থাকত গাছটায়। ফুলের মরশুমে সারাটা গাছ ফুলে ফুলে এমনি ভরে যেত যে গাছের পাতাই আর দেখা যেত না। গাছটাকে তখন ফুলে ফুলে ভরে-থাকা কোনো অপরূপ মেয়ের মতো লাগত। গাছটা থেকে একটা দুটো ফুল, চুপে, নিজেদের এতটুকু টের পেতে না দিয়ে, কেবলই ঝরে যেত, বারান্দার ওপর। একদিন রাতে ঘটেছিল সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা। আকাশে সোনার থালার মতো পূর্ণিমার বিশাল গোল চাঁদটাকে উঠে আসতে দেখে গাছের পাশের ছোট্ট বারান্দাটুকুতে আমি নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একসময় ঘুম ভাঙতেই দেখি সারারাত ধরে ছোট ছোট অজস্র গোলাপি ফুল আমার ওপর টুপ টুপ করে ঝরে আমার সারাটা

Scanned by CamScanner

শরীরকে ফুলের নরম ভালোবাসায় ঢেকে রেখেছে। আমার মৃত্যুর দিনেও যেন ফুলেরা ঝরে ঝরে আমার শরীরটাকে এমনি অপলক আদরে ভরিয়ে রাখে।

বছর দেড়েক হল শহর থেকে বাস উঠিয়ে এ বাড়িতে আমরা এসেছি। এরই মধ্যে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে বাড়িটায়। ফুলগাছের মধ্যে আছে ম্যাগনোলিয়া, শেফালি, বটল ব্রাশ, কাঁঠালিচাপা, নাগেশ্বর, অশোক, রাধাচূড়া, রঙ্গন, স্থলপদ্ম, দোলনচাঁপা, বেলি, জুঁই, হাসনাহেনা। লতাজাতের ফুলগাছও লাগিয়েছি বেশ কয়েকটা। গোল্ডেন শাওয়ার, মাধবীলতা, ঝুমকোলতা, বোগেনভেলিয়া এইসব। বাড়িতে জায়গা কম বলে ফলগাছ বেশি নেই—দু তিনটা কামরাঙা, ডালিম আর গোটা দুই সাদা করমচা। সবুজ করমচার গায়ে পাক ধরলে তাদের বাইরের দিকটা লালচে-কালো আর ভেতরটা তাজা রক্তের মতো লাল টুকটুকে হয়ে ওঠে। আমি তাদের ফলের দলেই ফেলি। কিন্তু সাদা করমচার বেলায় এ কথা খাটবে না। থোকায় থোকায় ফলে-থাকা এইসব দুধসাদা করমচাগুলোর গায়ে যখন পেকে ওঠার রক্ত-রং ছড়িয়ে পড়ে, তখন থোকাগুলো কোথাও দুধ আর কোথাও আলতার ছোপ লেগে এমন রঙিন আর অপরূপ হয়ে ওঠে যে সেগুলোকে তখন ফল না বলে ফুল বলতেই আমার বেশি ভালো লাগে। ফল নেই এমন গাছ গোটা চারেক। চার পাশে না-ছড়িয়ে নিচের দিকে নুয়ে-পড়া ডালপাতাওয়ালা দেবদারু—একটা আরেকটা থেকে হাত দশেক দূরে দূরে—বাসার ঠিক সামনেটায় সার বেঁধে লাগিয়েছিলাম বছর পাঁচেক আগে—এখন বেশ গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে তারা।

বছর দশেক হল এই প্রজাতির দেবদারু ঢাকায় এসেছে। গতবার বাসার পেছনদিকে লাগিয়েছিলাম একটা সেগুনগাছ। নিচের দিকে ডালপালা ছেঁটে দেওয়ায় সম্রাটের মতো সবার ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে এক বছরের মধ্যে। একটা গাছ নিয়ে কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। বছরখানেক হল একটা কাঠমালতী লাগিয়েছি বাসার সামনে—দেয়ালের বাঁ দিকটা ঘেঁষে—দেবদারুগুলোর একই সারিতে। ঢাকায় দু-তিনটের বেশি জায়গায় এই জাতের কাঠমালতী আমার চোখে পড়ে নি। যখন ফোটে তখন দুধের মতো রাশ রাশ ফুলের সাদা বড় থোকাগুলো গাছের ভেতর থেকে মুখ জাগিয়ে কালচে সবুজ পাতার জগৎকে আলো করে রাখে।

আমাদের বাড়ির প্লটটা ছোট—মাত্র সাড়ে তিন কাঠার। এরই ওপর মাত্র এক কাঠার ওপর আমাদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। এই বাড়ি সম্বন্ধে এত উদ্বেলিত কথা শোনার পর এর আয়তনের অসম্মানজনক তুচ্ছতা হয়তো অনেকের কাছে করুণার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু আগেই তো বলেছি এতক্ষণ বাড়ির যে বৈভবের কথা আমি তুলে ধরেছি সে তো নেহাতই আমার নিজস্ব ভালোবাসার কথা। আমার একক স্বপ্নের গল্প। এই রূপ দেখতে পাওয়ার জন্য রাজপ্রাসাদ, নহর আর গোলাপজলের ফোয়ারার দরকার নেই। ভাঙা কুঁড়েঘরে থেকেও অনেকে এমনি অপার্থিব কিছু দেখতে পারে। আমার নিজের চোখ দিয়ে বাড়িটার যে অনবদ্য রূপ দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম এ তারই কথা। পৃথিবীর আর কারো সাথে তো এর মিল হবে না।

Scanned by CamScanner

আমাদের বাড়ির সবচেয়ে রাজকীয় বৈভবটির কথা দেখছি গল্পের ফাঁকে বাদই পড়ে গেছে। হ্যাঁ, সেই বিশাল বটগাছ। বটগাছটা আমাদের জমির ওপরে নয়। এমন বিশাল একটা বটগাছ কী করেই–বা আমাদের এই ছোট্ট জায়গাটুকুর ভেতর থাকতে পারে।

আমাদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি লেকের উল্টো ধার জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বটগাছটা। দিনেরবেলায় যতবারই আমরা নিচতলা থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাই ততবারই সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই লেকের উজ্জ্বল জলে ছায়া–ফেলা স্নিগ্ধ সবুজ বিশাল বটগাছটাকে দেখতে পাই। গাছটাকে এতবার দেখেছি তবু সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই যখন গাছটার সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আর পরাক্রান্ত চেহারাটা জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের মতো চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় তখন মনে হয় কী সামান্য ব্যবধানে কত অপরিমেয় একটা পৃথিবী এতক্ষণ অপচয় করে চলছিলাম। গাছটাকে দেখলেই জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ হতে ইচ্ছে করে।

আমাদের বাড়িটা ছোট। তবু এর ভেতর রয়ে গেছে এক বিরাট চরাচরের উপস্থিতি। বাড়িটার যেকোনো জায়গা থেকে উত্তরে দক্ষিণে কয়েক মাইলের এক প্রাকৃতিক লীলাজগৎ দেখতে পাই আমি। বটগাছটার মতো এ জগৎটাও আমাদের নয়। তবু ওই গাছের মতো একেও আমি আমাদেরই মনে করি। এ বাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত আমরা যা দেখতে পাই, ভালোবাসতে পাই, দেখে অবাক হবার অধিকার পাই সে তো আমাদেরই সম্পত্তি। মালিকানার দাবি করে তাকে কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

৬

আমাদের চেয়ে হাজারগুণ ধনী মানুষ আছে আজ ঢাকা শহরে, প্রাসাদের মতো উঁচু বিশাল বৈভবদীপ্ত সব ঘরবাড়ি তাঁদের। এক–একটা বাড়ির চোখ ধাঁধানো জলুসের বহর এমন অবিশ্বাস্য যে মনে হয় ট্যাকের পয়সা খরচ করে অযথা তাজমহল দেখতে আগ্রায় না গেলেও চলবে। কিন্তু ঢাকা শহরের মতো এমন জায়গায় প্রকৃতির এমন মনোরম স্নিগ্ধ বুকের ভেতর এমন নিবিড় একটা বাড়ির ভাগ্য তাদের কজনারই–বা হয়েছে। আমরা কপর্দকশূন্য মানুষ, কিন্তু ও' হেনরির 'উপহার' গল্পের যে গরিব নায়িকা বিবাহবার্ষিকীতে উপহার দেবার জন্যে তার দীর্ঘ সোনালি অলকগুচ্ছ বিক্রি করে তরুণ স্বামীর সোনার ঘড়ির জন্যে সোনার চেন কিনে এনেছিল আর একই সময়ে যে কপর্দকশূন্য স্বামী উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নিজের ঘড়িটা বিক্রি করে স্ত্রীর সেই ঘন কেশদামের জন্যে একটা সোনার চিরুনি কিনেছিল তাদের চেয়ে আমাদের পরিতৃপ্তি কম কিসের! নিয়তি আর সব জায়গায় আমাদের প্রতারিত করেছে কেবল এই জায়গাটুকু ছাড়া। ভালোবাসার দুই হাত উজাড় করে, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' আমাদের আকণ্ঠ দিয়েছে সে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ধন নয় মান নয় একটুকু

Scanned by CamScanner

বাসা/করেছিনু আশা'। আমাদের বাড়িটা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের সেই একটুকু বাসা।

আগেই বলেছি আমাদের প্লট ছোট। বাড়ি আরো ছোট। তবু এতেই আমি কৃতার্থ। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আমি পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি বাড়ির ব্যাপারে ভাগ্য আমাকে সত্যি সত্যি আনুকূল্য দেখিয়েছে। আমরা যারা সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অনাদরে অবহেলায়' গান গেয়ে যাই, তাদেরকে রক্তাক্ত বর্শায় ক্ষতবিক্ষত করার মানুষের যেমন অভাব হয় না তেমনি আবার ভালোবাসার মানুষও বেশ কিছু থাকে। যারা অপর্যাপ্ত বিত্তশালী তাদের সঙ্গে আমাদের—পাথেয়হীন নিঃস্ব এইসব মানুষের—পার্থক্য এখানটাতেই। টি এস এলিয়ট হয়তো সঠিকভাবেই লিখেছিলেন এই পার্থক্যের কথা। ওদের খানসামা আছে বন্ধু নেই, আমাদের বন্ধু আছে খানসামা নেই (They have butlers and no firends, we have friends and no butlers.)। এই বন্ধুরাই আমার পাথেয়। এরাই সাহায্য যুগিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, ঠেলে, ধাক্কিয়ে প্রায় গায়ের জোরেই শেষ করে দিয়েছিল বাড়িটা। সেদিক থেকে প্রকৃতপক্ষে বাড়িটা তাদেরই। আমি তাদের ভালোবাসার দখলদার কেবল।

আমি বাড়ি বানিয়েছি শুনে আমার পরিচিতেরা চমকে উঠেছিল। আমার কাছ থেকে তারা সবরকম সাফল্য প্রত্যাশা করেছে, কিন্তু এটা করে নি। আমারও মনে হয় সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল বানানোর চাইতেও আমার বাড়ি তৈরির ব্যাপারটা হয়তো বিস্ময়কর। শাহজাহানের পূর্বপুরুষের অর্জিত মণিমাণিক্যের রাজকোষ ছিল, স্ত্রী আর নিজের স্মৃতিকে 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' করে রাখার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আমার? না উৎসাহ, না সাশ্রয়, না সাধ্য। উপরন্তু আমি ছাড়া পরিবারের সবাই ছিল এর বিপক্ষে। বন্ধুবান্ধবদের সবার ভালোবাসাতেই এ সম্ভব হয়েছে। যে যা চায় পৃথিবীতে তা-ই সে পায়। আমি পৃথিবীর কাছে বিত্ত চাই নি। রাজ্য সাম্রাজ্য রাজদণ্ড প্রতিপত্তি প্রত্যাশা করি নি, আমি সবার হৃদয়ের কাছে ছোট একমুঠো ভালোবাসার মতো এতটুকু জায়গা চেয়েছিলাম। আমি তা পেয়েছি। সে ভালোবাসা খুশি হয়ে এই বাড়ি আমাকে উপহার দিয়েছে। একে তাই আমি বাড়ি না বলে ভালোবাসাই বলি। তবু আমি জানি এ বাড়ি নিয়ে আমার বিপদ আছে। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইন মনে পড়ে: 'চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা।' কথাটা আমার জীবনেরও সত্য। পথের নেশায় চিরদিন পাথেয় উপেক্ষা করেছি আমি। অবহেলিত পাথেয় আজ হোক কাল হোক তার প্রতিশোধ নেবে। আমি জানি আমাদের দেশে যারা আনন্দের অহংকারে বাস্তবকে তাচ্ছিল্য করেছে তাদের জীবনের দুঃখময় বিপর্যয়ের চেয়ে আমার পরিণতি এতটুকু আলাদা হবে না।

বাড়ি তৈরির আগের আর পরের বারোটা বছর কেন্দ্রের কাজে আত্মবিস্মৃতের মতো কেটেছে আমার। সেই স্বপ্নগ্রস্ত পৃথিবীতে এই বাড়ির অস্তিত্ব আমার চেতনা থেকে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভাড়াটেদের অনেকেই এই অভাবিত সুযোগ হারাবার মতো নির্বুদ্ধিতা দেখায় নি। সবাই মিলে প্রায় কয়েক বছরের ভাড়া অদেয়

Scanned by CamScanner

রেখে বিভিন্ন সময়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

এ বাড়ির প্রতিটা ইট বন্ধকের। ঋণদান সংস্থা আর ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা টাকায় তৈরি। ব্যক্তিগত ঋণও কম করতে হয় নি। বাড়ি ভাড়া না পাওয়ায় ঋণের পরিমাণ সুদে আসলে বেড়ে কয়েকগুণ হয়েছে। সুস্থভাবে বছরপাঁচেক বেঁচে থেকে ভালো রোজগার করে এই টাকা দিতে না পারলে বাড়ি বেহাত হয়ে যাবে। কিন্তু আমার রোজগার কোথায়? বছরের ওপর হল আমি চাকরি ছেড়ে বসে আছি। স্বাধীন আনন্দে নিজের ইচ্ছায় কাজ করে কমবেশি রোজগার করতে আমার আপত্তি নেই। তাকে আমি ভাগ্যের উপহার বলেই মনে করি। আমি জানি, টাকা জীবনের জন্যে খুব দরকারি। কিন্তু কেবল টাকার জন্যে বেঁচে থাকার মধ্যে কোথায় যেন অস্তিত্বের একটা গভীর অমর্যাদা আছে। নিজেকে অসম্ভব ছোট মনে হয়। আমার হাত-পা ভেঙে শরীর ঘুলিয়ে আসে, ভেতরটা মা-মরা শিশুর মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

আমি জানি, টাকা রোজগার আমাকে দিয়ে হবে না। এ পৃথিবীতে জীবন মাত্র একবার। টাকার পায়ে একে অশ্লীল উৎসর্গের কোনো মানে নেই। পাথেয়কে আমি তাচ্ছিল্য করে অপমান করেছি, তার প্রতিশোধ আমি এড়িয়ে যেতে পারব না। আজ হোক, কাল হোক, এই বাড়ি ক্রোক হয়ে যাবে। আমার চেয়ে অনেক বিত্তশালী কোনো মানুষ এসে কিনে নেবে আমাদের এই শব্দময় বাড়ি, যাকে দূর থেকে সোনালি মৌচাক বলে ভুল হয় আমার। সে কিনে নেবে দোতলার সব নিসর্গবেষ্টিত ঘর—এর হাওয়ায়-ওড়া বেপরোয়া বারান্দা, দোতলায় ওঠার প্রিয় কাঠের সিঁড়ি, পূর্ণিমা রাতের হত্যাকারীর মতো বিশাল গোল চাঁদ, সবকিছু। কিন্তু যে অলৌকিক রূপের জগৎকে প্রতি পলে আমি এখানে প্রত্যক্ষ করেছি, তা সে কোনোদিন কিনতে পারবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর দেওয়া নোটের ক্রয়ক্ষমতার তা বাইরে।

আমাদের বাড়ির এই রূপের জগৎ যদি দেখতে চাও, আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাবার আগেই এখানে এসো। না হলে, পরে, আমার এইসব বর্ণনা পড়ে তুমি এসে এখানকার বাসিন্দাদের কোনোদিন জিজ্ঞেস কর, 'এমন একটা জায়গা এখানে কোথায় আছে বলতে পারেন'—তখন তারা তোমার প্রশ্ন শুনে হয়তো প্রথমে কিছুক্ষণ ভাববে, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আশপাশের এলাকা হয়তো খুঁজে দেখতেও চেষ্টা করবে এক-আধটু; তারপর হতাশার স্বরে একসময় বলবে, আপনি কোন জায়গার কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না তো। এ এলাকায় এমন কোনো জায়গার কথা তো কখনো শুনি নি।

যা কেবল আমার একলা ভালোবাসা আর স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তোলা তার ঠিকানা অন্য মানুষের তো জানা থাকবার কথা নয়।*

---

* এই রচনাটা লেখার দু বছর পর বাড়িটা বিক্রি হয়ে যায়। এখন সেটা আর 'আমাদের বাড়ি' নেই। এখন সেটা 'তাহাদের বাড়ি'।

Scanned by CamScanner

পরিশিষ্ট :

[এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে, ৪৭ নং জর্নালে, আমি আমাদের একজন ছাত্রীর প্রসঙ্গে কিছু কথা লিখেছিলাম। বইটি বেরোলে ছাত্রীটির তা চোখে পড়ে এবং ওই প্রসঙ্গটির সূত্রে সে আমাকে একটি চিঠি দেয়। লেখাটির সঙ্গে চিঠিটির প্রাসঙ্গিকতা থাকায় চিঠিটি এখানে ছেপে দিলাম।]

সক্রেটিস আমার বিস্ময়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একাদশ শ্রেণীর বই পড়া কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে যে বইটি পড়ে আমার আপাদমস্তক কেঁপে উঠেছিল, তার নাম 'প্লেটোর সংলাপ'। মৃত্যুর সৌন্দর্য দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার চেতনার জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল একটি আকাশস্পর্শী বোধের সামনে দাঁড়িয়ে—আমি জেনেছিলাম, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে একজন কুৎসিতদর্শন বৃদ্ধ মানুষ কীভাবে 'আকাশের মতো সহজ, মহৎ, বিশাল' কথাকে আঁকড়ে ধরে সজ্ঞানে, সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। নিজের বিশ্বাসে এমন স্থির অটল—এমন প্রশান্ত! এমনই নির্বিকার সমস্ত বিরুদ্ধতার সামনে! এই মৃত্যু তো উত্তেজনার মুখে রক্ত টগবগ করা স্লোগানে প্লাবিত নগরীর মিছিলে পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া তরুণের আবেগথরথর মৃত্যু নয়! এ তো একজন রক্তের উষ্ণতা থিতিয়ে-আসা পরিণত, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাবোধসম্পন্ন বৃদ্ধের প্রশান্ত-স্থির মৃত্যু। এই জ্যোতির্ময় মৃত্যুর সামনে শুধু তখনই দাঁড়ানো সম্ভব, যখন কোনো অপার্থিব জ্যোতির্ময় সত্যে আত্মার প্রতিটি প্রকোষ্ঠ আলোকিত হয়। সক্রেটিসকে জেনে সেই সত্যের বিশালতার সামনে নিজেকে ভীষণ তুচ্ছ, সামান্য মনে হয়েছে এবং সেইসাথে একটি সহজ অথচ তীব্র সত্যের অভাবে নিঃস্বতার গভীর বেদনায় ডুবে গিয়েছি। একই সাথে দুটি অনুভূতি হয়েছে আমার—নিজের সত্যের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে একা এক জন মানুষকে দেখে শিউরে উঠেছি, এবং সাথে সাথে নিজের অন্তরে সত্যের দৈন্যে লজ্জিত ও ক্ষুদ্র হয়ে গেছি। আমি তো সেই সত্যের সমান নই। আদিম যুগের মানুষ যেমন প্রকৃতির রহস্যময়তার কাছে, বিশালতার কাছে তুচ্ছ বোধ করেছে এবং অলৌকিক শক্তির কাছে মাথা নত করে ধর্মের সৃষ্টি করেছে, আমি ঠিক তেমনি সেই সত্যের সম্মুখে তুচ্ছ হয়ে মাথা নত করেছি, নতজানু হয়েছি তার কাছে, খুঁজে পেয়েছি আমার অভ্যন্তরে নতুন এক ধর্ম। সেদিনই জন্মসূত্রে পাওয়া আচারসর্বস্ব আবৃত্তি করা গতানুগতিক ধর্ম আমার কাছে হারিয়ে ফেলেছে সমস্ত

Scanned by CamScanner

উজ্জ্বলতা। নতুন ধর্মে একটি আশ্চর্য সত্যের আলোয়ে আমি স্নাত হয়েছি। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো নয়—বৃষ্টির জল মাটির গভীরে যেমন ধীরে ধীরে জমে, তেমন করে একটি মুক্তির ফাটলের অপেক্ষায়,—যে ফাটল দিয়ে সেই স্থির, আবদ্ধ জল স্রোত হয়ে, গতি হয়ে বেরিয়ে আসবে ; সূর্যের সাদা আলোর স্পর্শ পেয়ে বিচ্ছুরিত করবে সাতটি রঙিন আলো উদ্দাম ঝরনার মতো। যদি সেই ফাটল না পাওয়া যায়, তবু সত্যের সেই সঞ্চয় তো মিথ্যে হয়ে যায় না।

আমি আজো জানি না, সেই আশ্চর্য মৃত্যুকে ভালোবেসে তার হাত ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রার অপূর্ব সাহস আমার আছে কি না—কে-ই-বা জানে? জানতেন কি ক্ষুদিরাম, নূর হোসেন, রফিক-সালাম-বরকতেরা, রেডস্কোয়ারে ট্যাংকের সামনে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়া সেই অমিতসাহসী যুবা অথবা পৃথিবীর সমস্ত মুক্তির সংগ্রামে আত্মাহুতি দেওয়া অগণন প্রাণ? কেউ কি বলতে পারে, সত্যের আঘাতে কখন রক্তে জ্বলে ওঠে দক্ষযজ্ঞ—জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয় সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংকোচ-ভয়-কুণ্ঠা?

তাই, আমি কখনো বলি না, আমি পারব না ; বলি, আমি জানি না।

তবু একবার এক মুহূর্তের জন্য ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠেছিল আমার স্নায়ুতন্ত্রী। কেন্দ্রের মৌখিক পরীক্ষায় স্যার আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমিও সক্রেটিসের মতো পারবো কি না। তখন আমি সংশয়ের অন্ধকারে ঢাকা। এর আগে তো কেউ জানতে চায় ।ন এমন অদ্ভুত কথা? আমার গুরুজনেরা শুধু জানতে চেয়েছেন ক্লাসের মৃত বইগুলো মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় তার হুবহু অনুকৃতি করতে আমি কতখানি দক্ষ। নির্ভুল আবৃত্তির শিক্ষায় অভ্যস্ত আমি আশৈশব মানুষের স্বপ্ন বলতে হয় চিকিৎসক, নয় প্রকৌশলী হওয়া বুঝতাম। তাই, সেই প্রশ্নের সামনে আমার সংশয়, আমার মানসিক দৈন্যের অকপট স্বীকারোক্তি জানিয়েছি। স্যার আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কেমন করে জানলে তুমিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ নও? তোমার মধ্যেই একজন সক্রেটিস নেই? সেই মুহূর্তেই আমি একজন সক্রেটিস হবার দায়িত্ব বোধ করলাম।

আমি আমার সমস্ত জীবন এই প্রশ্নের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব। দাঁড়িয়ে বিমূঢ় বেদনায় থরথর করে কাঁপতে থাকব—আমি কেন একজন সক্রেটিস নই? একজন মানুষ একটি প্রশ্নের বর্শা বিঁধিয়ে দিয়েছেন আমার হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে। সেই আশ্চর্য ঘাতক আমাকে দিয়েছেন নির্মম মৃত্যুযন্ত্রণা। আমি তাই জেনেছি, আমি বেঁচে আছি। আমি বেঁচে আছি স্থিরসত্য ছুঁতে না-পারার অক্ষম অস্থির সময়ে।

সায়েমা ইসলাম
৬. ২. ৯৩

Scanned by CamScanner

মননের সাধক সচরাচর হয়ে থাকেন নিঃসঙ্গ, কর্ম-কোলাহল থেকে দূরত্ব রচনা করে একাকী চলে তাঁদের সাধনা। কিন্তু মননের বিশাল কর্মযজ্ঞ স্বয়ং সূচিত ও পরিচালিত করছেন এমন সাধক চিন্তক কোথায় মিলবে? তেমনি এক বিরল ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, যিনি সর্বমানবের অন্তরে আলোকের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে শ্রমসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছেন। ষাটের দশকের তারুণ্যদীপ্ত সাহিত্যান্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারি, 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদনা-সূত্রে ভাবজগতে জাগিয়েছিলেন আলোড়ন। টেলিভিশনের লোকরঞ্জক কাঠামোর মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত আনন্দ-উদ্ভাসী উপস্থাপক হিসেবে তাঁকে জেনেছেন বিপুলসংখ্যক মানুষ। আর অগণিত নবীন কিশোরের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র'-র মাধ্যমে গ্রন্থজগতের স্বর্ণখনির সন্ধান তাদের পাইয়ে দেয়ার জন্য। শিল্পের চেতনায় যিনি আলোকিত করেছেন সহস্রজনকে, তাঁর অন্তর্মানসের সুনিবিড় ছবি ফুটে উঠেছে বর্তমান গ্রন্থে। অন্তর্গত দহন ও সত্যানুসন্ধানের আকুতি শিল্পীচিত্তে যেভাবে প্রতিফলিত হয় তার আন্তরিক উদ্ভাসন স্মরণীয় করে তুলবে 'বিস্রস্ত জর্নাল' গ্রন্থের পাঠ—বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে আত্মগত উপলব্ধিময় উচ্চারণের ক্ষীণতোয়া ধারায় এ-এক অনন্য সংযোজন।

ISBN 984-465-017-8

Probal Ahmed

Scanned by CamScanner